শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

# ফিকহি মাকালাত

## আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

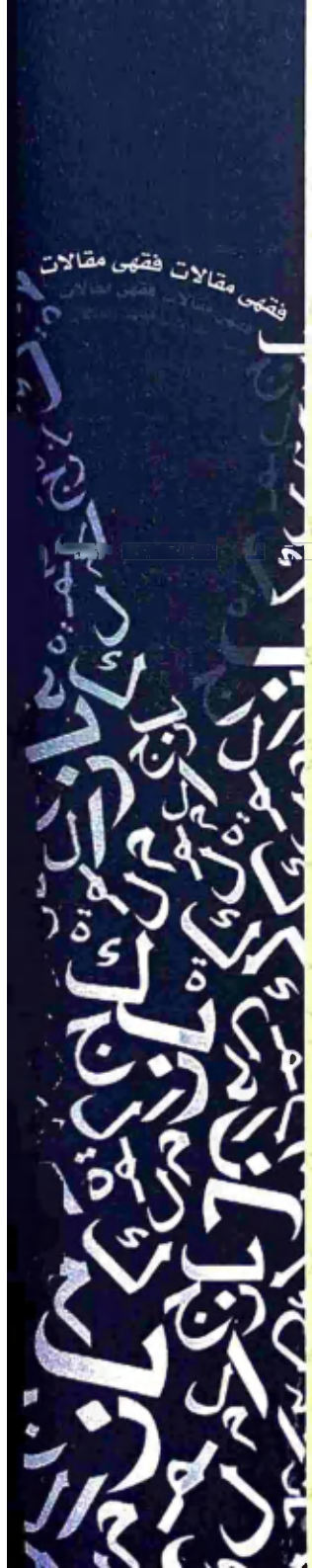

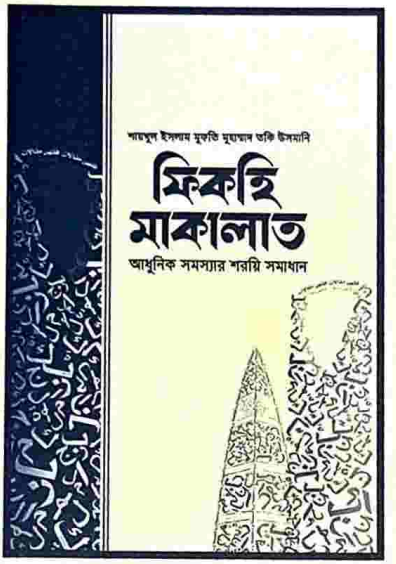


## গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

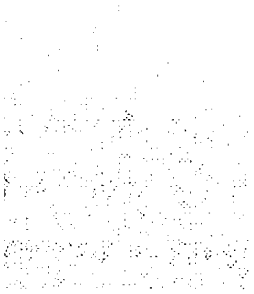

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

# ফিকহি মাকালাত

৫

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৫

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

## সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

# ফিকহি মাকালাত

৫

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

# ফিকহি মাকালাত-৫

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৪৭৫, US $ 12, UK £ 10

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9

www.facebook/Maktabatul Islam

www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 1.ST

Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani

Translatet by : Mufti Iliyas Bin Alauddin

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

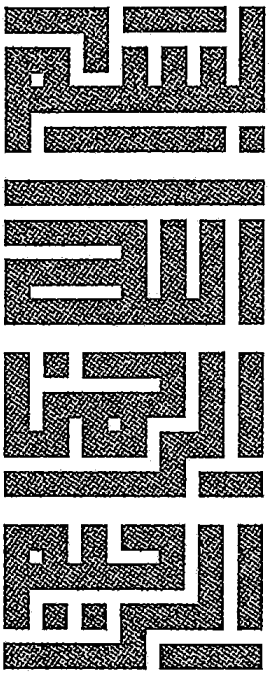

# প্রাক্‌কথন

আলহামদুলিল্লাহ! ফিকহি মাকালাতের ৫ম খণ্ড এখন আপনাদের হাতে। যদিও এ খণ্ডটি আসতে কয়েক বছর সময় লেগেছে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে চতুর্থ খণ্ড এসেছিলো। দীর্ঘ সাত বছর পর এ খণ্ডটি প্রকাশনীতে এসেছে। যেহেতু চতুর্থ খণ্ডের পর মহান আল্লাহ আমার থেকে দুটি রচনার কাজ নিয়েছেন। শরহে বেকায়া কিতাবের শেষাংশের 'আল-বেলায়া' নামক ব্যাখ্যাগ্রন্থটি চার খণ্ডে শেষ হয়েছে। এটি পূর্ণ করার পর আমার মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমার সম্মানিত উসতাজ শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর জুমার বয়ান সমগ্রকে 'খুতুবাতে উসমানি' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লিখিত দুটি রচনার কাজ শেষ করার পর ফিকহি মাকালাতের প্রতি দৃষ্টি দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এক বছর মেহনত করার পর এই খণ্ডের বিষয়বস্তু প্রস্তুত হয়েছে। এ খণ্ডটিতে নিচের মাকালাগুলো স্থান পেয়েছে—

১. বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি দর্শন

সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণাক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের ডাভোস শহরে

এই ফোরামের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যার আলোচ্য বিষয় ছিলো 'বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট এবং তার প্রতিকার'। সে সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উল্লিখিত বিষয়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। পরবর্তী সময়ে মাওলানা হাসসান কালিম সে প্রবন্ধের উর্দু তরজমা করেন। এই তরজমা 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

## ২. হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন

রচনাটি 'زراعة عضو استوصل فى حد أو قصاص' নামক আরবি মাকালার তরজমা। 'ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি' জেদ্দা কর্তৃক ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ১৪-২০ তারিখে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়। 'بحوث فى قضايا فقهية معاصرة'-এর ১ম খণ্ডে মাকালাটি প্রকাশিত হয়েছে।

## ৩. কোনো জিনিস বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদ বিক্রয় করা

মাকালাটি 'أحكام التورق وتطبيقاته المصرفية' নামক আরবি মাকালার তরজমা। মাকালাটি 'রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামি' কর্তৃক পরিচালিত 'আল-মাজমাউল ফিকহি, মক্কা মুকাররমা' -এর পক্ষ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আয়োজিত সপ্তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। 'بحوث فى قضايا فقهية معاصرة'-এর ২য় খণ্ডে মাকালাটি প্রকাশিত হয়েছে।

## ৪. بائن তালাকপ্রাপ্তার খরচ ও আবাসনের হুকুম

মাকালাটি মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'تكملة فتح الملهم'-এর একটি অংশ। শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) এখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জনসাধারণের উপকারের প্রতি লক্ষ করে এখানে তার তরজমা প্রকাশ করা হচ্ছে।

## ৫. ইজতিহাদ ও তার বাস্তবতা

'এটি একটি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ। যা শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি জামেয়া দারুল উলুম করাচির 'তাখাসসুস ফিদ

দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের সামনে দিয়েছিলেন। যেটি মৌলবি মুহাম্মাদ জাকারিয়া খজদারি ও মৌলবি তাহের মাসউদ লিখেছেন। 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।'

## ৬. যুগের পরিবর্তনে কি হুকুমে পরিবর্তন আসবে

'এটিও একটি তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ। যা শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি 'জামেয়া দারুল উলুম করাচির' 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের সামনে দিয়েছিলেন। এটিও মৌলবি মুহাম্মাদ জাকারিয়া খজদারি ও মৌলবি তাহের মাসউদ লিখেছেন এবং 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।'

## ৭. 'المرأة كالقاضي'নারী বিচারকতুল্য

'كالقاضي المرأة'—'নারী বিচারকতুল্য' কথাটির উদ্দেশ্য হলো 'তালাক নিয়ে নাও' কথার হুকুম। তালাকের সংখ্যার বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য হওয়ার ক্ষেত্রে বিধান। এটি একটি বিস্তারিত ফতোয়া ও তার উত্তর। যেটি 'ফাতাওয়া উসমানিতে' প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যাপক উপকারের জন্য সেটিকে মাকালার অংশ করা হলো।

## ৮. আল-হুদা ইন্টারন্যাশনালের চিন্তাধারা ও বিশ্বাসগুলোর হুকুম

এটি একটি বিস্তারিত ফতোয়া ও তার উত্তর। যা ফাতাওয়া উসমানিতে প্রকাশিত হয়েছে। জনসাধারণের উপকারার্থে প্রবন্ধসমগ্রের অংশ করে সেটিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

—মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মায়মান

শিক্ষক : জামেয়া দারুল উলুম করাচি
২১ শাওয়াল, ১৪৩২ হি.
২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি.

# লেখকের কথা

গত দু-বছরে পুরো বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের শিকার হয়েছে। যে কারণে বড়োবড়ো ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গেছে। বছরের পর বছর অস্বাভাবিক লাভ অর্জনকারী কোম্পানিগুলো অর্থশূন্য হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যান্য কোম্পানির শেয়ারের দাম এত দ্রুতগতিতে নেমে গেছে যে, মানুষ ঘুরে বসার আগেই অনেক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। যদিও এই সংকটের শুরু হয়েছিলো আমেরিকা থেকে। কিন্তু এর প্রভাব সারা বিশ্বেই পড়েছে। ব্যাবসায়িক মন্দা সব দেশেই সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এই সংকটের কারণ ও তার প্রতিকারকে কেন্দ্র করে বিশ্বের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণ বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম'কে অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্বের সব থেকে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে সুইজারল্যান্ডের 'ডাভোস' শহরে একটি বড়ো ধরনের সেমিনার আয়োজন করা হয়। আর সেখানে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, অর্থমন্ত্রী, অর্থনৈতিক পলিসি মেকারগণ এবং বড়োবড়ো কোম্পানির নির্বাহি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

২০১০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সেমিনার আয়োজন করা হয়, তার মূল আলোচ্যবিষয় ছিলো—বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে কোন ধরনের সংস্কারের

প্রয়োজন। সারা বিশ্বের প্রায় আড়াই হাজার বিশেষজ্ঞ এই সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন। সেমিনার অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে তার চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে এভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, আপনি শুধু অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আসবেন না। বরং সেমিনারের আগে এমন একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করার চেষ্টা করবেন, যেখানে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মৌলিক ও নীতিগত কী সমস্যা রয়েছে সেটি স্পষ্ট করবেন। এবং তাতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও নীতির আলোকে সেসব সমস্যাকে কীভাবে দূর করা যেতে পারে তার বিশদ বিবরণ থাকবে।

আমার ধারণা অনুযায়ী ইসলামি অর্থনীতিকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের এটি একটি সুন্দর সুযোগ ছিলো। কেননা, গভীর দৃষ্টিতে তাকালে এইসব সংকট মূলত সেসব লেনদেনের ফলস্বরূপ অনেক আগে থেকেই ইসলাম যেগুলোর প্রতি বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছে। অর্থনীতি ও ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি ইসলামি মুদ্রানীতির অনুসরণ করা হতো, তাহলে কখনোই এ ধরনের সমস্যা সামনে আসতো না। এ কারণে আমি নিজেই উল্লিখিত বিষয়ে কিছু লেখার ইচ্ছে রাখতাম। এমতবস্থায় 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের' এই আমন্ত্রণ সে ইচ্ছাকে আরও শক্তিশালী করে দিলো। সুতরাং এ চিন্তার ওপর নির্ভর করে ইংরেজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলাম। 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' তাদের ওয়েবসাইটে সেটি প্রকাশ করে এবং তার সারাংশ একটি রিপোর্টে প্রকাশ করে তাদের বাৎসরিক প্রেস ব্রিফিং-এ সেটিকে সামনে আনে। ঠিক তখনই পশ্চিমাদের সেমিনারে প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেলাম। মূল প্রবন্ধটি আমার ওয়েবসাইটেও রয়েছে। যারা সেটি পড়েছেন, তাদের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে যে, সেটিকে আরবি ও উর্দু ভাষায় তরজমা করা হোক। সাউদি আরবের রিয়াদের একটি পত্রিকা প্রবন্ধটির আরবি তরজমা প্রকাশ করেছে। আর উর্দু তরজমারর দায়িত্ব নিয়েছেন প্রিয় হাসসান কালিম। মহান আল্লাহর অনুগ্রহে অল্পদিনে খুব সুন্দরভাবে তার তরজমার কাজ শেষ করেছেন। যেটি আমার পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার দেখার পর প্রকাশিত হচ্ছে।

'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' মৌলিকভাবে যেহেতু অমুসলিমদের প্রতিষ্ঠান। এ কারণে প্রবন্ধটি পড়ার সময় এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, এখানে তারাই সরাসরি শ্রোতা। প্রবন্ধ লেখার সময় ছিলো অল্প এবং অতি দীর্ঘতা থেকে বাঁচার বিষয়টি সামনে রেখে লেখা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আর সেসব অর্থনীতি বিষয়ক পরিভাষার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি, যেগুলো ফোরামে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তই অপ্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু উর্দু অনুবাদের সময় প্রয়োজন ছিলো বিশেষ কিছু জায়গায় কিছু ব্যাখ্যা সংযোজন করা। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় মাওলানা হাসসান কালিম টীকার সে প্রয়োজনকেও যথার্থভাবে আদায় করার চেষ্টা করেছেন— جزاه الله تعالى خيرا وبارك فى عمره وعلمه و عمله

এখন এ প্রবন্ধটি আপনাদের সামনে। মহান আল্লাহ সেটিকে পবিত্র দরবারে কবুল করে ইসলামি দর্শনের বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে এবং তার ওপর আমল করার চেষ্টা করার মাধ্যম হিসাবে পরিণত করুন। আমিন।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
১১ রবিউল আওয়াল ১৪৩০ হি.

# সূচি

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি দর্শন-১৯

হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন-৬৭

বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা-১০৯

তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ও আবাসস্থলের হুকুম-১৫১

ইজতিহাদ ও তার বাস্তবতা-১৭১

যুগের পরিবর্তনে কি শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন আসবে?-১৮৯

'তালাক নিয়ে নাও' কথার হুকুম, المرأة كالقاضي-এর উদ্দেশ্য,
তালাকের সংখ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিধান-২০৩

আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা ও
আকিদা-বিশ্বাসের বিধান-২২৩

# বিস্তারিত সূচি


বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি দর্শন ২১
বাজারি অর্থব্যবস্থা ও সম্পদের সুষম বণ্টন ২৩
লাভ অর্জনের পদক্ষেপ এবং লোভ ২৭
টাকা-পয়সার বাস্তবতা ৩০
জুয়া-ফটকাবাজি (Speculation) ৪৭
ব্যবসার কাঠামো কেন্দ্রিক অপরিহার্য শাখাগুলো ৪৯
শর্ট সেল (Short Sale) (মালিকানা
অর্জন না করেই বিক্রয় করা) ৫০
ঋণ (Debts) বিক্রয় করা ৫১
স্বচ্ছতা ৫৩
বর্তমান সংকট কীভাবে সৃষ্টি হলো? ৫৬
সমস্যা এবং সমাধান ৫৮
কতিপয় ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কথা ৬১

হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন ৬৯
আলোচনার পয়েন্ট ৭০
প্রথম মাসআলা : আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা ৭১
হানাফি মাজহাব ৭৭
শাফিয়ি মাজহাব ৮০
হাম্বালি মাজহাব ৮১
প্রধান্যপ্রাপ্ত অভিমত ৮২
দ্বিতীয় মাসআলা : কেসাসে কর্তিত অঙ্গের প্রতিস্থাপন ৮৫
হাম্বালি মাজহাব ৮৬
মালিকি মাজহাব ৮৯
হানাফি মাজহাব ৯০
তৃতীয় মাসআলা : প্রতিস্থাপিত অঙ্গটি নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে? ৯১
মালিকি মাজহাব ৯৯

হাম্বালি মাজহাব ১০১
চতুর্থ মাসআলা : হদে কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন ১০৩

বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা ১১১
'তাওয়াররুকের' শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ। ১১১
ফকিহদের কাছে তাওয়াররুকের হুকুম ১১৪
ফকিহগণ যে তাওয়াররুকের অনুমতি দিয়েছেন, তার বাস্তবতা ১৩৫
বর্তমান সময়ের ব্যাংকসমূহে তাওয়াররুকের
কার্যত চলমান প্রক্রিয়া ১৩৯
তাওয়াররুকের লেনদেনে ব্যাপকতা ১৩৯
বিক্রেতার পক্ষ থেকে তাওয়াররুককারীকে
পণ্য ক্রয়ের ওকিল বানানো ১৪২
দ্বিতীয়বার বাজারে পণ্য বিক্রয় করার জন্য
তাওয়াররুককারীর পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে ওকিল বানানো ১৪৩
আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের মাধ্যমে তাওয়াররুক ১৪৪
আলোচনার সারকথা ১৪৮

তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ও আবাসস্থলের হুকুম ১৫৩

বিষয় বস্তু নির্বাচন ১৭৩
উত্তরের প্রয়োজনীয়তা ১৭৩
পশ্চিমা ভ্রান্ত ধারণা ১৭৪
কুরআন-হাদিসের ভাষ্যে ইজতিহাদ বৈধ ১৭৪
ইজতিহাদ দ্বারা কেবল শিথিলতা ও সহজতা উদ্দেশ্য ১৭৪
ইজতিহাদ শব্দের উৎস ১৭৫
ইজতিহাদের ক্ষেত্র ১৭৬
কুরআন-হাদিস স্পষ্ট হুকুম না দেওয়া ক্ষেত্রগুলো ১৭৭
কুরআন-হাদিসের অকাট্য বক্তব্যে ইজতিহাদ হতে পারে না ১৭৭
ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার অর্থ ১৭৮
শুধু ইজতিহাদে মুতলাকের দরজা বন্ধ হয়েছে ১৮০

শাখাগত ইজতিহাদ ১৮১
যুগের পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ১৮২
হুকুমের ভিত্তি ইল্লত, হেকমত নয় ১৮৩
একটি বাস্তব উদাহরণ ১৮৩
ইল্লতের অর্থ ১৮৪
ইল্লতের ওপর হুকুমের মূলভিত্তি হওয়ার প্রথম ফিকহি উদাহরণ ১৮৪
দ্বিতীয় উদাহরণ ১৮৪
মদ হারাম হওয়ার ইল্লত নেশা নয়, বরং মদ হওয়াটিই ইল্লত ১৮৫
ইল্লত ও হেকমতের মধ্যে পার্থক্য ১৮৫
তৃতীয় উদাহরণ ১৮৬
জুলুম থেকে বাঁচানো সুদের ইল্লত নয়; হেকমত ১৮৭
ইজতিহাদের বিষয়ে পাওয়া ভ্রান্ত ধারণার কারণগুলো ১৮৭

যুগের পরিবর্তনে কি শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন আসবে? ১৯১
আধুনিকতা প্রিয় লোকদের অভিযোগ ১৯২
যুগের সঙ্গে শরিয়তে বিধানের পরিবর্তন কি শর্তহীন ও ব্যাপক? ১৯২
ইলম অর্জনের মাধ্যম কি উন্মুক্ত? ১৯২
থানবি রহ.-এর বর্ণিত উপমা ১৯৩
বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন ১৯৪
الاحكام تتغير بتغير الزمان-এর প্রেক্ষাপট ১৯৫
হুকুম পরিবর্তন হওয়ার শর্তাবলি ১৯৫
বিভ্রান্তির উৎস ১৯৬
মনগড়া ইল্লতের দৃষ্টান্ত ১৯৭
ইল্লতের অনুপস্থিতিতে হুকুমও অনুপস্থিত থাকবে ১৯৯
ইল্লত পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি ২০০
জনস্বার্থ কখন হুকুম পরিবর্তনের কারণ হতে পারে? ২০০
সারকথা ২০২

‘তালাক নিয়ে নাও’ কথার হুকুম,
المرأة كالقاضي-এর উদ্দেশ্য, তালাকের সংখ্যায়
স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিধান ২০৫
মেয়ের বর্ণনা ২০৮
ছেলের বক্তব্য ২০৯
উত্তর ২১০
এ ফতোয়াটিকে যারা সঠিক বলেছেন ২২১

আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা
ও আকিদা-বিশ্বাসের বিধান ২২৫
ইজমায়ে উম্মত থেকে দূরে সরে একটি নতুন পথ অনুসরণ করা ২২৬
অমুসলিম এবং ইসলামের বিপক্ষের শত্রুদের
দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষাবলম্বন করা ২২৬
হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটানো ২২৭
ফিকহি মতানৈক্যের মাধ্যমে দিনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা ২২৭
দীনকে অতি সহজ করার দৃষ্টিভঙ্গি ২২৮
বিবিধ মতাদর্শ ২২৯
আমার জিজ্ঞাসা ২৩০
উত্তর ২৩০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

# বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও ইসলামি দর্শন

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

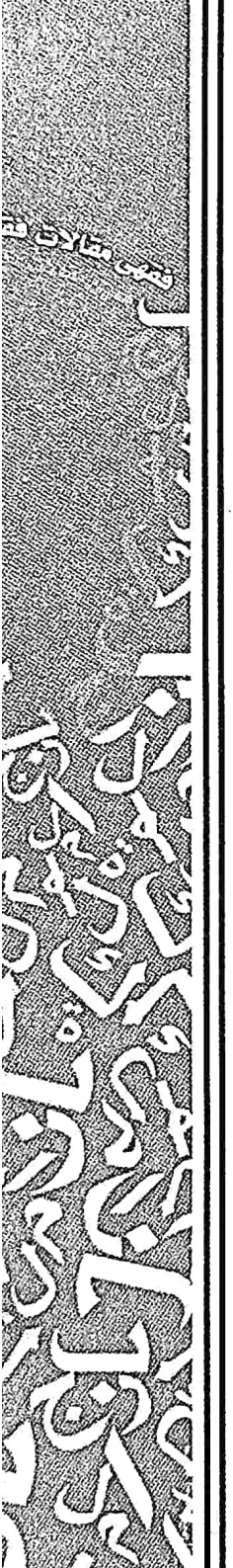

সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’। অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণাক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বের সবথেকে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান মনে করা হয়। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে সুইজারল্যান্ডের ‘ডিউস’ শহরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার আলোচ্য বিষয় ছিলো—‘বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও তার প্রতিকার’। সে সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ)-কে আমন্ত্রণ জানানো হয়। উল্লিখিত বিষয়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন। পরবর্তী সময়ে মাওলানা হাসসান কালিম সে প্রবন্ধের উর্দু তরজমা করেন। প্রবন্ধটির তরজমা ‘মাসিক আল-বালাগ’ পত্রিকায় কয়েক কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

—আবদুল্লাহ্ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

# বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি দর্শন

আজকের বিশ্ব-অর্থনীতি এমন এক বস্তুবাদী ও ধর্মহীন চিন্তায় অভ্যস্ত হয়েছে, যা অর্থনীতির মধ্যে ধর্মের প্রবেশকে কল্পনাও করে না। আর এ চিন্তাধারার ভিত্তি হলো এই বচন—'অর্থনীতি হলো ধর্মীয় গণ্ডির বাইরের জিনিস।' এরপরও একটি হাস্যকর বিষয় হলো, প্রতিটি ডলারের গায়ে এ কথাটি লেখা থাকে—

'In God we trust.'

'আমরা স্রষ্টার ওপরই ভরসা করি।'

অন্য দিকে যখন ডলার উপার্জন বা সেটি বণ্টন ও ব্যয় করার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণের কথা আসে, তখন স্রষ্টার ওপর থেকে সব ধরনের ভরসা উঠে গিয়ে শুধু মানবিক চিন্তাধারার ওপর গিয়ে দাঁড়ায়। যেগুলোর মূলভিত্তি হলো ব্যক্তি ও যুক্তি। এ প্রেক্ষাপটের সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক এমন মনে করা হয় যে, কেমন যেন অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্কই নেই।

সম্ভবত এটিই প্রথম পদক্ষেপ যেখানে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করতে বিভিন্ন শ্রেণির বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এখানে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দদেরও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তারা চারিত্রিক এবং নীতিগত দিক থেকে তাজা ও সতেজ চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতির নবরূপায়ণ করতে নিজেদের প্রস্তাব পেশ করবেন। এই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ ধর্মীয় মহল থেকেও পরিপূর্ণ সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।

ইসলামি শিক্ষা, বিশেষ করে ইসলামি অর্থনীতির আমি একজন নগন্য ছাত্র। এ অবস্থান থেকেই ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষার আলোকে কিছু মৌলিক বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করবো। যেগুলোর ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিকার অনুসন্ধানে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু আলোচনা সামনে বাড়ানোর আগে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা আবশ্যক।

প্রথম কথা : যখন ইসলামি অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক বিষয়াদির আলোচনা করা হয়, তখন অনেকের মাথায় এমন চিন্তা আসে যে, মুসলিম আলেমগণ এ কারণে সেগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয় যে, সেগুলো তাদের ধর্মীয় প্রয়োজন। অথবা অন্যভাবে বললে এ কথা বলতে হয় যে, এসব নীতিসমূহের সম্পর্ক কেবল মুসলিমদের সঙ্গে। অন্য কোনো জাতি সেগুলো থেকে কোনো উপকার পাবে না। এ ধরনের চিন্তাধারা একেবারেই ভুল। যদিও এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, আকিদা বিষয়ে ইসলামের স্বতন্ত্র নীতি রয়েছে, যেটি থেকে কোনো অমুসলিম উপকৃত হতে পারবে না। কিন্তু ইসলামের রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দর্শন থেকে পার্থিব উপকার হওয়াটা শুধু মুসলিমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং সেগুলো ব্যাপকভাবে সারা বিশ্বের মানুষের সফলতা ও উন্নতির জন্য প্রণীত।

দ্বিতীয় কথা : এ বিষয়ে আমি যে আলোচনা করছি, আধুনিক অর্থনৈতিক দর্শনে ডুবে থাকা সমাজে সেটি অনেক বড়ো ধরনের পরিবর্তন মনে হবে। কিন্তু পরীক্ষিত কথা হলো আমাদের বর্তমান অর্থনীতির রূপরেখা ত্রুটিতে ভরপুর। তাই আমরা যদি এখানে বড়ো ধরনের কোনো সংস্কার আনতে চাই, তাহলে সে সংস্কারের প্রস্তাবনা দেখে ভয় পাওয়া উচিত হবে না। তবে সে ক্ষেত্রে শর্ত হলো যে, সংস্কারটি শক্ত ও সঠিক দলিলের আলোকে হতে হবে। বর্তমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকট যেহেতু আন্তর্জাতিক পর্যায়ের তাই সেটির দাবি হলো, বর্তমান অর্থনীতিতে বড়ো ধরনের সংস্কার আনা। এমন আন্তর্জাতিক সংকট দূর করতে সাধারণ কোনো পদক্ষেপ কাজে আসবে না। সুতরাং আমাদের অর্থনীতিকে তন্নতন্ন করে দেখতে হবে। এভাবে তন্নতন্ন করে দেখার পর সঠিক নীতি ও দর্শনের ওপর সেটিকে সাজাতে হবে। যার মাধ্যমে এমন একটি অর্থনীতি অস্তিত্বে আসবে, যা একদিকে ইনসাফভিত্তিক ও অন্য দিকে ভারসাম্যপূর্ণ হবে। আর ভবিষ্যতের বিপদ থেকে সংরক্ষিত থাকার উপযুক্ত হবে।

এই ফোরামে এমন ব্যাপক সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করতে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের চেয়াম্যানের সেই অর্থবহ পর্যালোচনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং উৎসাহ জুগিয়েছে, যা ফোরামের গত সেমিনারে তিনি উপস্থাপন করেছিলেন। বিশেষ করে তার বক্তব্যের এ অংশটুকু অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে—

'আজ আমরা এক চূড়ান্ত সীমানায় উপস্থিত হয়েছি। যার পরে আমাদের জন্য শুধুমাত্র একটি রাস্তা খোলা রয়েছে যে, হয় আমরা সংস্কার করবো অথবা ধারাবাহিক অধঃপতন ও বিপদের মুখোমুখি হবো।'

সংস্কার আবশ্যক হয়ে পড়েছে বিধায় সংস্কারের কোনো একটি প্রস্তাব বা চিন্তাধারা চিন্তা-চেতনার বাইরে না থাকা চাই। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যে ধরনের সংস্কার প্রয়োজন, তার বিস্তৃত পরিধিকে বেষ্টন করতে যদিও এই আলোচনা অপ্রতুল। তবে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এবং সূক্ষ্ম চিন্তাভাবনার সঙ্গে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে মৌলিক কিছু প্রস্তাবনা উপস্থাপন করছি।

## ১. বাজারি অর্থব্যবস্থা ও সম্পদের সুষম বণ্টন

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেসব মৌলিক নীতিমালার প্রতি পবিত্র কুরআন বেশি গুরুত্বারোপ করেছে তার মধ্যে একটি হলো, সমাজে সৃষ্ট সম্পদ ইনসাফ ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতিতে বণ্টন হওয়া আবশ্যক। যেন গুটি কয়েক মানুষের হাতে তা কুক্ষিগত না হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে বলা হচ্ছে—

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾

'যেন এমনটি না হয় যে, তোমাদের সম্পদশালীদের হাতেই সম্পদ ঘুরতে থাকে।'[১]

অর্থের বাজারকে চাঙা করতে কোনো নীতি প্রণয়নের সময় এ বিষয়টির প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করা জরুরি। অনেক বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদই মুক্তবাজারঅর্থব্যবস্থা—Market Economy[২]—কেই ইনসাফহীন সম্পদ

---

[১] সুরা হাশর, আয়াত : ৭।

[২] বাজারি অর্থ ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হিসাবেও আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর দ্বারা এমন অর্থব্যবস্থা উদ্দেশ্য, যাতে ব্যক্তির স্বতন্ত্র মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে তাতে নিজের মুনাফা অর্জনের জন্য কারবারে পুরোপুরি স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। আর জোগান ও চাহিদার

বণ্টনের জন্য দায়ি করেছেন। যদিও বাজারের এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিরোধিতাকারীরা তাদের পক্ষ থেকে, যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা (Planned Economy[৩])-এর প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে, সেটি অগ্রাহ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এটি একটি বাস্তবতা যে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ওপর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার পক্ষ থেকে যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয়েছে, তার সবগুলোই একেবারে ভুল ছিলো না।

এমনটি হওয়া উচিত ছিলো যে, বাজারি অর্থব্যবস্থার প্রতিনিধিরা নিজেরাই তাদের নীতির পর্যবেক্ষণ করবে। যেন ইনসাফহীন সম্পদ বণ্টনের কার্যক্রমের ইতি টানা যায়। তবে এটি কত বড়ো আফসোসের কথা যে, যখন সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দর্শন বাস্তবে অকার্যকর প্রমাণিত হয়ে, সেটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো তখন পুঁজিবাদি অর্থনীতিবিদগণ সেটিকেই তাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির ময়দানে বিশাল বিজয় মনে করে খুশিতে আত্মহারা হলো। তাদের অনেকে তো এমনও ছিলো যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ার খুশিতে এ কথা ঘোষণা দিলো যে, তাদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই হলো একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। আনন্দের কারণে তারা এ ভবিষ্যৎবাণীও করতে লাগলো যে, এখন দ্বিতীয় কোনো অর্থনীতির দর্শন জন্মও নিতে পারবে না। তাদের এমন উত্তেজনা ও আনন্দ এ বাস্তবতাকে দর্শনের ওপর উত্থাপিত অভিযোগ কোনো দিক থেকেই ভিত্তিহীন ছিলো না। দুনিয়ার সব জায়গাতেই ধনী-গরিবের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব ছিলো। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিদায়ের পরে সেটি এখনো বিদ্যমান আছে।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, (চাহিদা-জোগানের ভিত্তিতে) বাজারের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে একেবারেই অস্বীকার করা ভুল। কিন্তু এর সঠিক ব্যবহার এবং ইনসাফ ভিত্তিক সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য এটিও জরুরি ছিলো যে, সেটিকে কিছু সীমাবদ্ধতার আওতাভুক্ত করতে হবে। যদিও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো তাদের বাজারের অর্থনীতির ওপর সামান্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে কিন্তু মৌলিক দর্শনে যে বিষয়গুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন ছিলো, তা থেকে তাদের চিন্তাধারা একেবারেই খালি রয়েছে।

---

স্বয়ংক্রিয় বিধির আওতায় পণ্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

[৩] পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, যাতে উৎপাদন মাধ্যমকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি প্রদানের পরিবর্তে তাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা গণ্য করা হয়। আর রাষ্ট্রই উৎপাদন সামগ্রীর বণ্টন এবং পণ্যসামগ্রীর মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ব্যাপকভাবে কোনো অর্থনৈতিক দর্শনকে উত্তম মনে করার জন্য কেবল এটি যথেষ্ট নয় যে, আলোচনার সব মাপকাঠিকে সে বিষয়ে পঠিত দর্শনের ওপর রাখা হবে। আবার এটিও যথেষ্ট নয় যে, যথাযথ গতির সঙ্গে উৎপাদন তার পূর্ণ শক্তির সঙ্গে চলমান রয়েছে এমন পরিস্থিতির ওপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এরচেয়ে আরও কয়েকগুণ বেশি গুরুত্বের কথা এই যে, প্রকৃত অর্থে সম্পদ বণ্টনের নীতিকে ইনসাফভিত্তিক করার চেষ্টা করা। যেন সব শ্রেণির প্রয়োজনকে ইনসাফের সঙ্গে পূরণ করা সম্ভব হয়। আর এই উদ্দেশ্য অর্জনে বাজারের লেনদেনে যে ধরনের মতাদর্শগত বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন সে ব্যাপারে আজ পর্যন্ত উৎকৃষ্টমানের কোনো গবেষণা হয়নি। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, সব ধরনের নীতি ও আইন থাকার পরেও বাজারে উৎপাদিত সম্পদ আজ পর্যন্ত গুটি কয়েক সম্পদশালীদের হাতে ঘুরেফিরে আসছে। এমনকি আমেরিকার মতো স্থিতিশীল অর্থনীতির দেশেও সম্পদ বণ্টনের অবস্থা এই যে, জি ওলিম ডোমহোপ সম্পদের ঘনত্বের নকশা নিচের শব্দে একেছেন—

'যুক্তরাষ্ট্রে সম্পদের লেনদেন কেবল গুটি কতক লোকের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে ১% লোক যাদেরকে উঁচু মানের মনে করা হতো। তাদের হাতে রাষ্ট্রের মোট সম্পদের ৩৪.৬% সম্পদ রয়েছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকের পরিমাণ হলো ১৯%। (যাদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের ব্যবস্থপনার দায়িত্বে, মধ্যবিত্ত এবং ছোটোখাটো কাজকর্মের মালিকরা রয়েছে।) তারা ৫০.৫% সম্পদের মালিক। যার সারকথা এটি দাঁড়ায় যে, আমেরিকার ৮৫% সম্পদের মালিক তাদের দেশের মোট জনগণের মাত্র ২০% লোক। আর বাকি ৮০% হলো শ্রমিক ও বেতনভুক্ত কর্মচারি। এদের জন্য মোট সম্পদের মাত্র ১৫% সম্পদ রয়েছে। আর যদি শুধু সম্পদের দৃষ্টিতে দেখা হয়। (অর্থাৎ নিজেদের ঘরের সম্পদ বের করে বাহিরে থাকা বিক্রয়যোগ্য সম্পদের সমষ্টি দেখা হয়।) তাহলে উপরে বর্ণিত উঁচুমাপের সম্পদশালীদের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাদের সম্পদের পরিমাণ ৩৪.৬% এর পরিবর্তে আরও বেশি হবে। অর্থাৎ তারা মোট সম্পদের ৪২.৭% সম্পদের মালিকানা রাখে।'

এ কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই যে, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে অবস্থা এরচেয়ে আরও বেশি ভয়াবহ। প্রকৃতপক্ষে এমন বৈষম্যময় ও ইনসাফহীন সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সারা বিশ্ব চিৎকার করছে। কিন্তু খুব

কম লোকই এ বিষয়টি অনুধাবন করেছে যে, প্রকৃত পক্ষে মৌলিকভাবে এটি হলো ধনী লোকদের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা সংকট। যারা সম্পদের পাহাড় নিয়ে খেলায় মত্ত। এমন অবস্থায় হঠাৎ করে তাদের আয়ের সিঁড়ি ভেঙে একেবারে নিচে এসে পড়ে,। পক্ষান্তরে গরিব লোকদের বিষয়টি হলো, তারা সবসময় অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছে। কিন্তু তাদের পক্ষে না কেউ আওয়াজ তুলছে এবং না তাদের অবস্থাকে কেউ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট বলে স্বীকার করছে। কারণ, সবসময়ই ধনীদের সম্পদ বিদ্যুৎগতিতে বেড়ে চলছে। কেবল তখনই অর্থনৈতিক সংকট বলে স্বীকার করা হয়েছে যখন তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পদের দরজার ওপর সমস্যা শুরু করেছে। অথচ এ সংকটের কারণে ধনীদের কেউই এমন সংকটের শিকার হয়নি, যেমনটি গরিব লোকের প্রতিদিন হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও গরিবদের স্থায়ী অর্থনৈতিক সংকট বিশ্বের দৃষ্টিকে তাদের দিকে টানতে সক্ষম হয়নি, যেমনটি বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক সংকট টানতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু কমপক্ষে এ ব্যাপারে অন্যের কষ্টে আমাদের কষ্ট অনুভব করা উচিত। আর এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে এটি পরখ করা দরকার যে, সেইসব ত্রুটি কী? যেগুলো অধিকাংশ জনগণকে স্থায়ী দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আর পর্যায়ক্রমে ধনী লোকদেরকে অর্থের ভান্ডারের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। আসুন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানের অর্থনীতির ফর্মুলাকে যাচাই করি।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, চাহিদা ও জোগানের শক্তি বাজারের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে তার জন্য শর্ত হলো, সেটিকে স্বাভাবিক ও স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান নীতিতে এমন অনেক নীতি রয়েছে যা সম্পদশালীদের ঠিকাদারী করার সুযোগ করে দেয়। যার কারণে বাজারের শক্তি বাধাগ্রস্ত হয়ে সেটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় এবং বাস্তবিক সাম্যতার (real equilibrium) কোনো সুযোগই পায় না। এ ছাড়া আরও এমন কিছু পদক্ষেপ রয়েছে, যেগুলো চাহিদা ও জোগানের এমন একটি কৃত্রিম পদ্ধতির জন্ম দেয়, যা কোনোভাবেই বাস্তবিক অর্থনীতির প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে না। সারকথা এই যে, আমাদের এমন কিছু নেতৃত্ব ও নীতির প্রয়োজন, যেগুলো আমাদের বর্তমানের অর্থনীতিতে থাকা মৌলিক সমস্যাগুলো দূর করতে পারবে। নিচে সেসব নেতৃত্ব ও নীতি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করছি।

## ২. লাভ অর্জনের পদক্ষেপ এবং লোভ

হিজরি প্রথম শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ আলেম হাসান বসরি রহ.। তিনি খুব সুন্দর একটি বাক্যে টাকা-পয়সার বাস্তবতা বয়ান করেছেন। তিনি বলেন—

'টাকা-পয়সা তোমার এমন সঙ্গী, যে তোমার থেকে পৃথক হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমাকে কোনো উপকার করতে পারবে না।'

এটি একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, কিন্তু জীবন্ত দর্শন। এটি নিজের মধ্যে দুটি মৌলিক চিন্তাধারাকে ধারণ করেছে। আর এ চিন্তাধারা দুটি অর্থনীতির গতিকে সঠিক পথে চালানোর জন্য সীমাহীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. প্রথম কথা এই যে, সত্তাগতভাবে টাকা-পয়সা মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সেটি একটি মাধ্যম মাত্র।

খ. দ্বিতীয় কথা হলো, টাকা-পয়সা সত্তাগতভাবে কোনো উপকারিতা রাখে না। তার থেকে সে সময়ই উপকারিতা পাওয়া যাবে, যখন সেটিকে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে তার বিনিময়ে সত্তাগতভাবে উপকারী কোনো জিনিস ক্রয় করা হবে।

আসুন, আমরা এখন বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণে উল্লিখিত দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে কিছু আলোচনা করি।

'রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ নেই' (Laissez faire) এই নীতিটি বর্তমানে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ভিত্তিক দেশসমূহেও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সেটি নিজস্ব উপকারীতার উপকরণ স্বরূপ (Profit motiv) বাজারের অর্থনৈতিক অবস্থাতে (Market economy) অর্থনৈতিক ভূমিকা রাখে। সেটি যদি সবসময় নিজ সীমার মধ্যে থাকতো তাহলে তো কখনোই সমস্যা সৃষ্টি হতো না। কিন্তু কার্যত এমন হয় যে, কখনো কখনো নিজের লাভের পদক্ষেপ দ্বারা উদ্দেশ্য হয় লাগামহীনভাবে বেশি বেশি লাভ অর্জন করা। চাই তার কারণে অন্য কারও ক্ষতি সাধন করার প্রয়োজন পড়ুক না কেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আরোপিত বিধিনিষেধ আপন লাভ অর্জনের আগ্রহ ও লোভ-লালসার মাঝে চোখে পড়ার মতো কোনো পার্থক্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

মানুষের সামনে যখন কোনো নৈতিক ও চরিত্রগত উদ্দেশ্য থাকবে না এবং আপন লাভ অর্জনকেই অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য মনে করা হবে তখন মৌলিক

লাভ অর্জনই জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। আর এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ তার সম্ভাব্য সব ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে বেশি বেশি লাভ অর্জন করে সম্পদের পাহাড় গড়ার সীমাহীন লোভ-লালসার শিকার হবে। এরপর সে তার মালিকানাধীন নোট ও মুদ্রার গণনায় সংখ্যার আধিক্যকেই কেবল খুশির কারণ মনে করবে। সে এটি ভাববে না যে, বাস্তবে সেসব নোট ও মুদ্রা দিয়ে কি উপকার অর্জন করতে পেরেছে? এ শ্রেণির মানুষের অবস্থাকে পবিত্র কুরআন নিচের শব্দে এভাবে বর্ণনা করেছে—

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا . وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾

'বড়ো দুর্ভাগা সে ব্যক্তি। যে অন্যের অগোচরে তার প্রতি দোষারোপ করে এবং মুখের ওপর অপবাদ দেয়। যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করে এবং সেটি গুনতে থাকে।'[৪]

কেউ যখন এমন লোভ-লালসার শিকার হবে, তখন সম্পদের কোনো পরিমাণই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বস্তুই তার পিপাসা নিবারণ করতে পারবে না। সবসময়ই সে তার সম্পদ বাড়ানোর চিন্তাভাবনায় লেগে থাকবে। চাই সেটি ইনসাফ ভিত্তিক উপকরণের মাধ্যমে হোক বা বেইনসাফি উপকরণের মাধ্যমে হোক। সে তার সম্পদ বাড়াতেই থাকবে। এমনকি সে তার কষ্টের সব সম্পদ নিজ ওয়ারিসদের জন্য রেখে খালি হাতে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। পবিত্র কুরআন বলছে—

﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ . حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾

'একে অন্যকে ছাড়িয়ে সম্পদের পাহাড় গড়ার লোভ-লালসা (দুনিয়ার আরাম-আয়েশ।) তোমাদেরকে উদাসীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। একেবারে কবরস্থানে গিয়ে পৌঁছা পর্যন্ত।'[৫]

শেষ জামানার নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

'আদম সন্তান যদি দুই উপত্যকা পরিমাণ স্বর্ণও পেয়ে যায়, তাহলেও সে তৃতীয় একটি উপত্যকার আশা করবে। কেবল মাটিই আদম সন্তানের পেট ভরতে পারবে।'[৬]

---

[৪] সুরা হুমাজা, আয়াত : ১-২।

[৫] সুরা তাকাসুর, আয়াত : ১-২।

[৬] বুখারি : ৬৪৩৬; মুসলিম : ১০৪৯।

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, সম্পদ অর্জনের আশা ছাড়া অর্থনৈতিক প্রাচুর্য হতে পারে না। এ দিকে লক্ষ করে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বৈধ উপকরণের মাধ্যমে সম্পদ অর্জনের আগ্রহ থাকা ভর্ৎসনাযোগ্য বিষয় নয়। যে লোভ-লালসাকে তিরস্কার করা হয়েছে, সেটি হলো এমন লোভ-লালসা যেটি ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সামনে বেড়ে দেখার পথে অন্তরায়। সঠিক ও ভুলের মধ্যে তার জন্য কোনো ব্যবধান হয় না। ইসলামি আকিদা অনুযায়ী জীবন এই দুনিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটির পরে আরও একটি জীবন আসবে। যেখানে জীবনের পূর্ণ হিসেব দিতে হবে। দ্বিতীয়বার আগত জীবনের জন্য লোভ-লালসা বড়ো ধরনের ক্ষতিকর জিনিস। যেখানে মানুষের কল্যাণই একমাত্র মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। তবে যদি শুধু এই দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টিতেও দেখা হয়, তাহলেও বাস্তবতা এই যে, এ ধরনের লোভ-লালসা আমাদের বর্তমান জীবনেও কোনো ধরনের সংশোধন আনবে না। তার প্রথম কারণ এই যে, লোভ-লালসা সবসময় ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে মিলে কাজ করে। আর এমন ব্যক্তিস্বার্থ ও অর্থনীতির সমষ্টিগত উপকারীতার সঙ্গে কোনো ধরনের যোগ-সাজশ নেই। বরং মানুষকে বেশি থেকে বেশি লাভ অর্জনের আগ্রহ ও চিন্তাধারায় লাগিয়ে রাখে। চাই তার কারণে পুরো সোসাইটি ক্ষতিগ্রস্ত হোক না কেন। এর চেয়ে আরও মারাত্মক হলো, এমন ব্যক্তিস্বার্থে লিপ্তব্যক্তি এ বাস্তবতাকেও ভুলে বসেছে যে, মানুষের উপকার এবং খেদমতের জন্যই সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে। সম্পদ ও অর্থের খেদমতের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। অর্থ-সম্পদের উদ্দেশ্য হলো শরীর ও আত্মার জন্য সুখ, শান্তি ক্রয় করা। এখন জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ যদি উপার্জনের ধান্দায় শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে সম্পদের আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। শারীরিক ও আত্মিক আরাম-আয়েশের কথা তো দূরের বিষয় বেশি থেকে বেশি সম্পদ উপার্জনের সীমাতিরিক্ত লোভ-লালসা মানুষকে হতাশা ও চিন্তার এক সীমাহীন স্রোতে ভাসিয়ে দেয়। যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআন বলছে—

﴿لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

'সম্পদ নিজেই মানুষের জন্য আজাবে পরিণত হবে।'[৭]

সারকথা এই যে, লোভ-লালসার ক্ষতি এত বেশি পরিলক্ষিত যে, কেউ কোনো অবস্থাতেই সেটিকে ভালো বলে স্বীকৃতি দেয়নি। বরং প্রত্যেকেই লোভ ও

---

[৭] সুরা তাওবা, আয়াত : ৫৫।

লোভীকে খারাপ বলে। কিন্তু বিষয়টি এমন যে, লোভকে খারাপ বলা সত্ত্বেও কেউ নিজেকে লোভী বলে স্বীকার করে না। এ কথা মানতেও প্রস্তুত নয় যে, তার কর্ম পদ্ধতিটি লোভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখান থেকে বোঝা যায় যে, সব সমস্যা হলো লোভের সঠিক জ্ঞান থাকার মধ্যে। আর এমনটি হওয়ার কারণ এই যে,

লোভ একটি অস্পষ্ট পরিভাষা। বিভিন্ন পদ্ধতিতে যার ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। অনেক সময় স্বয়ং লোভ এমন ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, যার কারণে লোভের শিকার ব্যক্তিও এ কথা মনে করে আশ্বস্ত হয়ে বসে থাকে যে, সে তো লোভী নয়।

এসব আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ব্যাপকভাবে সম্পদ অর্জনের আগ্রহকে খারাপ বলে আখ্যা দেওয়া এ খারাবির পথ রুদ্ধ করতে যথেষ্ট নয়। বরং নিরপেক্ষ কিছু আইন ও নীতি হওয়া প্রয়োজন। যেগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়ম-নীতির আওতাভুক্ত করবে। যাতে করে লোভভিত্তিক কর্ম পদ্ধতির সবসম্ভাবনাকে শেষ করে দেওয়া যায়। অথবা কমপক্ষে কোনোভাবে সেটির পরিমাণ কমাতে সক্ষম হবে। আর সেসব নিয়ম-নীতির মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো, টাকা-পয়সার বাস্তবতা জানা। যার জন্য ইমাম হাসান বসরি রহ.-এর উক্তির দ্বিতীয় অংশটি চিন্তাযোগ্য।

## ৩. টাকা-পয়সার বাস্তবতা

ইমাম হাসান বসরি রহ. থেকে উদ্ধৃত পূর্ণ উক্তির মধ্যে দ্বিতীয় একটি দৃষ্টিভঙ্গি এই রয়েছে যে, টাকা-পয়সা সৃষ্টিগতভাবেই কোনো উপকারীতা বা ব্যবহারযোগ্য নয়। (intrinsic usufruct or value) এ কারণে সেটি আমাদেরকে তখনই উপকৃত করে, যখন সে আমাদের থেকে দূরে যায়। অর্থাৎ অন্য ব্যক্তির এমন বস্তুর বিনিময় হিসাবে আমরা এটি দেবো, যে বস্তুটি সৃষ্টিগত ও সত্তাগতভাবে কোনো উপকারীতা রাখে। শুধু বিনিময়ের মাধ্যম এবং পরিমাণের অনুমান করার জন্যই টাকা-পয়সার জন্ম হয়েছে। এটি এমন এক দর্শন যেটি উপেক্ষা করার কারণে আমাদের অর্থনীতি নীতিগত সমস্যায় ভেঙে চুরমার হয়েছে। আসুন, এই দর্শনকে তার পরিপূর্ণ রূপের সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করি।

আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা যদিও এ বিষয়ের ওপর একমত যে, টাকা-পয়সা হলো বিনিময়ের একটি মাধ্যম ও মাপার একটি উপকরণ। তবে আমার সংক্ষিপ্ত অধ্যয়নে সম্ভবত কেউ এ বিষয়টিকে তেমন স্পষ্টতার সঙ্গে আলোচনা করেনি।

যেমন স্পষ্ট করে ইমাম গাজালি রহ. বুঝিয়েছেন। যিনি ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর উঁচুমাপের গবেষক, দার্শনিক। তার এই গবেষণাকে তারই বাক্যে উল্লেখ করা ভালো মনে করছি। তিনি বলেন—

'টাকা-পয়সা' মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহের মধ্য থেকে একটি নেয়ামত। এটি এমন একটি ধাতু, যে নিজের মধ্যে কোনো ধরনের সৃষ্টিগত উপকারীতা বা ব্যবহারের যোগ্যতা রাখে না। কিন্তু তারপরও সব মানুষের সেটির প্রয়োজন পড়ে। কেননা, প্রত্যেকেই স্বীয় পানাহার, পরিধেয় বস্ত্র এবং চলাচল ইত্যাদি প্রয়োজন পূরণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন বস্তুর মুখাপেক্ষি হয়। আর বেশিরভাগ সময় এমন হয় যে, তার কাছে ওই বস্তু নেই, সে যার মুখাপেক্ষি। তার কাছে সেটি থাকে, যেটি তার প্রয়োজন নেই। এ কারণে বিনিময়ের বিষয়টি আবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ বিনিময়কে সম্ভব করতে এমন এক স্বয়ংসম্পন্ন মানদণ্ড প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যার ওপর নির্ভর করে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব। কারণ, পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের বস্তু সবসময় একজাতীয় হয় না এবং তার এমন কোনো নির্দিষ্ট একটি পরিমাপও হয় না, যার মাধ্যমে এটি সমাধান করা যাবে যে, এক প্রকৃতির বস্তু অন্য প্রকৃতির বিনিময়ে কী পরিমাণ মূল্য দেওয়া সঠিক হবে? সুতরাং এসব বস্তুর জন্য এমন একটি তৃতীয় শ্রেণি বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন, যা এগুলোর প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। এজন্য মহান আল্লাহ টাকা-পয়সাকে তৃতীয় পক্ষ এবং সমন্বয়কারী হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। যেন সেটির মাধ্যমে সব ধরনের সম্পদের পরিমাণ ও মূল্যমান মাপা যায়। আর টাকা-পয়সা বস্তুর পরিমাপক হওয়ার বিষয়টি এই বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল যে, সত্তাগতভাবে সেটি মূল উদ্দেশ্য নয়। সত্তাগতভাবে যদি সেটি মূল উদ্দেশ্য হতো, তাহলে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো যে, কেউ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সেটিকে নিজের কাছে জমা করে রাখতো এবং এ নিয়তের কারণে সেটির একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন হতো। আর অন্য ব্যক্তি যার সামনে এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য নেই, সম্ভবত সে এগুলো জমা করার জন্য এতটা গুরুত্ব দিতো না। এভাবে পূর্ণ সিস্টেমই গড়মিল হয়ে যেতো। এ কারণেই মহান আল্লাহ সেটিকে এই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তা এক হাত থেকে অন্য হাতে স্থানান্তর হতে থাকবে। বিভিন্ন প্রকৃতির বস্তুর সঠিক মূল্যমান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তৃতীয় সত্তা ও সমন্বয়কারী হিসাবে ভূমিকা পালন করবে। আর প্রয়োজনীয় বস্তু অর্জনের মাধ্যম হবে। তার এই বৈশিষ্ট্যের ফলাফল হলো, যে ব্যক্তি সেটির মালিক হবে, সে কেমন যেন সব জিনিসের মালিক। তবে

সে ব্যক্তির বিষয়টি এর বিপরীত, যে শুধু কাপড়ের মালিক হয়েছে। সে তো শুধু কাপড়ের মালিক হয়েছে। এখন যদি তার খাবারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে হতে পারে যে, খাবারের মালিক কাপড় নিতে আগ্রহী নয়। হতে পারে তখন তার কোনো জন্তুর প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে এমন একটি বস্তুর প্রয়োজন ছিলো, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুই হবে না। কিন্তু বাস্তবে সেটিই সব কিছু। যার নিজস্ব নির্দিষ্ট কোনো রূপ থাকে না, অন্যের কারণে তার মধ্যে বিভিন্ন রূপের সৃষ্টি হয়। যেমন আয়না। তার নিজস্ব কোনো রং হয় না। কিন্তু সে সব রঙেরই প্রতিনিধিত্ব করে। টাকা-পয়সারও একই বাস্তবতা।

সত্তাগতভাবে এটি কোনো উদ্দিষ্ট বস্তু নয়। তবে এটি একটি উপকরণ, মৌলিকভাবে যা সব উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অতএব যে ব্যক্তি টাকা-পয়সাকে তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের বিপরীত ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থে সে মহান আল্লাহর নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি টাকা-পয়সাকে পুঞ্জীভূত করে রাখে, সে এর সঙ্গে বেইনসাফি করছে এবং তার মূল উদ্দেশ্যকে মিটিয়ে দিচ্ছে। তার দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির মতো, যে একজন শাসককে বন্ধি করে রেখেছে। একইভাবে যে ব্যক্তি টাকা-পয়সাকে সুদি কাজে ব্যবহার করছে। সেও মহান আল্লাহর নেয়ামত নষ্ট করছে এবং তার সঙ্গে অসঙ্গত ব্যবহার করছে। কারণ, অন্য বস্তু অর্জনের জন্য টাকা-পয়সাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সত্তাগতভাবে সেটি মূল উদ্দেশ্য হওয়ার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। এ কারণে যে ব্যক্তি স্বয়ং টাকা-পয়সা ক্রয় করে এবং তার ব্যবসা শুরু করে, সে সেটিকে তার মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতে একটি উদ্দিষ্ট বস্তু এবং ব্যবসায়ি পণ্যে পরিণত করছে। অথচ টাকা-পয়সাকে তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে অন্য কাজে সেটিকে ব্যবহার করা একেবারেই বেআইনি ও নীতি বিবর্জিত কাজ। যদি টাকা-পয়সার ক্রয়-বিক্রয় এবং সেটির ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে টাকা-পয়সাই আসল উদ্দেশ্যে পরিণত হবে এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যেমনটি সেটি পুঞ্জীভূত করার কারণে হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে, একজন শাসককে বন্ধি করা অথবা ডাক পিওনকে ডাক পৌঁছাতে বাঁধা দেওয়া বেইনসাফি ছাড়া আর কী?'[৮]

বাস্তবতা তো এটিই যে, ইমাম গাজালি রহ.-এর পর আগত সব অর্থনীতি বিশেষজ্ঞই এ কথা স্বীকার করেছেন যে, টাকা-পয়সা হলো লেনদেনের একটি মাধ্যম এবং পরিমাপের একটি উপকরণ। কিন্তু আফসোসের সঙ্গে বলতে হচ্ছে

[৮] ইহয়াউ উলুমিদ্দিন, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৮৪৩।

যে, তাদের অধিকাংশই এই দর্শনকে তার দার্শনিক পরিণতি পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এক দিকে এই দর্শনকে গ্রহণ করে থাকেন যে, টাকা-পয়সা হলো বিনিময়ের একটি মাধ্যম। অপরদিকে টাকা-পয়সা (Mony) এবং পণ্যের (Commodity) মাঝে মৌলিক পার্থক্যকে লুকিয়ে টাকা-পয়সাকে একটি পণ্যের অবস্থানও দিয়ে থাকে।

টাকা-পয়সা ও পণ্যের মধ্যে পাওয়া ব্যবধানের সারনির্যাস নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. সত্তাগতভাবে টাকা-পয়সা স্বাভাবিক কোনো ব্যবহারযোগ্য বস্তু নয়। মানবিক কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য সরাসরি সেটিকে ব্যবহার করা যায় না। শুধু কোনো বস্তু অর্জন বা সেবা গ্রহণের জন্যই তার ব্যবহার হতে পারে। অথচ অন্যদিকে ব্যবহৃত পণ্য সৃষ্টিগতভাবে এ যোগ্যতা রাখে যে, কোনো বস্তুর সঙ্গে সেটিকে পরিবর্তন করা ছাড়াই সেটি ব্যবহার করা যায়।

২. পণ্য বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। অথচ টাকা-পয়সা পরিমাপক এবং বিনিময়ের মাধ্যম হওয়া ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্যের ধারক হয় না। এ কারণেই টাকা-পয়সার সব সংখ্যা এবং ইউনিটে সমস্যা থাকা সত্ত্বেও শতভাগ সমান হয়। যেমন : এক হাজার টাকার একটি পুরোনো এবং ময়লাযুক্ত নোট সে মূল্য রাখে, যা একেবারে নতুন ও চকচকে এক হাজার টাকার নোট রাখে।

৩. পণ্যের ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয় কোনো নির্দিষ্ট ও বিশেষ বস্তু দ্বারা। যেমন : আলিফ একটি নির্দিষ্ট গাড়ি ক্রয় করলো। যা এমনভাবে নির্দিষ্ট যে, তার দিকে ইশারা করে বলা যায় এ গাড়িটিই ক্রয় করা হচ্ছে। আর বিক্রেতাও সে গাড়িটি বিক্রয় করতে সম্মতি প্রকাশ করেছে। এরপর আলিফ এখন সেই নির্দিষ্ট গাড়িটি দাবি করার পূর্ণ হকদার। বিক্রেতা অন্য কোনো গাড়ি এনে সেটি গ্রহণে আলিফকে বাধ্য করতে পারবে না। যদিও দ্বিতীয় গাড়িটি একই বৈশিষ্ট্যের বা একই মানের হয়। তবে এটির বিপরীত বিষয় হলো টাকা-পয়সা। ইশারার মাধ্যমে টাকা-পয়সাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন : আলিফ যদি এক হাজার টাকার নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে জিম থেকে কোনো বস্তু ক্রয় করে, তাহলেও আলিফ জিমকে অন্য এক হাজার টাকার নোট দিতে পারবে।

আলোচিত বিষয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে যদি যুক্তির নিরিখেও দেখা হয়,

তাহলেও টাকা-পয়সাকে পণ্যের অবস্থান দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, অর্থনীতির বণ্টন অনুযায়ী বস্তু কেবল দু-ধরনের হয়ে থাকে।

ক. ব্যবহৃত পণ্য। (Goods Consumption) যেগুলোকে সরাসরি ব্যবহার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

খ. উৎপাদনশীল পণ্য। (Productive goods) এমন পণ্য যার মাধ্যমে অন্য বস্তু উৎপাদন করা হয়। আর টাকা-পয়সা এ দুটির কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, টাকা-পয়সা সরাসরি ব্যবহারের পণ্য নয়। কারণ, তার কোনো সৃষ্টিগত ব্যবহারই নেই। সেইসঙ্গে এটি উৎপাদনশীল বস্তুও নয়। কেননা, তার মাধ্যমে কোনো বস্তু উৎপাদন হয় না। যারা সেটি উৎপাদনশীল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছে তারা তাদের দাবির স্বপক্ষে যথাযোগ্য কোনো দলিল উপস্থাপন করতে পারেনি।

'লডউগ উন মাইসায়' আমাদের যুগেরই একজন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ। তিনি এসব দলিল-প্রমাণ পরীক্ষা করার পর এই অভিমত ব্যক্ত করেন—

'এ কথা ঠিক যে, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাগরিষ্ঠরা টাকা-পয়সাকে উৎপাদনশীল বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারপর এটি প্রমাণের জন্য আস্থাবান ব্যক্তিরা যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। কোনো দর্শন প্রমাণের বিষয়টি তার যুক্তিসংগত ব্যাখ্যার মধ্যেই থাকে। তার সমর্থকদের আধিক্যতার মাঝে থাকে না। এ বিষয়ের বিজ্ঞদের সম্মান স্বস্থানে রয়েছে। কিন্তু তারপরও এ কথা বলতে হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে তারা নিজেদের অবস্থানকে তৃপ্তির সঙ্গে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

এরপর লেখক 'কেনজের' সেই দর্শনের দিকেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ফেরানোর বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, টাকা-পয়সা কোনো ব্যবহারযোগ্য বা উৎপাদনশীল পণ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হলো শুধু বিনিময়ের একটি উপকরণমাত্র।

যদি একবারের জন্যও এ দর্শনকে মেনে নেওয়া হয় যে, সত্তাগতভাবে টাকা-পয়সা কোনো পণ্য বা শ্রেণিগত দ্রব্য নয়। কাজেই এর দার্শনিক ফলাফল এমনটি হওয়া উচিত ছিলো যে, এটি ব্যাবসায়িক লেনদেনে মূল্য পরিশোধের একটি মাধ্যম মাত্র। সত্তাগতভাবে তা কোনো ব্যাবসায়িক পণ্য নয়। বিশেষত যখন সেটিকে সমজাতীয় বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করা হবে, তখন তো লাভের কোনো প্রশ্নই হওয়া উচিত না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মুদ্রাকে বিনিময়ের উপকরণ হিসাবে মেনে নেওয়ার

পরও যুক্তিভিত্তিক শেষ ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং টাকা-পয়সাকে তারা ডেইলি প্রোডাক্টস নীতির ওপর ভিত্তি করে বেশি উৎপাদনের মাধ্যম বলে স্বীকার করেছে। ইমাম গাজালি রহ. বাহ্যিক দৃষ্টিতেই—বাহ্যত যিনি 'মুদ্রা বিনিময়ের উপকরণ' দর্শনের জনক—কেবল এই দর্শন পেশই করেননি বরং সেটিকে তার দার্শনিক ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছেও দিয়েছেন। সুতরাং আগের উদ্ধৃতি থেকে নিচের নির্বাচিত অংশটি পুনরায় তুলে ধরছি।

'সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং মুদ্রার বেচা-কেনা শুরু করেছে, সে মূলত তার সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যের একেবারে বিপরীত অবস্থানে গিয়ে একে উদ্দিষ্ট বস্তু ও পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত করেছে। এখন যদি মুদ্রার বেচা-কেনা ও ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তো টাকা-পয়সাই মূল উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। আর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে, যেমনটি টাকা-পয়সা পুঞ্জীভূত করার কারণে হয়ে থাকে।'

এটিও সুদ হারাম হওয়ার একটি দার্শনিক কারণ এজন্য যে, সুদ ব্যবহারিক ঋণের বিপরীতে হোক বা ব্যাবসায়িক ঋণের বিপরীতে হোক তার লেনদেন প্রকৃত অর্থে টাকা-পয়সার ব্যবসার একটি রূপ। সেখানে বাস্তবিক কোনো পণ্যের কেনা-বেচা হয় না। আর টাকা-পয়সা ঋণ দিয়েই সুদ (বিনিময়) গ্রহণ করা হয়ে থাকে । অধিকাংশ আসমানি কিতাবে যেটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে ব্যাপক পরিসরে কঠিন ভাষায় বলা হয়েছে। আর বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনে তার হারামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন বলে—

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ . ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

'যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো হয়, শয়তান যাকে স্পর্শ করে মাতাল করে দিয়েছে। তারা এ অবস্থার শিকার হওয়ার কারণ হলো, তারা বলে ব্যবসা তো শেষ পর্যন্ত সুদের মতোই। অথচ মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম ।'[৯]

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾

[৯] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৫।

'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে করেন বর্ধিত।'[১০]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

'হে মুমিনগন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রকৃত ইমানদার হয়ে থাকো, তাহলে ঋণীর জিম্মায় যে পরিমাণ সুদ রয়েছে সেটিকে ছেড়ে দাও। তোমরা যদি এমনটি না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি এই বিদ্রোহী পদক্ষেপ থেকে তাওবা করো, তাহলে তোমাদের জন্য হুকুম হলো, তোমরা নিজেদের মূল অর্থ নিয়ে নাও এবং সুদকে ছেড়ে দাও। তোমরা জুলুম করো না, তোমাদের সঙ্গেও জুলুম করা হবে না।'[১১]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

'হে মুমিনগন, তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না।'[১২]

﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ﴾

'মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না।'[১৩]

সুদের এই নিষেধাজ্ঞা বাইবেলের পুরোনো অঙ্গীকারনামায় আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। এ দাবিকে প্রমাণ করতে উদ্ধৃতিস্বরূপ তার কিছু নির্বাচিত অংশ নিচে তুলে ধরা হলো—

'তোমরা নিজেদের ভাইকে সুদ ভিত্তিক ঋণ দিয়ো না। মুদ্রা আকারে, পণ্যদ্রব্য বা অন্য কোনো পদ্ধতিতেও সুদ ভিত্তিক ঋণ দেওয়া যাবে না।'[১৪]

'হে খোদা, তোমার তাবুতে কে থাকবে? তোমার পবিত্র পাহাড়ে কে

---

[১০] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬।

[১১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৮-২৭৯।

[১২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৩০।

[১৩] সুরা রুম, আয়াত : ৩৯।

[১৪] Derteronomy ২৩ : ১৯ : তাসনিয়া শরা।

আশ্রয়স্থান পাবে? সেই ব্যক্তি যার অন্তর কালিমা মুক্ত। যার কাজ সততার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যে নিজের অন্তরে সত্যবাদিতার কল্পনা করে। যে তার অর্থকে সুদে লাগায় না এবং নির্দোষের বিরুদ্ধে কোনো ঘুষ গ্রহণ করে না।'[১৫]

'যারা সুদ ও লাভের মাধ্যমে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করে, সে তাদের জন্য জমা করে, যে মুখাপেক্ষিদের প্রতি দয়া করবে।'[১৬]

'সুদ ভিত্তিক ঋণ দেবে না। অন্যায়ভাবে লাভ অর্জন করবে না। খারাপ কাজ থেকে হাত গুটিয়ে রাখবে। মানুষের মধ্যে যথার্থ ইনসাফ করবে। আমার আইনের ওপর চলবে। আমার সিদ্ধান্তগুলো মুখস্থ করে তার ওপর আমল করবে। যে এমনটি করবে সে নিশ্চিত সত্যবাদী এবং জীবিত থাকবে।'[১৭]

এই ধর্মীয় বিধান থেকে নিচের নীতিগুলো খুব স্পষ্টভাবে জানা যায়—

১. একই নামের কারেন্সি ব্যবসার পণ্য নয় এবং অন্যান্য পন্যের মতো সেটিকে ব্যবসার বস্তুও বানানো যাবে না। সরাসরি মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা অর্জন করা নিষিদ্ধ। অবশ্য বাস্তবিক কোনো ব্যবসায় সেটিকে বিনিময়ের মাধ্যম বানানো যেতে পারে।

২. ব্যতিক্রম কোনো পরিস্থিতিতে যদি একই কারেন্সিকে তার স্বজাতিয় কারেন্সির সঙ্গে বিনিময় বা ঋণ হিসাবে নেওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে উভয় পক্ষের আদায়কৃত কারেন্সির পরিমাণ সমান হওয়া আবশ্যক। যেন টাকা-পয়সাকে তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যবহার করা না হয়।

কিন্তু আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় যখন টাকা দিয়ে টাকা আয় করার প্রয়োজন পড়লো এবং ধর্মীয় আদর্শ এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো তখনই এ দর্শন সৃষ্টি করা হলো যে, ব্যবসার উদ্দেশ্য সাধনে সুদের (ইন্টারেস্ট) লেনদেন এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহারিক ঋণের সুদের লেনদেনের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। আর এ দাবি করা হলো যে, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা শুধু দ্বিতীয় প্রকার সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রথম প্রকারের সুদ (ইন্টারেস্ট) কোনো অপরাধ ও ক্ষতিকর নয়।

---

[১৫] Palms : ১৫.১.২.৫. মাজামির।

[১৬] আমসাল : Proverbs : ২৮.৮।

[১৭] তাজকিল : Ezekiel : ১৮ : ৮.৯

এরপর তারা যখন একবার এই প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ফেললো তখন সুদি ঋণের ওপর নির্ভরশীল সব ধরনের লেনদেনের দরজা খুলে দিলো। দিনের পর দিন যার পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাস্তবিক অর্থনীতির সঙ্গে তার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

এই পরিকল্পনা অগ্রসরতার প্রথম ধাপেই কাগুজে কারেন্সির জন্ম দিয়েছে। এরপর সেগুলোকে যখন ব্যাংকে ডিপোজিট করা হলো, তখন সেগুলো আরও এক ধরনের ঋণের জন্ম দিলো। যার নাম হলো ফ্রাকসোনাল রিজার্ভ সিস্টেম। (Fractional Reserve Sestem)[১৮] এ সিস্টেমে টাকাকে কল্পনা করে নেওয়া হয়। (বাস্তবে টাকা থাকে না।) আর বাস্তবে এই কাল্পনিক টাকার পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বিদ্যমান কারেন্সির সীমা অতিক্রম করেছে।

এরপর এলো আর্থিক ঋণপত্রের (Financial Papers)[১৯] যুগ। এসব প্রমাণপত্রকে কমিশন ভিত্তিক বিক্রয় করতে স্বতন্ত্র একটি মার্কেটের জন্ম দেওয়া হলো। এরপর সহজে সম্পদ অর্জনের লালসা আরও কয়েকটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলো। তার মধ্যে—

### ১. options, ইচ্ছাধিকারের বেচাকেনা

নির্দিষ্ট সময়ে ও মূল্যে কোনো জিনিস বেচা-কেনার যে অধিকার মূল্যের বিনিময়ে অর্জন করা হয়ে থাকে। এই অধিকার অর্জনকারী বেচা-কেনার ক্ষেত্রে বাধ্য নয় বরং অপর পক্ষ তার দাবির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মূল্যে তা বেচা-কেনার জন্য বাধ্য থাকে। এই অপশনকে বর্তমান অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বতন্ত্র একটি বিক্রয়যোগ্য সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। আর এই অপশন গ্রহিতা নির্দিষ্ট বিধিমালার আলোকে তা অন্য কারও কাছে বিক্রয়ও করতে পারে।

---

[১৮] 'ফ্রাকসোনাল রিজার্ভ সিস্টেম' হলো এমন একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে ব্যাংক তার ডিপোজিটরদের জমাকৃত অর্থের ১% কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রাখে। যেন অস্বাভাবিক কোনো পরিস্থিতির শিকার হলে কেন্দ্রিয় ব্যাংক তার কাছে জমাকারী ব্যাংকের ডিপোজিটারদেরও অর্থ আদায় করতে পারে। এটি সে সময়ের যখন পাকিস্তানের রেট, বাংলাদেশের রেট ভিন্ন। যা বর্তমান ৪%।

[১৯] সুদি ঋণের প্রতিনিধিত্বকারী সেসব প্রমাণপত্র, যেগুলোকে ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু করে।

২. Futures, ভবিষ্যত বেচা-কেনা

বিভিন্ন পণ্য, কারেন্সি, শেয়ার অথবা ঋণের প্রমাণপত্র ইত্যাদির নির্দিষ্ট পরিমাণ বেচাকেনার চুক্তি করা। যার আলোকে বিক্রীত অথবা ক্রয়কৃত দ্রব্য ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হবে। ফিউচার বিক্রীতে অপশন বিক্রয়ের মত ভবিষ্যতে বেচাকেনার শুধু অধিকারই নয়, বরং যথারিতি বেচাকেনার পণ্য দ্রব্য ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রয় করা হয়। এখন পরবর্তী সময়ে হয় বাস্তবিকভাবেই পণ্যের লেনদেন হয় অথবা লাভ-লোকসানের পার্থক্য বরাবর করে নেওয়া হয় অথবা সমপর্যায়ের কোনো পণ্যের মাধ্যমে পরিবর্তন করে নেওয়া হয়।

৩. swaps, ঋণ আদানপ্রদান বা স্থানান্তর

বিভিন্ন কারেন্সির মাঝে প্রচলিত ঋণসমূহের পরস্পর স্থানান্তর প্রক্রিয়া, বিভিন্ন সুদের হারের স্থানান্তর, ইত্যাদি। স্থানান্তরের পদ্ধতি : দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি বৃটিশ কোম্পানি স্টারলিং-এর মাধ্যমে সহজে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অথচ তার প্রয়োজন ইউরোর। অপর দিকে একটি জার্মানি কোম্পানির প্রয়োজন এর সম্পূর্ণ উলটোটার। এ অবস্থায় এই উভয় কোম্পানি ঋণ নিয়ে একে অপরের কারেন্সি পরিবর্তন ও স্থানান্তর করে নেবে। আর সময় সুযোগ বুঝে মূল ঋণ আদায়ের জন্য নিজেদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে পরিশোধের একটি সময় নির্দিষ্ট করে নেবে। এটি হলো swaps-এর দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার,' interest rate swap, সুদের হার বিনিময়'-এর দৃষ্টান্ত হলো—কোনো একটি কোম্পানি নির্দিষ্ট সুদহারে ঋণগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার নির্দিষ্ট ইন্ডেক্সের সাথে সম্পৃক্ত পরিবর্তনযোগ্য সুদহারে ঋণ প্রয়োজন। অথচ এর বিপরীতে অন্য একটি কোম্পানির সম্পূর্ণ বিপরিতমুখী সুদহারে ঋণ নেওয়া প্রয়োজন। যাতে উভয়েই নিজ নিজ ঋণের সুদহার পরস্পর বিনিময় করে নিয়ে থাকে। এতে উভয়েরই প্রয়োজন মিটে যায়। অথচ মূল ঋণদাতা সুদের ওই হারটিই প্রাপ্ত হয়ে থাকে, যার ওপর ভিত্তি করে সে তার ঋণ কর্মসূচি শুরু করেছিলো। এই দুটি পদ্ধতি ছাড়াও বিনিময়ের আরও এ জাতীয় অসংখ্য প্রকার রয়েছে যা swaps -এর অন্তর্ভূক্ত।

৪. (চতুর্থ পদ্ধতি)

উপরের প্রচলিত লেনদেনগুলোর আকৃতিতে (পণ্যের বিভিন্ন (নুন্যতম) লেনদেন) Derivatives -এর পদ্ধতিকে আবিষ্কার করা হলো। (options) অপশন,( Futures) ফিউচার ও (swaps) সোয়াপ জাতীয় লেনদেনগুলোকে ব্যাপকভাবে বুঝানোর একটি পরিভাষা হলো 'Derivatives'। উপরের সবগুলো পদ্ধতিই Derivatives-এর প্রকারের অন্তর্ভূক্ত। স্বতন্ত্রভাবে Derivatives নির্দিষ্ট কোনো আর্থিক লেনদেনকে বোঝায় না।

এরপর বিংশ শতাব্দির শেষ দিকে এসে (Financial Engineering) নামে নতুন এক হিসাবের পরিচয় পাওয়া গেলো। যা আশ্চর্য ধরনের ঘোরপ্যাঁচ হিসাব পদ্ধতিতে ডেরিভেটিভস (Derivatives)-এর বেপরোয়া ব্যবহারকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিলো! এটি এমন এক ঘোরপ্যাঁচ ও বিদঘুটে পদ্ধতি ছিলো, যা অনেক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞও বুঝতে ব্যর্থ। এ বিস্ময়কর কৃত্রিম লেনদেনটি চোখের পলকে সব দেশের সীমানা অতিক্রম করলো। আর প্রস্তুতকৃত কৃত্রিম মুদ্রাকে সেটি এমন অবিশ্বাস্য সীমানায় উপনীত করলো যে, এ পদ্ধতির মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট কোনো দেশের নয়, বরং সারা বিশ্বের সকল দেশের সমষ্টিগত উৎপাদন (GDP) থেকেও বারোগুণ বেড়ে গেলো।

এ ব্যাপারে নিচের আলোচনাটি থেকে সামান্য ধারণা নেওয়া যেতে পারে—

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে Derivatives-এর সামগ্রিক সম্পদ উল্লেখ করা হয়েছে ৭৪১ দশমিক ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। অথচ সারা দুনিয়ার সামগ্রিক উৎপাদন মাত্র ৬০ দশমিক (চে-খরব;)৬ হাজার কোটি ছিলো। এর অর্থ হলো Derivatives-এর সম্পদ সারা দুনিয়ার সব কয়টি দেশের উৎপাদন থেকেও বারোগুণ বেশি ছিলো।

কল্পনা করে দেখুন, ৭৪১ দশমিক ১০ হাজার কোটি ৭৪১১০০,০০০,০০০,০০০ কত বড়ো একটি সংখ্যা, যা ১৫ সংখ্যাবিশিষ্ট। অথচ ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে এ সম্পদের পরিমাণ ছিলো ৬৪ হাজার কোটি টাকা।

রিচার্ড থমাস এ পর্যালোচনা করেন যে, এত বড়ো সংখ্যাকে আপনি কীভাবে কল্পনাতে আনবেন? এটি বোঝার জন্য আপনি এমন কল্পনা করুন যে, এই পরিমাণ অর্থকে যদি কাগজের ডলারে পরিণত করে একটির সঙ্গে অন্যটি জোড়া

লাগানো হয়, তাহলে সেটি এতটাই লম্বা হবে যে, তা পৃথিবীর মাটি থেকে সূর্য পর্যন্ত ৬ বার বা চাঁদ পর্যন্ত ২৫ হাজার ৯০০ বার ঘোরানো সম্ভব হবে।'

এখন আপনি অনুমান করুন যে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে যখন অর্থবাজারের অর্থের পরিমাণ ছিলো ৭৪১ হাজার কোটি—এ হিসাবে বর্তমানে তার কাগুজে নোটের পরিধি কতবড়ো হতে পারে? আর চন্দ্র সূর্যের চারপাশে সেটি কতবার প্রদক্ষিণ করতে পারবে?

এত বড়ো অর্থবাজারের সামনে কাগুজে নোটের রূপে প্রচলিত এ কারেন্সি, যা সত্তাগতভাবে ঋণের মাঝে ঘূর্ণায়মান রয়েছে, তার কোনো বাস্তবতাই থাকলো না। সারা বিশ্বের প্রচলিত সমষ্টিগত উৎপাদনের একদমই অনুল্লেখযোগ্য একটি অংশে পরিণত হয়েছে। আর এগুলো ছাড়া দুনিয়াতে যেসব টাকা রয়েছে, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। বরং সেগুলো কেবল কম্পিউটারে থাকা কিছু সংখ্যা মাত্র। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাস্তবতা হলো এগুলোর সবই ঘোরপ্যাঁচ ও বিদঘুটে অর্থনীতির সৃষ্টি করা আপদ। প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে যার দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। এটি হুবহু সে অবস্থা, ইমাম গাজালি রহ. যার ভবিষ্যদ্বাণী ৬০০ বছর আগেই করেছেন। তখন তিনি এ বিষয়ের ওপর পীড়াপীড়ি করেছিলেন যে, টাকাকে ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো ব্যবহার করা উচিত নয়। ইমাম গাজালি রহ. মুদ্রা ব্যবসার ভয়াবহ পরিণতি আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে তার গবেষণা উপস্থাপন করেন—

> 'সুদকে এ কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, সেটি মানুষকে বাস্তবিক অর্থবাজারে প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টি করে। তার কারণ এই যে, মুদ্রার মালিক যদি উল্লিখিত মুদ্রার ভিত্তিতেই অধিক টাকা উপার্জনের অনুমতি পেয়ে যায় চাই সেটি নগদ মুদ্রার ব্যবসা করে হোক বা বাকি লেনদেনের মাধ্যমে হোক তাহলে এমন ক্ষেত্রে তার জন্য সহজ হবে যে, আসল ব্যবসার ঝুট-ঝামেলায় জড়ানো ছাড়াই সুদের মাধ্যমে টাকার বিনিময়ে টাকা উপার্জন করতে থাকবে। আর এ পদ্ধতির শেষ ফলাফল এটি বেরিয়ে আসবে যে, তার মাধ্যমে মানুষের যে উপকারীতা প্রয়োজন সেটি বিঘ্নিত হবে। কেননা, বাস্তবিক ব্যবসা, শিল্প, নির্মাণ ইত্যাদি ছাড়া মানুষের প্রকৃত উপকার হতে পারে না।'

ইমাম গাজালি রহ.-এর এই পর্যালোচনা দেখে মনে হয় যে, তিনি উল্লিখিত

পর্যালোচনা করার সময় কল্পনার চোখে আমাদের যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। বর্তমান অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তিকে সমালোচনা করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের অর্থনৈতিক সংকটের সময়ও এ বিষয়টিকেই অর্থনীতির খারাপ অবস্থার মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো 'সাউথ পামপিটন অব কমার্স'-এর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত অর্থনৈতিক সংকটের কারণ যাচাইকারী কোম্পানি সে বিষয়ের মৌলিক দিকগুলোকে পরীক্ষা শেষে এই রিপোর্ট তুলে ধরে।

> 'টাকা বিনিময়ের একটি মাধ্যম হিসাবে তার দায়িত্বকে যথাযথভাবে আদায় করছে এ দর্শনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়নের জন্য এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যে, ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো এর লেনদেনকে বন্ধ করা হোক।'

কিন্তু এই সতর্ক বার্তা দেওয়ার পরও পুঁজি বাজারের মনোভাবে সেটি কোনো ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। এই তেলেসমাত বাজারের প্রতি মানুষের এতটা আগ্রহ ও মনোমুগ্ধকর উৎসাহ ছিলো যে, অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরিবর্তে এই মাঠের খেলোয়াররা নিত্য-নতুন বিদঘুটে পদ্ধতির জন্ম দিয়ে সে ধুলাবালিতে আরও বেশি বাতাস দিতে লাগলো। এমনকি শেষ পর্যন্ত বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের রূপে এসে সেটির বিস্ফোরণ ঘটলো।

এসব হওয়ার কারণ এই যে, বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য মুদ্রাকে সুদের ভিত্তিতে মেশিনের মতো ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর তার মৌলিক যে দায়িত্ব তথা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা এ দায়িত্বকে একেবারেই পেছনে ফেলা হয়েছে।

এখানে কেউ সুন্দর একটি প্রশ্ন করতে পারে। সেটি এই যে, ব্যাবসায়িক সুদ তো এই ভূমিকা পালন করেছে যে, মানুষের উদ্ধৃত বেকার ও প্রয়োজনহীন যেসব টাকা পড়ে থাকে সেগুলোকে ব্যবসা ও শিল্পের কাজে লাগিয়েছে। এখন যদি সুদের অনুমতি না দেওয়া হয়, তাহলে বড়ো পরিসরে প্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের উদ্ধৃত অর্থ ছাড়া কীভাবে চলবে? আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং সেটিকে ঠিক রাখতে সেগুলোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

এ প্রশ্নের সাদাসিধে উত্তর এই যে, কোনো ধরনের সুদি পদ্ধতি অবলম্বন করা

ছাড়াই মানুষের উদ্বৃত অর্থের স্রোতকে সে দিকে প্রবাহিত করা সম্ভব, যে ব্যবসা ও শিল্প মানুষের উদ্বৃত অর্থের ব্যবহার করে থাকে সেসব বিনিয়োগের প্রকৃত লভ্যাংশ থেকে সাধারণ মানুষকে নির্দিষ্ট শতাংশ দিয়ে তাদেরকেও উল্লিখিত ব্যবসাতে অংশীদার করে নেওয়া হবে। বর্তমান অবস্থা তো এই যে, মানুষের উদ্বৃত অর্থের একটি বড়ো অংশ থেকে সমাজের গুটিকতক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। আমার দেশ পাকিস্তানের ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের অবস্থা দেখুন—

২৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন (২ কোটি ৪৯ লাখ) লেনদেনকারীর মধ্যে ২৬ হাজার ৬৬০ জন অর্থাৎ সামগ্রিক লেনদেনকারীর মাত্র দশমিক এক পার্সেন্ট ব্যক্তি ১.৫৯ অর্থাৎ ২০ হাজার কোটির কাছাকাছি সম্পদ ব্যবহার করেছেন। আর এই প্রদানকৃত সম্পদ জারিকৃত ঋণের শতকরা ৬৯ভাগ। এর অর্থ তো এই দাঁড়ালো যে, ব্যাংকের লেনদেনে কোটি কোটি মানুষ যে বিশাল সংখ্যার টাকা জমিয়ে ছিলো, সেই সমস্ত অর্থের শতকরা ৬৯ ভাগ মাত্র দশমিক এক পার্সেন্ট মানুষ ব্যবহার করে যাচ্ছে। এরা এর বিপরীতে পুঁজি যোগানদাতাদেরকে লভ্যাংশের নেহায়তই একটি ছোটো অংশ (এখানে একটি টীকা থাকলে বিষয়টি তথ্যপূর্ণ হবে যে কোন ব্যাংক কত % সুদ দেয়) সুদ হিসাবে দিয়ে থাকে। লভ্যাংশের অবশিষ্ট পুরোটাই একমাত্র তাদেরই বিলাসী জীবনের আরও বিলাসিতার মাধ্যম হয়ে থাকে। তারা এতেই তুষ্ট থাকেনি বরং ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা—যারা মানুষের টাকা ব্যবহার করেছে—তাদের উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যের মূল্য এতটাই বাড়িয়ে দেয় যে, ব্যাংকের মাধ্যমে ডিপোজিটররা সুদের যে টাকা অর্জন করেছিলো, সে অর্থকেও পণ্য-দ্রব্যের ব্যয়ে যোগ করে দিয়ে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের মাধ্যমে আবারও তারা নিজেরা এর মালিক হয়ে যায়। সুতরাং এর ফলাফল দাঁড়ায় যে, পুঁজি যোগানদাতাদের পকেটে সুদের আকারে যে সামান্য অর্থ গিয়েছিলো, তাও মূল্যের আকৃতিতে আবার তাদের কাছেই ফেরত চলে আসে। এর অর্থ হলো, বাস্তবে ডিপোজিটরদের হাতে কিছুই আসেনি।

এ বিষয়টি যুক্তির মানদণ্ডেও সঠিক নয় এবং ইনসাফ ভিত্তিকও নয় যে, লাখো মানুষের অর্থে উপার্জিত লাভের বড়ো একটি অংশ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের কাছে চলে যাবে। আর ওইসব ডিপোজিটর, বাস্তবিক পক্ষে যাদের অর্থের মাধ্যমে মূলত এই লাভ অর্জন হয়েছে ,তাদের মাঝে সুদের সামান্য একটি অংশ বণ্টন করা হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যার পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির সমানও হয় না। আর তাদের মধ্যে যেটি বণ্টন করা হয়, সেটিও পণ্যের মূল্য বাড়ানোর মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া

হয়। এ হলো সেসব মৌলিক বিষয়সমূহের একটি দিক, যেগুলো সম্পদ বণ্টনের পদ্ধতিকে বেইনসাফি, অসাম্যতা এবং সাধারণ জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে করে রেখেছে। অনেক আধুনিক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের পক্ষ থেকেও সুদের এ দিকটি সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ জেমস রবার্টসনের এই পর্যালোচনাটি দেখুন

'অর্থনীতিতে সুদের বর্তমান অবস্থান একটি সুসংগঠিত পদ্ধতিতে অর্থের স্রোতকে গরিবদের থেকে ধনীদের দিকে প্রবাহিত করছে। এটি আরেকবার ধনীদের দিকে গরিবদের বিভিন্ন উপকরণের স্থানান্তর। তৃতীয়ত বিশ্বের ঋণের মন্দার কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি অপ্রীতিকর পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটি শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সারা বিশ্বের এই একই অবস্থা। এমন পরিস্থিতির একটি শাখাগত কারণ এই যে, যাদের কাছে ঋণ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে, তারা বেশি লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের থেকে বেশি পরিমাণে সুদ গ্রহণ করে থাকে, যাদের কাছে কম অর্থ রয়েছে। আরও একটি শাখাগত কারণ এই যে, সুদ আদায়ের খরচ সব পণ্য ও সেবার মূল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি অংশ হয়ে যায়।

এ ছাড়াও যেসব জিনিসের জন্য অর্থায়ন করা হয়, তার মধ্যেও প্রয়োজনীয় ও সেবামূলক জিনিসের একটি বড়ো অংশ চোখে পড়ে। আমরা যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অর্থনীতিকে দেখি এবং চিন্তাভাবনা করি যে, এটিকে কীভাবে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজানো যায় যে, এটি একটি স্বয়ংক্রিয় ও বাইরের প্রভাবমুক্ত অর্থনীতির অংশ হিসাবে সঠিকভাবে যথাযথ কার্যকরীতার সঙ্গে নিজের কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। তখন একবিংশ শতাব্দিতে সুদ ও মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত অর্থনীতির ব্যাপারে প্রদানকৃত দলিলগুলোকে অনেক শক্তিশালী মনে হয়।'

বিষয়টি শুধু এমন নয় যে, কিছু কিছু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের পক্ষ থেকে সুদ এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতির সমালোচনা করা হয়েছে। বরং তাদের অনেকে এমন অনেক বিকল্প পদ্ধতি প্রস্তাব করেছে যেগুলোকে ক্ষুদ্র পরিসরে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং চেষ্টা করা হয়েছিলো যে, সেগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে এগুলোর বিরোধিতা করা হয়েছে। এইসব প্রয়োগের কথা মার্গারেট কেনডি নিজ পুস্তক 'Interest and Inflation freemoney' (সুদ এবং মুদ্রাস্ফীতিমুক্ত অর্থনীতি) এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ১৯৩২-১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার একটি ছোটো শহরে সুদমুক্ত

অর্থনীতির পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

'অস্ট্রেলিয়ার তিনশো-এর অধিক ভাইয়েরা যখন এই পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী হলো, তখন অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল ব্যাংক এটিকে তাদের ঠিকাদারীর জন্য বিপজ্জনক মনে করলো এবং টাউন কাউন্সিলের বিপক্ষে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলো।'

এরপর সে উল্লেখ করেছে যে, ১৯৩৩ খিস্ট্রাব্দে আমেরিকার কিছু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের পক্ষ থেকেও একটি বিকল্প পদ্ধতি প্রস্তাব করা হয়েছিলো এবং সেটিকে সুদের পরিবর্তে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা হয়েছিলো। এরপর তারা বলেছে যে, ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কীভাবে সেটিকে বাধা দেওয়া হয়েছিলো।

এসব বিকল্প পদ্ধতিসমূহের ভালো-মন্দের গভীরে যাওয়া ছাড়াই এর থেকে যে বাস্তবতার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে সেটি হলো, সুদ ও তার সঙ্গে সম্পৃক্ত আনুসাঙ্গিক বিষয়ের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসা অর্থনীতি থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু যাদের হাতে এ কার্যক্রমের লাগাম রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব চেষ্টা বা পদক্ষেপের প্রতি তাদের সুদৃষ্টি পড়েনি।

বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ মানুষের উদ্বৃত্ত অর্থকে ইনসাফ ভিত্তিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করার মাধ্যম হলো, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থে যে লাভ হবে সেখান থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদেরকে দিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তাদেরকে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া। এটি একটি নিশ্চিত বিষয় যে, এ পদ্ধতিতে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান যদি কোনো ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে ক্ষতির মধ্যে তারাও অংশীদার হবে। এই পদ্ধতিতে হয়তো ডিপোজিটরদের পক্ষ থেকে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনাকে ব্যাবসায়িক অনুসঙ্গ হিসাবে প্রচার প্রসার চালিয়ে তার পদ্ধতি, শাখা-প্রশাখা এবং শক্তিশালী পর্ষদের মানদণ্ডের মাধ্যমে ক্ষতির সম্ভাবনাকে অনেকাংশে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

যখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট হারে সুদের ভিত্তিতে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, তখন যদি কোনো প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে, স্বতন্ত্র এ প্রতিষ্ঠান অংশীদারির ভিত্তিতে অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে চরম বাধার সম্মুখীন হবে। কেননা, অধিক মুনাফা অর্জনকারী ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেগুলো স্বল্প সুদের বিনিময়ে অর্থায়নের সুযোগ পেয়েছে। কখনোই এমনটি করতে সম্মত হবে না যে, অর্থায়নকারীদের

প্রাপ্য লাভের সামান্য অংশ থেকে নিজেদের হাত গুটিয়ে নেবে। অন্য দিকে যেসব ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে লাভের সম্ভাবনা কম হবে, সেগুলো লাভ লোকসানের ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করতে উড়ে আসবে। কিন্তু অর্থায়নের সম্পূর্ণ নীতিকে যদি অংশীদারির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় এবং সুদ ভিত্তিক ঋণ নেওয়ার কোনো ধরনের সুযোগ না থাকে। তখন শিল্পপতিদের সামনে এটি ছাড়া আর কোনো রাস্তা থাকবে না যে, তারা তাদের কাজে অর্থায়নকারীদেরকে সমতার ভিত্তিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে। একদিকে এ পদ্ধতি ইনসাফ ভিত্তিক সম্পদের বণ্টন এবং সম্পদের বিস্তৃতি ঘটানোর পথ দেখাবে। অন্য দিকে দেউলিয়া হওয়া অবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাথা থেকে অর্থ পরিশোধের বোঝাকে হালকা করবে।

এটির উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমান অর্থনীতি, যার সম্পূর্ণটিই সুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেটির পরিবর্তে এমন একটি নীতি আনতে হবে, যেখানে মৌলিকভাবে অংশীদারি পদ্ধতিতে অর্থায়ন হবে। এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, পরিবর্তনের এই কার্যক্রমে এমন অনেক সমস্যা আসবে, যেগুলোর সমাধান করতে অনেক কষ্ট করতে হবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা সংশোধনের জন্য একবার যদি মৌলিকভাবে এই দর্শন মেনে নেওয়া হয়, তাহলে সেসব দর্শন যেগুলো ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিদঘুটে এবং কঠিন জ্ঞানের জন্ম দিয়েছে, সেগুলোর সমস্যা সমাধানে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

অংশীদারির ভিত্তিতে প্রস্তাবিত এ অর্থনীতির উদ্দেশ্য কখনোই এমন নয় যে, ঋণ ও বাকিতে লেনদেনের কোনো কার্যক্রমই থাকবে না। বরং তার উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমান পরিস্থিতির মতো আমাদের অর্থনীতির মূল উৎস ঋণ ও কর্জ থাকবে না। কিন্তু তারপরেও পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ও বিভিন্ন উপকরণ এবং আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদির মতো আর্থিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা বহাল রাখা হবে। অনুরূপভাবে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাবসায়িক প্রয়োজনেও তার গুরুত্ব থাকবে। কিন্তু সব ধরনের ঋণের (Debts) মোকাবিলায় বাস্তবিক কোনো পণ্য থাকতে হবে। সুতরাং তখন ঋণে আটকে থাকা এমন অর্থকে পুনরায় এমন পদ্ধতিতে ছাড়ানোর কোনো সুযোগ থাকবে না, যেখানে আসবাবপত্র বা পণ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সহজ বাক্যে এভাবে বুঝুন যে, এই প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সুদভিত্তিক ঋণের কোনো সুযোগ থাকবে না।

বাকিতে কোনো পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা ভাড়ার বিনিময়ে কোনো ধরনের উপকারীতা দিয়ে তার বিনিময় হিসাবে হয়তো ক্রেডিট অস্তিত্বে আসবে। এ পদ্ধতিতে মুদ্রা ও বাস্তব অর্থব্যবস্থার মধ্যে থাকা এ ভারসাম্যহীনতার ঝুঁকিকে দূর করা সম্ভব হবে যেটি পূর্ণ অর্থনীতিকে এমন এক আপদে ডুবিয়ে রেখেছে, ধীরে ধীরে যেটি বিস্ফোরিত হওয়ার পথে রয়েছে। আর এ কারণে বড়ো মাপের যে ধ্বংসময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে, সেটি যে-কোনো ধরনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক হবে।

## ৪. জুয়া-ফটকাবাজি (Speculation)

এখানে আমি চতুর্থ যে বিষয়টি স্পষ্ট করতে চাচ্ছি, সেটি হলো জুয়ার (Speculation) সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়। এ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। অনেকের কাছে এটি একটি ভালো কাজের মন্দনাম। আর কিছু লোকের মতে এমনটি নয়। বরং এটি হলো, মন্দ কাজের ভালো নাম। যখন কোনো ঝড়-তুফান বাজারকে ওলটপালট করে দেয়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে সব অভিযোগের দায়ভার ফটকাবাজির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর খারাপ প্রতিক্রিয়ার কারণে চিৎকার শুরু করা হয়। ফটকাবাজিকে ভালো-মন্দ বলা হয় এবং সুন্দর স্থিতিশীল অর্থবাজারে প্রভাব ফেলার বিষয়ে তাকেই দোষারোপ করা হয়। কিন্তু এতকিছুর পরেও ফটকাবাজির ওপর নির্ভরশীল আর্থিক লেনদেনগুলো সম্পূর্ণ উদ্দিপনার সঙ্গেই চালু থাকে। কেমন যেন সেটি একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে এবং সেটি থেকে বেঁচে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এমনটি হওয়ার কারণ এই যে, আজ পর্যন্ত এর কোনো সমাধান হয়নি যে, সত্তাগতভাবে ফটকাবাজি একটি নিন্দনীয় বিষয়। না কি অন্য কোনো বিষয় রয়েছে যেটি তাকে নিন্দনীয় বানিয়ে দিয়েছে। আসুন, এ ব্যাপারে আমরা একটু ভেবে দেখি।

অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী ফটকাবাজির (Speculation) আভিধানিক উদ্দেশ্য হলো—

'যা কিছু হয়েছে বা হতে পারে, তার ব্যাপারে সব ধরনের বাস্তবতা জানা ছাড়াই সিদ্ধান্ত দেওয়া।'

অর্থনৈতিক পরিভাষার আলোকে এর সংজ্ঞা হলো,

'বাজারের মূল্য ওঠানামা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করা। যার পরিণতিতে

অর্থায়নে সম্ভাব্য বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সামনে রেখে বর্তমান আমদানিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

ভবিষ্যতে কী সংঘটিত হবে? এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা হলো এ সম্পর্কে কোনো ব্যক্তিই এ দাবি করতে পারে না যে সে এ ব্যাপারে একশো পার্সেন্ট সঠিক জ্ঞান রাখে। সর্বোচ্চ যদি কেউ কিছু করতে পারে, তাহলে সে এমনটি করতে পারে যে, সে উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে কিছুটা ধারণা ও অনুমান করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক অর্থায়নে এবং প্রত্যেক ব্যবসায় ধারণা ও অনুমানের (Speculation) একটি দিক তো অবশ্যই থাকবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, সব ধরনের ধারণা ও অনুমান মন্দ হয় না। কিন্তু যখন ধারণা ও অনুমানের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ না করে তাকে লাগামহীন স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তখন তার খারাপ প্রতিক্রিয়া জুয়াবাজির ভয়ংকর পরিণতি অপেক্ষা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। এরপর এমন আওয়াজ ওঠে যে, জাতির অর্থের মূল ভিত হলো এর উপরে যে, এখন এই জংলি-জানোয়ারগুলোকে কীভাবে পিঞ্জিরাবদ্ধ করা যাবে?

সুতরাং এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ক্ষতিহীন কারবারের অনুমান এবং জুয়ার সাদৃশ ফটকাবাজির মাঝে কি কোনো সীমারেখা টানা সম্ভব? যদি ধারণা ও অনুমানের ব্যবহার বাস্তবিক ব্যাবসায়িক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে এটি কখনো কোনো অর্থনীতির জন্যই সমস্যা সৃষ্টি করবে না। অ্যাডাম স্মিথ যেখানে ফটকাবাজির (Speculation) আলোচনা করেছেন, সেখানে ওই ফটকাবাজির (Speculation) কথা বলেছেন, যা বাস্তবিক ব্যাবসায়িক বাজার সচল রাখতে করা হয়ে থাকে। তিনি ফটকাবাজকে (Speculatior) এমন একজন ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যে আগে থেকে নির্ধারিত বা কোনো নির্দিষ্ট ব্যবসাকে অবলম্বন করে না। উদাহরণস্বরূপ এ বছর সে আঙুর ফলের ব্যবসা করছে তো আগামী বছর চায়ের ব্যবসা করবে। সে এমন সব ধরনের ব্যবসা করে, যার মধ্যে অন্যান্য ব্যবসা অপেক্ষা বেশি লাভ দেখা যায়। আর সে যখন দেখে যে, তার করা ব্যবসার লাভ অন্যান্য ব্যবসার লাভের সমপর্যায়ে চলে এসেছে, তখন সে ব্যবসাটি ছেড়ে দেয়। এ ধরনের ফটকাবাজ ব্যবসায়ী অর্থনীতির জন্য কোনো ঝুঁকি সৃষ্টি করে না। আর এমন লেনদেনের ব্যাপারে ইসলামও কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যতক্ষণ না সে নাজায়েজভাবে মজুদদারি করার সীমা অতিক্রম করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাজটি অবৈধ হবে না। ইসলামি ফিকহের পরিভাষায় যাকে 'ইহতেকার' বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও একটি শর্ত রয়েছে

যে, তার কারণে যেন ব্যবসার অন্য কোনো হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ না হয়। এমন ব্যবসায়ি যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে সর্বোচ্চ সে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের আর্থিক ফটকাবাজির বিষয়টি এর বিপরীত অবস্থানে। যার প্রচলন পূর্ণ অর্থনীতিকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। তার কারণ এই যে, এমন ফটকাবাজ কোনো ধরনের বাস্তবিক ব্যবসার মধ্যে থাকে না। বরং তার অধিকাংশ লেনদেনকেই প্রকৃত ব্যবসা বলা যায় না। এ কারণে এখানে আমাদের এ বিষয়টি যাচাই করা উচিত যে, ব্যবসার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

## ৫. ব্যবসার কাঠামো কেন্দ্রিক অপরিহার্য শাখাগুলো

একজন সাধারণ মানুষও এটি বুঝতে সক্ষম যে, ব্যবসা এমন কার্যক্রমকে বলা হয়, যেখানে কোনো ব্যক্তি মূল্যের বিনিময়ে নিজের পণ্যের মালিকানা অন্যের কাছে হস্তান্তর করে। আর উল্লিখিত দর্শনটিও এ অপরিহার্য বিষয় মেনে নেওয়ার ওপর নির্ভরশীল যে, যখন কোনো ব্যাবসায়িক লেনদেন করা হয়ে থাকে, তখন মালিকানা হস্তান্তরকারী আগে থেকেই সে জিনিসটির মালিক হয়, যেটিকে সে হস্তান্তর করতে চাচ্ছে। এ কথার দার্শনিক ফলাফল এটি বের হয় যে, কেউ কোনো জিনিসের মালিক হওয়ার আগ পর্যন্ত সেটি বিক্রয় করতে পারবে না। বিক্রয় চুক্তি সঠিক হওয়ার জন্য এটি শুধু যৌক্তিক প্রয়োজনই নয়। বরং ইসলামি বিধান মতে এটি একটি ধর্মীয় নির্দেশও। আর তার মূলভিত্তি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলেছেন—

لاتبع ماليس عندك.

'যা তোমার কাছে নেই, এমন জিনিস কখনোই বিক্রয় করবে না।'[২০]

এরপর শুধু মালিকানা অর্জনই বিক্রয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলেছেন যে, তোমার কবজায় আসার আগে সে জিনিসটি বিক্রয় করবে না। এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপক একটি নীতির কথা বলেছেন। কারও জন্যই এমন কোনো জিনিস বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভ অর্জন করা জায়েজ নেই, যার দায়ভার সে বহন করেনি এবং ওই জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঝুঁকিও তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়নি। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা ক্রয়কৃত জিনিসকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজ কবজায় না নেবে,

[২০] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৫০৩।

ততক্ষণ পর্যন্ত সে জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঝুঁকি তার দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না। এ কারণে এমনটি করা জায়েজ নেই যে, সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পণ্য কবজায় আসার আগেই সেটিকে তৃতীয় কারও কাছে বিক্রয় করে দেবে। পরোক্ষ কবজার দৃষ্টান্ত এমন হতে পারে যে, ক্রেতার পক্ষ থেকে তার ওকিল সেটি কবজা করবে বা ক্রয়কৃত পণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন দলিল-দস্তাবেজ তার কবজায় নিয়ে নেবে, যেগুলো পণ্যের ওপর পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে দেয়।

## ৬. শর্ট সেল (Short Sale) (মালিকানা অর্জন না করেই বিক্রয় করা)

কিন্তু বর্তমান বাজারে ফটকাবাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকাংশই 'মালিকানা অর্জন ছাড়া বিক্রয়' (Short Sale)-এর পদ্ধতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। ফটকাবাজির বাজারে শর্ট সেল (Short Sale) (মালিকানা অর্জন ছাড়া বিক্রয় করা) এবং ব্লাংক সেল (Blank Sale) (মালিকানা অর্জন ছাড়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে সেটি অর্জনের কোনো ধরনের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া বিক্রয় করা।) পদ্ধতির দাপট রয়েছে। আর এটি ওইসব কারণের অন্যতম একটি কারণ, যার কারণে এ ধরনের বিক্রয়চুক্তি প্রকৃত ব্যবসার গণ্ডির মধ্যে থাকে না।

ব্যবসার দ্বিতীয় একটি দিক এই যে, প্রকৃতপক্ষে মূল ক্রেতা এটি চায় যে, ক্রয়কৃত পণ্যটি তার কব্জায় নিয়ে নেবে অথবা সেটিকে নিজের ব্যবহারের জন্য রেখে দেবে বা অন্য কারও কাছে বিক্রয় করে দেবে। কিন্তু সাধারণত ফটকাবাজরা তো তার ক্রয়কৃত পণ্যকে কবজায় নেওয়ার নিয়তে ক্রয় করে না। তার সম্পূর্ণ আগ্রহ থাকে মূল্য ওঠানামার দিকে। আর পর্যায়ক্রমে কয়েকবার সেটি বিক্রয় করার পর উভয় মূল্যের মধ্যকার তফাৎ উসুল করাই তার উদ্দেশ্য। এ কারণে এ পদ্ধতির সব লেনদেনই ব্যাবসায়িক নীতিনির্ভর কোনো লেনদেন হওয়ার পরিবর্তে জুয়ায় পরিণত হয়েছে।

'সারায়ের নেস্ট কেসল' একজন ব্যাংকার। তার সম্পর্কে কথিত আছে যে, সে সপ্তম এডওয়ার্ডকে বলেছিলো—

'আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন মানুষেরা আমাকে জুয়াবাজ বলতো। আর যখন আমার কাজের বিস্তার ঘটলো, আমি তখন ফটকাবাজ (Speculator) নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করলাম। আর এখন আমাকে একজন ব্যাংকার বলা হয়। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, সবসময় আমি একই কাজ করে আসছি।'

এটি হলো ফটকাবাজির সেই দিক, যার কারণে সমস্যা সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট কথা হলো ব্যবসা ও জুয়া দুটি ভিন্ন জিনিস। দুটির উদ্দেশ্যও ভিন্ন। যখন ব্যবসা ও জুয়া বা জুয়ার সাদৃশ বিষয়ের মাঝে সংমিশ্রণ ঘটানো হবে, তখন পুরো পদ্ধতিটিই বিদঘুটে পদ্ধতিতে পরিণত হবে। যা কখনোই সুন্দর ও স্থিতিশীল পদ্ধতিতে কাজ করতে পারবে না। ফটকাবাজিকে যদি মালিকানা অর্জনহীন জিনিসের বিক্রয় এবং খালি ও কৃত্রিম জিনিসের বিক্রয় থেকে আলাদা করা যায়—যেখানে উভয় মূল্যের সঙ্গে সমন্বয় করা ছাড়া আর কিছুই করা হয় না—তাহলে কখনোই অর্থ সংকটের মতো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না।

## ৭. ঋণ (Debts) বিক্রয় করা

যেহেতু প্রকৃত ব্যবসার উদ্দেশ্য এই যে, বিক্রীত পণ্যের মালিকানা ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ কথাটিও বুঝা যায় যে, বিক্রেতার নিজের জিনিসের ওপর পূর্ণাঙ্গ কবজা ও ক্ষমতা থাকবে। যেন সেটিকে ক্রেতার কাছে পূর্ণাঙ্গরূপে হস্তান্তর করতে পারে। এ ব্যাপারে যদি সন্দেহ থাকে যে, বিক্রেতা যে জিনিসটি বিক্রয় করছে সেটিকে তার ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করতে পারবে কি না, তাহলে এটিও ক্রেতাকে এক ধরনের ধোঁকা দেওয়ার নামান্তর।

উদাহরণস্বরূপ মনে করুন। জায়েদ একটি মোবাইলের মালিক। কিন্তু কোথায় যেন তার মোবাইলটি হারিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মোবাইলটি পাওয়ার পুরোপুরি আশা থাকলেও সে আমরের কাছে সেটি বিক্রয় করতে পারবে না। এ ধরনের বিক্রয় শুধু এই শর্ত মেনে নেওয়ার ভিত্তিতেই সহিহ হতে পারে যে, বিক্রেতা জায়েদ যদি নির্দিষ্ট সময়ে আমরকে ফোনটি না দিতে পারে, তাহলে আমর তার থেকে মূল্য ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখবে। এখন জায়েদ যদি সে টাকা থেকে কিছু টাকা বকরকে ঋণ দেয়, যেগুলো আমরকে পরিশোধ করা তার ওপর ওয়াজিব ছিলো। তাহলে এ টাকার ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হওয়া উচিত। এ কারণে যে, এ ব্যাপারে ১০০% নিশ্চিত হওয়া যায় না, অবশ্যই ঋণী বকর তার ঋণদাতা জায়েদকে টাকা দিয়ে দেবে। কেননা, এ সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, ঋণী বকর তার ঋণই আদায় করবে না। সুতরাং জায়েদের জন্য এমন কাজের অনুমতি পাওয়া উচিত নয় যে, সে পরিশোধযোগ্য ঋণকে অন্যের কাছে বিক্রয় করবে। সেটি এ কারণে যে, তার (জায়েদ) উদ্দেশ্য হবে ঋণীর (বকরের)

টালবাহানার ঝুঁকিকে আমর (ক্রেতা)-এর দিকে স্থানান্তর করা। এখন যদি ঋণী (বকর) তার ঋণ আদায় না করে, তাহলে (আমর) ক্রেতাকে তার সে টাকার আশা ছেড়ে দিতে হবে। যা সে জায়েদ (বিক্রেতা)-কে (মোবাইল ক্রয় বাবদ) দিয়েছিলো। এটি ইসলামি নীতির আলোকে ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধের একটি কারণ।

ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো। ঋণকে এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয় যে, ক্রেতা ঋণকে বিক্রেতা থেকে 'পরিশোধযোগ্য অর্থে'র মধ্যে কমিশন রেখে ক্রয় করে। যার কারণে সে লেনদেনে সুদের উপসর্গের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেটি হারাম হওয়ার বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

কেউ যদি এমন প্রশ্ন করে যে, ঋণের ক্রেতা যদি ঋণীদের টালবাহানার ঝুঁকি বহনের জন্য প্রস্তুত থাকে আর এ কারণে সে কমিশন গ্রহণ করে, তাহলে এটি একটি পরস্পরের সম্মতি ভিত্তিক লেনদেনে পরিণত হয় অতএব সেটি নাজায়েজ হওয়ার কারণ কী? এমন প্রশ্নের উত্তর এই যে, পারস্পারিক সম্মতি লেনদেন সহিহ হওয়ার জন্য সবসময় যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ ঘুষের বিষয়টি ধরা হোক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারস্পারিক সম্মতিতেই ঘুষের লেনদেন হয়ে থাকে। কিন্তু তারপরও কেবল পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে সেটিকে জায়েজ বলে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

ইসলামি আইন এই নীতিকে পূর্ণাঙ্গ ও শক্তভাবে বাস্তবায়ন করেছে। প্রথমত সব ধরনের লেনদেনে ইসলামি আইন দু-পক্ষের অধিকারকেই সংরক্ষণ করে। এমন কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয় না, যেখানে কোনো এক পক্ষের সঙ্গে বেইনসাফি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। চাই সে পক্ষ উল্লিখিত বেইনসাফির প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক না কেন। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো চুক্তি অর্থনীতির জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও পারস্পারিক সম্মতির কোনো ভূমিকা কাজে লাগবে না। যেমন : ঘুষ বা সুদি লেনদেনে এমন অবস্থা দেখা যায়।

বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক সংকটে আমরা লক্ষ করেছি, যেসব কারণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ঋণের (غير معيارى قرض (sub prime Loans) : كمزور مالى حيثيت (poor cradit rating-দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থান)-এর বাহক ঋণগ্রহীতাদের (বিশেষত গৃহ ঋণগ্রহীতা) ঋণ দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে যদিও একদিকে পরিশোধ না করার শঙ্কা বিরাজ করছে। কিন্তু অন্যদিকে সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এটি বেশ আকর্ষণীয় লেনদেন হয়ে থাকে। এর জামানত হিসাবে জায়গা-সম্পত্তি বন্ধক রাখা হয়ে থাকে। ঋণদাতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান এমন থাকে যে, ঋণ পরিশোধ না করলে সম্পত্তি বিক্রয় করে পুঁজি অর্জিত হয়ে যাবে। অর্থনীতির জন্য যেটি ধ্বংসশীল প্রতিক্রিয়া ডেকে নিয়ে এসেছে। সুতরাং এ ধরনের আর্থিক লেনদেনকে পারস্পারিক সম্মতির কারণেও বৈধতার সার্টিফিকেট দেওয়া যায় না।

## ৮. স্বচ্ছতা

গতিশীল টেকসই বাণিজ্যের জন্য একটি মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয় হলো স্বচ্ছতা। বিবেকসম্মত সব আইন ও নীতিই এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। কিন্তু এটির প্রতি ইসলামি শরিয়তের পক্ষ থেকে একটু বেশিই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যে-কোনো লেনদেনের উভয় পক্ষকে খুব ভালোভাবে এ কথাটি জেনে রাখা উচিত যে, তারা কী করতে যাচ্ছে? ক্রেতার জানা থাকতে হবে যে, সে কী জিনিস ক্রয় করছে? বিক্রেতারও জানা থাকতে হবে যে, সে কী পরিমাণ মূল্য পাচ্ছে? এবং সেটি কবে নাগাদ সে চাইতে পারবে? কোনো জিনিস যদি একটি প্যাকেটে থাকে এবং সে সম্পর্কে জানা না যায় যে, তার মধ্যে কী আছে? তার পরিমাণ কতটুকু? ইত্যাদি ইত্যাদি—তাহলে এমন জিনিস বিক্রয় করা জায়েজ নেই। যদিও ক্রেতা সেটি ক্রয় করে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে প্রস্তুত থাকুক না কেন। যে লেনদেনে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি জানার সুযোগ থাকে না, শরিয়তের আইনে সেটিকে ধোঁকা (গরর) বলা হয়। একেবারে স্পষ্টভাষায় মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আর সে নীতিটি এই যে, 'হে ক্রেতা, সতর্ক থাকো।' (অর্থাৎ ক্রেতা সতর্ক থেকে কোনো জিনিস ক্রয় করবে। অন্যথায় পরবর্তী সময়ে সে নিজেই সব ধরনের দায়ভার বহন করবে।) শরিয়তের দৃষ্টিতে নীতিটি তেমন ব্যাপক নয়, যেমন ব্যাপকতা অন্যান্য নীতিতে দেখা যায়। কোনো জিনিস যদি ত্রুটিযুক্ত থাকে, তাহলে বিক্রেতার দায়িত্ব হলো, সে নিজেই ক্রেতাকে সেটি জানাবে। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

> 'যে ব্যক্তি ক্রেতাকে জানানো ছাড়া কোনো ত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করবে সে মহান আল্লাহর ক্রোধের শিকার হবে।'

বর্তমানের আর্থিক বাজারে বেশিরভাগ লেনদেন পূর্ণাঙ্গ স্বচ্ছতার মানদণ্ডে উন্নীত

হতে না পারার একটি কারণ হলো, সেটি এতটাই বিদঘুটে ও প্যাঁচানো পদ্ধতিতে প্রণিত যে, যারা কোনো না কোনোভাবে তার অংশীদার তারাও সেটি বুঝতে পারে না। অনেক লেনদেন তো এমন আছে যে, সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলবো? বিশেষ বিশেষ অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বুঝ থেকেও সেটি দূরে। অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বিবেককে বিভ্রান্তকারী এমন অনেক বিদঘুটে অবস্থা রয়েছে যে, আমাদের যুগের একজন স্বীকৃত অর্থনীতি বিশারদ এবং আর্থিক বাজারে কার্যক্রম পরিচালনাকারী 'জর্জ সোরোস'-এর মতো ব্যক্তিও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, এ ধরনের পদ্ধতির সব কার্যক্রম বুঝতে তিনি অক্ষম। 'রিচার্ড থমসন' তার 'আর্থিক পণ্য' (derivatives) সম্পর্কিত পুস্তকে লেখেন—

'১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব ইংল্যান্ডকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধির অধিকারী জর্জ সোরোস ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে মর্গেটস সিকিউরিটি সন্টকের তিরতে পৌছার পর ব্যাংকিং পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে নিজের শপথ বাক্যে বিদঘুটে 'derivatives' এর সারাংশ এ বাক্যে উপস্থাপন করেন—

'বিদঘুটে derivatives এর অসংখ্য প্রকারের ছড়াছড়ি রয়েছে। তার মধ্যে কোনো কোনোটি এত মারাত্মক যে, সে সম্পর্কিত সঙ্কট সংশয়গুলোকে সঠিকভাবে বোঝা অনেক অনুভূতিশীল অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের কাছেও কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আর আমি নিজেও এ প্রকৃতির পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরই একজন। বিশেষভাবে অনেকে তো এভাবে সেটির বর্ণনা দিয়েছে যে, এমন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্থায়নকারীদের জন্য জুয়া খেলার রাস্তা উন্মুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবেই যার অনুমতি তাদের নেই।'

সামনে বেড়ে আরও লেখেন—

'এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ পুঁজিবিনিয়োগকারীরা লোভের শিকার হয়ে নির্বোধের মতো ঝুঁকি নিচ্ছে। সেখানে এটিও একটি বাস্তবতা যে, তারা নিত্যনতুন আর্থিক লেনদেনের বাজারে ভেলকি ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়টি বুঝতেই পারে না। অনেক পুঁজিবিনিয়োগকারীকে তো এমন মনে হয়েছে যে, তার কথা এবং ব্যাংকের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। তারা একে অপরের কথা বুঝতেই পারছে না। কিছু প্রতিষ্ঠান

ব্যাংক এবং তার গ্রাহকদের মাঝে ব্যবধান বাড়ানোর জন্য সেসব ব্যাংকারস ট্রাস্টের থেকে একধাপ আগে বেড়ে কর্মতৎপরতা চালায়। যেখানে বিদঘুটে প্যাঁচানোderivatives- লেনদেনের আবিষ্কারটি এক প্রকার নতুন বিদ্যার স্তর অর্জন করে নিয়েছে। আর 'ক্রেতা সতর্ক হও' এই বাক্যটির মোড় একেবারেই নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এই হলো আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতার অবস্থা। প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন জায়গায় দিনে দিনে যেগুলোর বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে।

গত দশকে আর্থিক বাজার যে পদ্ধতিতে কাজ করেছে সেটি এতটাই অস্থির ও ভয়ানক ছিলো যে, অর্থনৈতিক বিষয়ে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে একের পর এক পুস্তক লেখা হয়েছে যেখানে এ মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে বাজার পূর্ণাঙ্গ ধ্বংসের শিকার হতে পারে। বরং বাজারের এ করুণ পরিস্থিতি অর্থনীতি নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার জন্য দরজায় কড়াঘাত করে যাচ্ছে। অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষ কোনো পাণ্ডিত্বের অধিকারী নই—আমার মতো একজন সাধারণ ব্যক্তিও সুপ্রিম কোর্টের একটি রায় দেওয়ার সময় এই মন্তব্য করেছিলাম—

'সারা বিশ্বের অর্থনীতি একটি বেলুনের রূপ ধারন করেছে। যার মধ্যে দিন দিন এমন নিত্যনতুন ঋণ ও আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে হাওয়া দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃত অর্থনীতির সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই। এই বেলুন বাজারের কোনো ঝড়-তুফানকেই সহ্য করার ক্ষমতা রাখে না। যে-কোনো সময়ই সেটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

কিন্তু তখন কৃত্রিম উন্নতির অগ্রগামিতা এতটাই বেগবান হচ্ছিলো এবং মুদ্রার মাধ্যমে মুদ্রা উপার্জনের আগ্রহ ও লোভ এতটাই বেড়ে গিয়েছিলো যে, সে মাঠের তৎপর কর্মীরা কোনো প্রকার ঝুঁকির সঙ্কেত শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। কী হতো? যদি স্বাভাবিকভাবে তা নিয়ে চিন্তা করার সুযোগ হতো। শেষমেষ দশ বছর পর ঠিকই বেলুনটি ফেটে গেলো। যা আর্থিক উপকরণের (Financial Instruments) ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ও উঁচু অট্টালিকাকেও জমিনে ডুবিয়ে দিয়ে দুনিয়ার ৪৫% সম্পদকে শেষ করে দিয়েছে। আর এর সবকিছুই মাত্র দেড় বছরের মতো সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। এখন সারা বিশ্ব এমন একটি ভয়ংকর সংকটের মধ্যে নিপতিত হয়েছে যার কোনো ইতি চোখে পড়ছে না।

## ৯. বর্তমান সংকট কীভাবে সৃষ্টি হলো?

আসুন, আমরা এখন সাধারণ দৃষ্টিতে যাচাই করে নিই যে, বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকট কীভাবে সৃষ্টি হলো? যাতে করে আগের নীতির আলোকে তার মৌলিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

২০০৭ পর্যন্ত আমেরিকায় পারিবারিক কাজে খরচের জন্য দেওয়া ঋণের ঊর্ধ্বগতি ছিলো। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আকর্ষণীয় হারে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করতো। আর সেই প্রতিযোগিতার সৃষ্ট পরিবেশে কখনো এমন হয়েছে যে, গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা যাচাই করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় শর্তাবলি ছিলো, সেখানেও শিথিলতা করা হতো। অথবা সে সম্পর্কে কেবল চোখ বুলিয়ে নেওয়া হতো। এভাবে মানদণ্ডহীন ঋণের (sub-prime Loane) সৃষ্টি হয়।

এ ধরনের ঋণের প্রদত্ত টাকাকে দ্রুত আদায়ের লক্ষ্যে (যেন আরও বেশি ঋণ দেওয়া যায়) আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের এসব ঋণকে ফেকটরিং এজেন্সির (বিভিন্ন ধরনের ঋণ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কাছে বিক্রয় করে দেয়। এসব এজেন্সি প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ মানুষ থেকে অর্থ উসুলের জন্য সেসব ঋণের আর্থিক প্রমাণপত্র ইস্যু করতো, যা সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয় করা হয়েছে। (অর্থাৎ সেসব এজেন্সি উল্লিখিত ঋণসমূহ ছোটো ছোটো ইউনিটে বিভক্ত করে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয় করে দিতো। এর মাধ্যমে ঋণগ্রহীতারা আর্থিক প্রমাণপত্র পেয়ে যেতো। এর ফলে যখন মূল ঋণগ্রহীতারা তাদের ঋণের অর্থ আদায় করতো তখন তারা এ সার্টিফিকেটের বদৌলতে সেখান থেকে একটি অংশ পেতো।)

ঝুঁকিপূর্ণ ঋণগুলোকে একত্রিত করে সেগুলোকে একটি আর্থিক প্যাকেজ বানানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি হিসাবী টেকনিক আবিস্কার হলো। যাকে (Collateralized debt obligations) নিবন্ধিত ঋণের দায়ভার নামে বা CDOs বলে অভিহিত করা হয়। আর এ দাবি করা হলো যে, আশ্চর্য ধরনের এই হিসাবি পদ্ধতির মাধ্যমে সব ঋণকে এক জায়গায় করে বড়ো ধরনের ক্ষতির ঝুঁকিকে এড়িয়ে চলা যায়। কোম্পানির রেজিস্ট্রিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এই ভেলকিবাজি পদ্ধতির যথার্থতার নিশ্চয়তা দেওয়া হলো। আর তাদেরকে তাদের সাধারণ 'ফি'র তুলনায় তিনগুণ বেশি 'ফি' দিয়ে AAA-এর পর্যায়ের রেজিস্টারভুক্তি অর্জন করে নেওয়া হলো। এরপর ওই আর্থিক প্রমাণপত্রের

(Securitization) পরিবর্তিত ঋণকে ঋণের অতিরিক্ত অংশে পরিণত করা হলো। আর সেটিকে দেশের বাইরে পুরো বিশ্বে বিক্রয় করে দেওয়া হলো। এরপর যখন এ ভেলকিবাজি পদ্ধতি আয়ত্বে চলে এলো, তখন ওয়াল স্ট্রিট শুধু sub-prime Loane (আবাসন খাতে জারিকৃত মানদণ্ডহীন ঋণ)-এর ওপর বসে থাকতো না। বরং নিম্নমানের রেজিস্ট্রিভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠাগুলোর ঋণ এবং নতুন সৃষ্ট আর্থিক ঋণকে একত্রিত করে আরও বিভিন্ন প্রকারের CDOs বানালো। তারপর CDOs বানানোর জন্য যখন অত্যধিক ঋণের লেনদেন যথেষ্ট হলো না। (অর্থাৎ যে পরিমাণ ঋণ জারি করা হয়েছিলো, তার সবই তো CDOs এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু CDOs এর মার্কেটটি খুব বেশি লাভজনক প্রমাণিত হচ্ছিলো, এ কারণে তখনো এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিলো যে, এ ধরনের আরও বেশি আর্থিক প্রমাণপত্র ইস্যু করে তার মাধ্যমে বেশি লাভ অর্জন করা যাবে।) ঠিক তখনই ক্রেডিট ডিফল্ট সওয়াপ (Credit default swap) CDOs-এর রূপে নতুন একটি পণ্য (derivatives) দৃশ্যপটে নিয়ে আসা হলো। (যার উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, যেসব লোকেরা তাদের ঋণগ্রহীতাদের থেকে ঋণ উসুলের ব্যাপারে টালবাহানার আশঙ্কা করে, তারা তাদের ঋণকে এমন ঋণের সঙ্গে পরিবর্তন করে নেবেন, যে ঋণের অর্থ দ্রুত উসুল হওয়ার আশা রয়েছে।) ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ক্রেডিট ডিফল্ট সওয়াপ (Credit default swap) মার্কেট ৬০ হাজার ডলারে গিয়ে পৌঁছে। অথচ তখনকার সময়ে সারা বিশ্বের সমষ্টিগত উৎপাদনও ছিলো ৬০ হাজার ডলার। বর্তমানে (derivatives) পণ্যের সমষ্টিগত বাজার (অপশন, ফিউচার, সওয়াপ ইত্যাদি মিলিয়ে) যেটি নব্বইয়ের মাঝামাঝি ৫৫ হাজার ডলারের উল্লেখযোগ্য সম্পদ ছিলো। সেটি বেড়ে ৬০০ হাজার ডলারের একটি কল্পনাতীত সীমায় উপনীত হয়। এই (derivatives) পণ্য যেহেতু কোনো সুনির্দিষ্ট আইনের অধিনে ছিলো না। এ কারণে তার প্রমাণপত্রের বাহকদের এ কথা জানা ছিলো না যে, উল্লিখিত প্রমাণপত্রের পেছনের সম্পদ কার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

অপরদিকে এ পরিস্থিতিতে যখন আবাসস্থানের মূল্য পড়ে গেলো। তখন আবাসন খাতের জন্য ঋণ নেওয়া ব্যক্তিরা সেটি পরিশোধে টালবাহানা করতে লাগলো। এদিকে টালবাহানার সময় বাজেয়াপ্তকৃত আবাসনের মূল্যও ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হলো না। ফলে তখনই মানুষের অনুভূত হলো যে, ঋণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এসব আর্থিক উপকরণ তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং এটি

একেবারেই অনিরাপদ ও অরক্ষিত। সুতরাং এ কারণে চারিদিকে আতঙ্ক ও ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। আর ঋণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক প্রমাণপত্রগুলোর আকাশ চুম্বী অট্টালিকা ধ্বসে দড়াম করে জমিনের ওপর পতিত হলো। ভয় ও আতঙ্ক যখন মানুষকে পাকে আটকে দিলো। তখন সতর্কতামূলকভাবে নতুন ঋণ চালু কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হলো। যার কারণে ঋণ নির্ভর প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হতে লাগলো এবং তার শেয়ারের মূল্য ওপর থেকে নিচে নামতে শুরু করলো। যারা কোটি কোটি টাকা শেয়ার ও derivatives পণ্যের ফটকাবাজিতে লাগিয়ে ঝুঁকি নিয়েছিলো আর্থিকভাবে তারা ধ্বংস ও দুরাবস্থার শিকার হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হতে লাগলো। আর এসবের ফলস্বরূপ পূর্ণ অর্থনীতিটি সে সংকটের শিকার হলো যার সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, এ সংকট সারা বিশ্বের সমষ্টিগত সম্পদের আনুমানিক ৪৫% সম্পদকে শেষ করে দিয়েছে।

## ১০. সমস্যা এবং সমাধান

আগের আলোচনা থেকে আমরা যদি বর্তমানের অর্থনৈতিক সংকটের মৌলিক কারণগুলো যাচাই করি, তাহলে কোনো ধরনের কালক্ষেপন ছাড়াই এই ফলাফল সামনে আসে যে, এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পেছনে চারটি কর্মপদ্ধতির ভূমিকা রয়েছে। যথা :

ক. টাকাকে তার আসল দায়িত্ব—বিনিময়ের মাধ্যমের ভূমিকা—থেকে সরিয়ে কোনো ধরনের বাধা-বিপত্তিহীনভাবে স্বতন্ত্র ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো ব্যবহার করা। এটি হলো সে কারণ, যা জন্ম দিয়েছে মুদ্রার মাধ্যমে বেশি মুদ্রা উপার্জনের লোভ-লালসা। আর এই লোভ-লালসা পর্যায়ক্রমে পূর্ণ অর্থনীতিকে ঋণের একটি বেলুনের রূপে পরিণত করেছে।

দুনিয়াকে এ ভয়ংকর পরিণতি থেকে বাঁচানোর পদ্ধতি এই যে, মুদ্রাকে ব্যাবসায়িক পণ্যের মতো ব্যবহার করাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে। ভিন্ন দেশের কারেন্সির মাঝে বিনিময়ের বিষয়টি তো সবসময় ব্যাবসায়িক ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে। আর এ প্রয়োজন পূরণের জন্য নিশ্চিতভাবে এক দেশের কারেন্সিকে অন্য দেশের কারেন্সির বিনিময়ে বিক্রয় করতে হবে। আর বিনিময়ের মূল্যের মধ্যেই লাভের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এটি

যেহেতু একটি প্রয়োজন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত সেটির বিনিময় আন্তঃদেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রকৃত প্রয়োজন পুরা করার কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটি কোনো সমস্যার সৃষ্টি করবে না। কেবল সে সময় সমস্যা সৃষ্টি করবে, যখন কারেন্সি বিনিময়ের মধ্যে ফটকাবাজির অনুপ্রবেশ ঘটবে।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই যে, মার্কেটে প্রচলিত কারেন্সি বিনিময়ের অধিকাংশই নিরেট ফটকাবাজির অন্তর্ভুক্ত। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব-বাজারে আন্তর্জাতিকভাবে সংঘটিত ব্যবসার পরিমাণ ছিলো ৩২ হাজার বিলিয়ন ডলার। যার প্রতিদিনের গড় হার ছিলো ৮৮ বিলিয়ন ডলার। অথচ বিশ্ব কারেন্সি বাজারের প্রতিদিনকার সুদের আনুমানিক হার ৩.৯৮ হাজার বিলিয়ন, যা আন্তর্জাতিক ব্যবসার সমষ্টিগত পরিমাণ থেকেও ৪৫ গুণ বেশি। এর অর্থ এই দাঁড়ালো যে, কারেন্সি ক্রয়-বিক্রয়ের মাত্র ২% লেনদেন এমন, যা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণ করতে এবং আন্তঃদেশীয় ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানির জন্য প্রকৃত প্রয়োজন ছিলো। বাকি ৯৮% কারেন্সির লেনদেন কেবল মূল্য ওঠা-নামার ভিত্তিতে ভাগ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, কারেন্সির এই কৃত্রিম ব্যবহারই ধারাবাহিকভাবে তার মূল্য বাড়ানোর কারণ হয়েছে। আর এ কারণে কারেন্সির মৌলিক কাজ তথা পরিমাণ সংরক্ষণ করার মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে।

মুদ্রাকে যদি তার উদ্দেশ্য পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলে সামনে বেড়ে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার যে, অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতিকে (Financing) একেবারে সুদমুক্ত করতে হবে। আর সুদমুক্ত অর্থনীতি তখনই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে, যখন অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে সাজানোর গভীর চিন্তাভাবনা এবং যথার্থ প্রচেষ্টা করা হবে। তার নতুন রূপকে এভাবে সাজাতে হবে যে, উৎপাদনের কাজে পুঁজিবিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে বেশি থেকে বেশি সরাসরি অংশীদার হয়ে বিনিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যেন ঋণ (debt) নির্ভর লেনদেনের পরিমাণ কমে আসে। সেই সঙ্গে তাদেরকে এ বিষয়টিও নিশ্চিত করে দিতে হবে যে, তাদের পুঁজির বিপরীতে বাস্তবিক পণ্য বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ যেগুলোকে কেনাবেচা অথবা ভাড়া ইত্যাদির মতো প্রকৃত ব্যাবসায়িক লেনদেনের মাধ্যমে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে হবে।

খ. বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের একটি বড়ো কারণ ছিলো (derivatives)। বরং ফ্রেঞ্চ পার্টুনি derivatives পণ্যের একজন সাবেক ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজেই উল্লিখিত derivatives পণ্যকে বর্তমান সংকটের একমাত্র মূল কারণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং তার বিশ্লেষণটি দেখুন,

'মন্দ আকাঙ্ক্ষা, ধ্বস এবং ত্রাস সৃষ্টির অনেক পদ্ধতি ছিলো। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের দায়ভার যদি কোনো একটি শব্দের ওপর রাখতে চান, তাহলে সে ক্ষেত্রে একটিমাত্র শব্দই থাকে। আর সেটি হলো 'কৃত্রিম পণ্য' (derivatives)। এই সংকট থেকে বাঁচার জন্য শুধুমাত্র কৃত্রিম পণ্যের (derivatives) ওপর পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা আবশ্যক।'

গ. আমরা আগে যেমন পরখ করেছি যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো ঋণের ক্রয়-বিক্রয়। এখন প্রশ্ন জন্মে যে, ঋণ বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য কী? এ প্রশ্নের বিস্তারিত পর্যালোচনা আমরা আগেই করেছি। অনেক বড়ো সংখ্যার ঋণকে একত্রিত করে একটি প্যাকেজের মাধ্যমে বিক্রয় করার বিষয়টি বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রাথমিক কারণ ছিলো। ঋণ বিক্রয়কে যদি নিষিদ্ধ করা হতো, তাহলে কখনোই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।

ঘ. শেয়ার, বিভিন্ন পণ্য এবং কারেন্সি কেন্দ্রিক শর্ট সেল (মালিকানা ও কবজা করা ছাড়া বিক্রয় করে দেওয়া) এমন একটি বিষয়, যেটি প্রকৃত ব্যবসাকে ধ্বংস করার জন্য ফটকাবাজিকে প্রস্তুত করে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক বিষয়ে অনুমতি প্রাপ্ত অনেক পর্যবেক্ষক কমিটি (Regulatory authoritien) শর্ট সেলের ক্ষতিকর ক্রিয়াকে স্বীকার করে তার ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর শর্ট সেলকে বাজারের অস্বাভাবিক সূচক ওঠানামার কারণ হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। সেই ভিত্তিতে আমেরিকার সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (Sec)-এর পক্ষ থেকে ৭৯৯টি কোম্পানির ওপর তিন সপ্তাহের জন্য শর্ট সেল করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। যেন সে কোম্পানিগুলোর নিম্নমুখী সূচককে সামলে নেওয়া যায়। একই সময়ে ইউকে ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস (Fsc) অথোরিটির পক্ষ থেকেও ৩২টি কোম্পানির জন্য শর্ট সেল করতে নিষেধ করা হয়। ২২ সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া এ ব্যাপারে আরও কঠোর

অবস্থান নিতে পূর্ণাঙ্গভাবে শর্ট সেলকে নিষিদ্ধ করে দেয়। ২২ সেপ্টেম্বরেই স্পেনের বাজার নিয়ন্ত্রন ও সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত (cnmy) প্রতিষ্ঠান অর্থায়নকারীদের কাছে দাবি করে যে, তারা যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ারে শর্ট সেলিং ব্যবসা করে থাকে, তাহলে সেটি যদি কোম্পানির মোট মালিকানার ০.২৫% এর বেশি হয়, তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে। NAKED SHORTING ( আগে থেকে কোনো ধরনের প্রস্তুতি ছাড়া শর্ট সেলকেও) সীমাবদ্ধ করে। কিন্তু উল্লিখিত সবগুলোই ছিলো অস্থায়ী পদক্ষেপ। ফলে অনেক প্রতিষ্ঠান নিষেধাজ্ঞা আরোপের কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই

এ নিষেধাজ্ঞা এই বলে প্রত্যাহার করে নেয় যে, এটি বাজারের জন্য উপকারী প্রমাণিত হয়নি। এভাবে পুনরায় শর্ট সেলের অনুমতি দেওয়া হয়।

এ ধরনের নিষেধাজ্ঞাকে বাজারের জন্য উপকারী মনে না করা এবং অস্থায়ী সময়ের চেয়ে বেশি সময়ের জন্য সেটিকে কার্যকরী না করার কারণ এই যে, বাজারের জন্য কোনটি উপকারী আর কোনটি উপকারী নয়? এ বিষয়টির পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বর্ণিত সেসব দর্শনের ওপর নির্ভরশীল যার আলোকে সংরক্ষিত ও কল্যাণকর ব্যাপক বিস্তৃত অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার তুলনায় সাময়িক লাভের চিন্তাধারাকে বেশি প্রণিধানযোগ্য মনে করা হয়েছে। আমরা যেহেতু বর্তমান অর্থব্যবস্থার বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা এবং তার ত্রুটিগুলো দূর করতে স্থায়ী চিন্তাভাবনা করছি, যেন অর্থব্যবস্থাকে সংরক্ষিত, নির্ভরশীল এবং অন্যান্য অর্থনীতির দর্শনের ঊর্ধ্বে থেকে মানবতার জন্য ইনসাফ ভিত্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া যায়। সেহেতু আমাদেরকে এই সাময়িক স্বল্পমেয়াদি চিন্তাভাবনাকে বাদ দিয়ে সাহসী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেন অর্থব্যবস্থাকে সর্বোচ্চস্তরে, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায়। আমার আশা, আমি যেসব প্রস্তাব পেশ করেছি, সেগুলো এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।

## ১১. কতিপয় ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কথা

অবশেষে এটি ভালো মনে করছি যে, সেসব ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু কথা বলবো। যেগুলো বিগত দু-দশক ধরে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় পরিচিতি

লাভ করে আসছে। এগুলো হলো সেসব প্রতিষ্ঠান, যাদের দাবি হলো তারা সব ধরনের আর্থিক লেনদেন ইসলামি আইন অনুযায়ী কার্যকর করে থাকে। বহু লেখক এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নীতিকে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের পর্যালোচনার আলোকে যাচাই-বাছাই করার চেষ্টা করেছে। 'ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক সংকট' শিরোনামে যদি ইন্টারনেটে সার্চ করি, তাহলে প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তুর একটি পাহাড় হয়ে যাবে। সেসব প্রবন্ধের অনেকটিতে এই দাবি করা হয়েছে যে, এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে কোনো ধরনের আঁচড় অনুভব করেনি। তবে অন্য কিছু প্রবন্ধে এর বিপরীতটিও লেখা হয়েছে।

যদি বাস্তবতার প্রতি লক্ষ রেখে অতিরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া হয়, তাহলে এ কথা বলতে হয় যে, ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে কোনো ধরনের আঁচড় অনুভব না করার দাবিটি সঠিক নয়। কিন্তু এ দাবিটি ঠিক যে, ধ্বংসাত্মক ছোবলের শিকার হয়েছে সুদনির্ভর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো, সে তুলনায় ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ট সংরক্ষিত ও নিরাপদ রয়েছে। আর এমনটি হওয়ার স্পষ্ট কারণ রয়েছে। শরয়ি নীতির ওপর চলার কারণে তাদের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপিত হয়ে থাকে যে, সুদ, derivatives, শর্ট সেল এবং ঋণের ক্রয়-বিক্রয় থেকে তারা নিজেদেরকে বিরত রাখবে। আর এসব প্রতিষ্ঠানের ঋণ নির্ভর প্রকল্পগুলোও প্রকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় বা ভাড়া ভিত্তিক লেনদেনের মাধ্যমে অস্তিত্বে আসে। ফলে তাদের অর্থায়নের (Financing) পেছনে বাস্তবিক পণ্যও থাকে। যার ফলস্বরূপ আর্থিক লেনদেন এবং প্রকৃত অর্থনীতির মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির সুযোগ আসে না।

বাণিজ্য বিষয়ক সাংবাদিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন বিশ্লেষক 'আইইমা বেন্ডার' তার একটি প্রবন্ধে এ বিষয়টির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামি অর্থায়ন কী? আর বর্তমান সংকট থেকে তুলনামূলকভাবে সেটি কীভাবে সংরক্ষিত থাকলো? তার সে আলোচনার একটি নির্বাচিত অংশ উল্লেখ করা হলো :

'শরিয়ত বা ইসলামি আইন অনুযায়ী প্রচলিত অর্থায়নের (Financing) অধিনে আনুমানিক ৭০০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রয়েছে। আর মোডেজ ইনভেস্টর সার্ভিসের তথ্যমতে বছরে শতকরা ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত আনুমানিক গড়হারে লাভ অর্জন করে অগ্রগতির দিকে এগুচ্ছে। এ পদ্ধতিটি খুব দ্রুত সেসব

রাষ্ট্রগুলোকে নিজের দিকে টেনে আনছে, যারা নগদ অর্থ সংকটের শিকার হয়ে নিজেদের অর্থব্যবস্থাকে ইসলামি অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে খুব দ্রুত উজ্জীবিত করার তীব্র আশা রাখে। ইসলামি Finance পদ্ধতি যদিও পারস্যের উপসাগরীয় এলাকা এবং এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত যেমন : ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য এলাকাগুলোকে নিজেদের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এটি উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে।'

বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের কারণে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর কী প্রভাব পড়েছে? তার ওপর আলোকপাত করে তিনি তার প্রবন্ধে উল্লেখ করেন—

'মোডেজ ইনভেস্টর সার্ভিসের নভেম্বর মাসের রিপোর্টে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ সীমা পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। কোনো একটি ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানও 'বার্নার্ড মেদফ'-এর ৫০ কোটি ডলারের পঞ্জি স্কীমটিতে [মানদণ্ডহীন অসম ঋণ (sub-prime Loane) 'দুর্বল আর্থিক অবস্থান' (poor cradit rating)-এর বাহক ঋণগ্রহীতা—বিশেষত আবাসনের জন্য ঋণ প্রত্যাশীদেরকে দেওয়া, দুর্বল আর্থিক অবস্থানের কারণে যদিও একদিকে এই না দেওয়ার ঝুঁকিতে আছে। কিন্তু অপরদিকে সুদের হার বেশি হওয়ার কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেশ আকর্ষণীয় ছিলো। এর জামানতের জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখা হতো। ঋণদাতার এ সুযোগ সৃষ্টি হতো যে, ঋণ পরিশোধ না করা অবস্থায় সম্পত্তি বিক্রয় করেই তার পুঁজি অর্জিত হয়ে যাবে।] পুঁজি বিনিয়োগের কথা স্বীকার করেনি। সলেহ তয়্যার ফ্রেঙ্কো 'আরব চেম্বার অব কমার্সে'র সিকিউরিটি জেনারেল বলেন, সোসাইটি জিজাল সাউদি আরব ৯.৪ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেটিকে ব্যাংক আইন বহির্ভূত কারবারের ফলাফল হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংকট কোনো একটি ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে স্পর্শ করতে পারেনি।'

তিনি আরও বলেন—

'সারা বিশ্বের ব্যাংকিং কার্যক্রম যদি ইসলামি অর্থনীতির অধিনে পরিচালিত হতো, তাহলে আমরা যে সংকট দেখছি, সেটি দেখতাম না।'

ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অনৈতিক লেনদেন নিষিদ্ধ হওয়া এবং লাভ-লসের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বড়ো ধরনের ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক দর্শনের ওপর

কাজ করে। সুদি লেনদেন, মালিকানা অর্জন ছাড়া বিক্রয় করা (short selling) এবং বেশি ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনগুলোকে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামি ফাইন্যান্স Sub prime mortgages collateralized Cridet default swaps বা debt obligation-এর মতো মারাত্মক আর্থিক লেনদেন, যেগুলোর কারণে পশ্চিমা অর্থব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, সেগুলোকে একেবারেই নিষিদ্ধ করেছে।

মুসলিম স্কলারগণ যারা ফাইন্যান্স -এর সূক্ষ্ম নিয়ম-নীতির ব্যাপারে দক্ষতা ও যোগ্যতা রাখেন। তারা এমন সব প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছেন, যেগুলো অনৈসলামিক সুদি অর্থনির্ভর প্রকল্প যেমন : লোন, ইন্সুরেন্স এবং বন্ডের মতো। সুকুক হলো বন্ডের বিকল্প রূপ। তবে এখানে ঋণ বিক্রয়ের পরিবর্তে ইস্যুকৃত কোনো পণ্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করা হয়। যার ক্রেতার জন্য এই অধিকার থাকে যে, সে সেই পণ্যকে ভাড়া দিতে পারবে। নর্টন রোজে ইসলামি ফাইন্যান্স-এর পৃষ্ঠপোষক এবং বৃটিশ সরকারের একজন পরামর্শক নিল মেলার বলেন—

'ইসলামিক ফাইন্যান্স সে পদ্ধতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে না, যেটিকে আজ থেকে দশ বছর বা তার চেয়ে কিছু আগ পর্যন্ত একটি ভালো ব্যাংকিং পদ্ধতি মনে করা হতো। ইসলামি ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের সঙ্গে নৈকট্যতম সম্পর্ক রাখার প্রবক্তা। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমরা কেবল প্রকৃত লেনদেনে অংশ গ্রহণ করতে পারবো যেখানে সরাসরি আমরা পণ্য দেখতে পারবো। সেগুলোকে বুঝতে পারবো এবং সেগুলো সম্পর্কে যথার্থ অনুমান করতে পারবো। চাই পানিতে থাকা কোনো জাহাজ বা আকাশে উড়তে থাকা কোনো বিমানের লেনদেন করা হোক না কেন। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেখানে গিয়ে দেখা জরুরি। এ পদ্ধতি থেকে বুঝা যায় যে, ব্যাংকিং পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত।'

সারকথা হলো, এমন দাবি করা অতিরঞ্জন হবে যে, এই মারাত্মক তুফানে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কোনোভাবে আক্রান্ত হয়নি। বরং তার ওপরও কিছুটা প্রভাব পড়েছে। যার পেছনে দুটি কারণ রয়েছে—

ক. কোনো সংকট যখন কোনো অর্থব্যবস্থাকে আক্রান্ত করে তখন তার সব শ্রেণি ও স্তরকে কিছু না কিছু প্রভাবিত করেই। চাই তারা সে সংকটের দায়ভার গ্রহণ করুক বা না করুক। এই স্বভাবজাত নীতি থেকে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বাইরে নেই।

খ. এই ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো মায়ের কোলের শিশুর পর্যায়ে রয়েছে। মাত্র হাঁটা শিখছে। তাছাড়া এ প্রতিষ্ঠানগুলো এমন এক পরিবেশে কাজ করে এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে সুদি অর্থনীতি নির্ভর পদ্ধতির প্রাধান্য রয়েছে। এটিই হলো সে কারণ, যা ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভ-লসের অংশীদারত্বের ভিত্তিতে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশকে সীমিত করে দিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো যদিও তাদের বিনিয়োগকারীদের থেকে লাভ-লসের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু তাদের ব্যালেন্স শিটে বিদ্যমান এসেটস-এর একটি বড়ো অংশ ঋণের লেনদেনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তারা বাকিতে বিক্রয় করে। অথবা ফাইন্যান্সিয়াল লিজ (এমনভাবে লিজ দেওয়া যে, লিজ নেওয়া ব্যক্তি লিজের কিস্তি পরিশোধের মাধ্যমে ওই জিনিসের মালিক হয়ে যাবে।) ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করে। তাদের থেকে যারা অর্থায়ন চায়, সেসব গ্রাহকদের সঙ্গে ব্যাপকভাবে লাভ-লসের ভিত্তিতে লেনদেন করে না। সুদ ব্যাংকিং পদ্ধতির মোকাবিলা করতে অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক অপছন্দনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে। আর সেটিও সুদি নির্ভর ব্যাংকের সুদের হার হিসাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এমন দাবি করাও কষ্টসাধ্য যে, পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ঋণের লেনদেন করার ক্ষেত্রেও সব ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শরিয়তের সব ধরনের বিধিবিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে। নতুন একটি কারণও শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ নীতির ওপর আসতে বাধা সৃষ্টি করছে। সেটি হলো, কিছু কিছু ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদি বাজারে উপস্থাপিত সব প্রোডাক্টেরই বিকল্প প্রণয়নের চেষ্টা করছে। এমনকি কৃত্রিম পণ্য (derivatives) পদ্ধতিরও এমন বিকল্প খোঁজা হচ্ছে। যাকে ইসলামি কৃত্রিম পণ্য বলে নামকরণ করা হবে। যদি এমন আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায়, তাহলে এসব প্রতিষ্ঠান তাদের অবস্থান হারাবে।

সারকথা এই যে, ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হোক বা সুদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হোক সবার জন্য আবশ্যক হলো, স্থিতিশীল নীতির আলোকে সবার কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি লক্ষ রেখে নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনা। আর সেসব পদ্ধতি অবলম্বন থেকে দূরে থাকা, যেগুলো আমাদেরকে এ সংকটের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছে। শেষ প্রান্তে এসে ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক-এর চেয়ারম্যানের সে বাক্যটি দ্বিতীয়বার পেশ করছি।

‘আজ আমরা এক চূড়ান্ত সীমানায় উপস্থিত হয়েছি। যার পর আমাদের সামনে শুধু একটিমাত্র রাস্তা খোলা রয়েছে যে আমরা হয়তো সংস্কার করবো অথবা ধারাবাহিক অধঃপতন ও বিপদের মুখোমুখি রয়ে যাবো।’

# হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

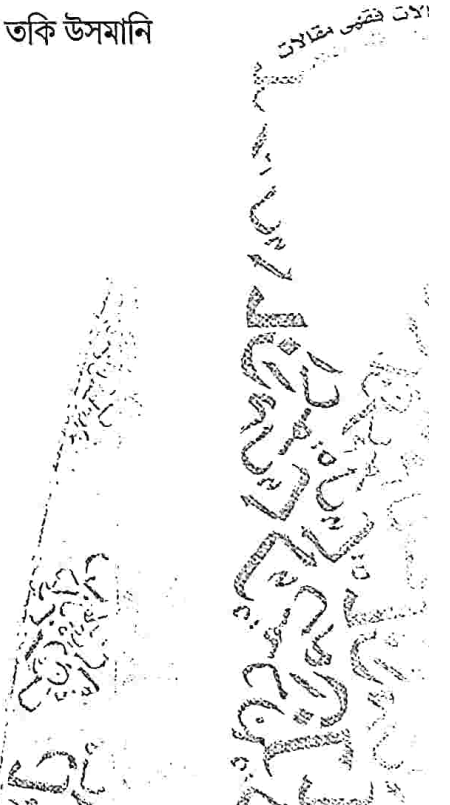

এ মাকালাটি আরবি 'زراعة عضو استوصل فى حد أو قصاص' অথর্াৎ, 'হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন' শীষর্ক মাকালার তরজমা। ১৯৯০ হিজরি সনের ১৪-২০ মার্চে জিদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামি ফিকাহ্ অ্যাকাডেমির ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থাপন করা হয়। বুহুস ফি কাজায়া ফিকহিয়া মুআসারা-এর প্রথম খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

# হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন

হদ বা কেসাসের মাধ্যমে যে অঙ্গকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, সেটিকে প্রতিস্থাপন করা বা আধুনিক সার্জারির মাধ্যমে সেটিকে আগের জায়গায় লাগিয়ে দেওয়ার শরয়ি হুকুম কী? শরয়ি দৃষ্টিকোণে এমনটি করা জায়েজ আছে কি না? যে ব্যক্তি এমন করবে, তার সম্পর্কে শরয়ি বিধান কী? এ বিষয়গুলো এই মাকালার বিষয়-বস্তু।

বর্তমান সময়ে মাসআলাটি এ কারণে আলোচনার মজলিসে গুরুত্বের আসন দখল করেছে যে, অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং সার্জারির মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে বর্তমান মেডিকেল সাইন্স এতটাই উন্নতি লাভ করেছে যে, আগের যুগে যার কল্পনাও করা যেতো না। এ কারণে অনেকের ধারণা হলো, এ মাসআলাটি একটি নতুন মাসআলা। পূর্ববর্তী ফকিহদের কিতাবে যার আলোচনা পাওয়া সম্ভব নয়। বাস্তবতা হলো তাদের এমন ধারণা সঠিক নয়। আগেকার ফকিহগণ তাদের কিতাবে এ মাসআলাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে তার ওপর আলোকপাত করেছেন। যেগুলো মাসআলার রূপায়ণ এবং শরয়ি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

এমন মত প্রকাশের দ্বিতীয় কারণ হলো—কোনো অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা এবং জোড়া লাগানো এমন একটি বিষয়, যা আগেকার ফকিহদের যুগে কল্পনাতীত

ছিলো, এমন ধারণা; আর এ ধারণাটিও সঠিক নয়। বরং এটি এমন একটি বিষয়, আগেকার ফকিহগণ তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। তারা সেটির বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন। এমনকি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দিতে ইমাম মালিক রহ. পরিপূর্ণ পারদর্শিতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। যার সত্যতা আজও বিদ্যমান রয়েছে।

## আলোচনার পয়েন্ট

এ মাসআলাতে ফকিহগণের মাজহাব এবং তাদের বক্তব্য পেশ করার আগে আলোচনাকে নিচের পয়েন্টগুলোতে সীমাবদ্ধ করে নেওয়া ভালো।

১. যদি কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও অঙ্গ কেটে দেয়। তারপর তার থেকে কেসাস নেওয়ার আগেই আক্রান্ত ব্যক্তি তার কর্তিত অঙ্গটি প্রতিস্থাপন করে নেয়, তাহলে কেসাস বা ক্ষতিপূরণ নেওয়ার ক্ষেত্রে সেটি কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে কি না?

এবং কেসাস নেওয়ার পর অপরাধি ব্যক্তি যদি কর্তিত অঙ্গকে নিজ স্থানে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে তার থেকে যে কেসাস নেওয়া হয়েছে, সেটির ওপর এ জোড়া লাগানোর কাজটি কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে কি না?

আমি এ মাসআলাকে 'কেসাসে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজ অঙ্গকে প্রতিস্থাপন' নাম দিয়েছি।

২. কেসাসের মাধ্যমে যদি অপরাধীর কোনো অঙ্গ কেটে দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য কি এমনটি করা জায়েজ আছে যে, সে সার্জারি বা অপারেশনের মাধ্যমে অঙ্গটিকে প্রতিস্থাপন করবে? সে এমনটি করার কারণে তার ওপর কি এমন হুকুম জারি করা হবে যে, সে কেসাসকে বাতিল করেছে?

কেসাসে অপরাধীর কোনো অঙ্গ কেটে দেওয়ার পর যদি সে অঙ্গটিকে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে অপরাধি থেকে দ্বিতীয় বার কেসাস নেওয়ার আবেদন করা যাবে কি?

৩. সার্জারির মাধ্যমে কেউ যদি তার কর্তিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে; চাই সেটি হদ, কেসসা বা অন্য কোনো কারণে বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সে প্রতিস্থাপনের অঙ্গটিকে কি পবিত্র মনে করা হবে? না কি সেটিকে এমন অপবিত্র বলে

মনে করা হবে, যেটি সঙ্গে থাকলে নামাজ সহিহ্ হবে না। এবং সেটিকে দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হবে?

৪. এমন চোর, হদের শাস্তিস্বরূপ যার হাত-পা কেটে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য কি এমনটি করা জায়েজ আছে যে, সে সার্জারির মাধ্যমে তার হাত-পা জোড়া লাগিয়ে নেবে? চোরের এমন পদক্ষেপকে কি 'হাত কাটার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুমে'র ওপর সীমালঙ্ঘন মনে করা হবে? কোনো চোর যদি এমনটি করে, তাহলে দ্বিতীয়বার সে চোরের হাত কেটে দেওয়া হবে কি না?

উল্লিখিত মাসআলাগুলোর প্রত্যেকটিকে ভিন্ন পরিচ্ছেদের অধিনে আলোচনা করা উত্তম হবে।

## প্রথম মাসআলা : আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা

প্রথম মাসআলার বিষয়টি হলো, আক্রান্ত ব্যক্তি সার্জারির মাধ্যমে কর্তিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা। আমার জানামতে এ মাসআলার বিষয়ে সর্বপ্রথম যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং যিনি সর্বপ্রথম সে ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন, তিনি হলেন ইমামু দারুল হিজরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহ.।

এ প্রসঙ্গে 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবে উল্লেখ আছে—

قلت : القائل سحنون، أرأيت الأذنين اذاقطعهما رجل عمدا فردهماصاحبهما فبرأت فثبتا، أو السن اذااسقطهاالرجل عمدا،فردهاصاحبها، فبرأت فثبتت، أيكون القود على قاطع الأذن أوقاطع السن؟ قال:اى ابن قاسم، سمعتهم يسئلون مالكا، فلم يرد عليهم فيهم شيئا، قال : وقدبلغنى عن مالك انه قال: فى السن القود و ان ثبتت، وهو رأيي، والأذن عندى مثله ان يقتص منه، والذى بلغنى عن مالك فى السن لاأدرى أهو فى العمد يقتص منه، أو فى الخطأ ان فيه العقل، الاان ذالك كله عندى سواء فى العمد وفى الخطأ.

'সুহনুন রহ. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম। কেউ যদি ইচ্ছে করে কারও উভয় কান কেটে দেয় এবং যার কান কেটে দেওয়া হয়েছে, সে তার কানকে স্বস্থানে প্রতিস্থাপন করেছে এবং সেটি স্বস্থানে স্থীর হয়ে গেছে। অথবা কেউ কারও দাঁত ফেলে দিলো এবং যার দাঁত ফেলা

হয়েছে, সে তার দাঁতকে স্বস্থানে লাগিয়ে নিলো আর সেটি ভালোও হয়ে গেলো। এমন মাসআলার ক্ষেত্রে আপনার মতামত কী? কান কেটে ফেলা ব্যক্তি বা দাঁত উপড়ে ফেলা ব্যক্তি কারও ওপর কি কেসাস আসবে? ইবনু কাসেম রহ. বলেন, আমি শুনেছি যে, মানুষেরা ইমাম মালিক রহ.-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে কোনো উত্তর দেননি। এরপর ইবনু কাসিম বলেন, ইমাম মালিক রহ. থেকে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, দাঁতের ক্ষেত্রে কেসাস হবে। যদিও সেটি ভালো হয়ে যায়। আর আমার অভিমতও এটি। আর কানের হুকুমটিও আমার কাছে দাঁতের হুকুমের মতো। অর্থাৎ সেখানেও কেসাস নেওয়া হবে। দাঁতের ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ. থেকে আমার কাছে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, তিনি ইচ্ছাকৃত দাঁত উৎপাটনের ক্ষেত্রে এমন হুকুম দিয়েছেন? না কি ভুলক্রমে উৎপাটনের ক্ষেত্রে এমন হুকুম দিয়েছেন? অবশ্য আমার কাছে ইচ্ছাকৃত ও ভুলে উভয় অবস্থার হুকুম একই।’[২১]

এরপর ইমাম মালিক রহ. ও তার ছাত্রদের থেকে পর্যায়ক্রমে এ মাসআলার বিষয়ে বর্ণনা আসতে থাকে। আর সেসব বর্ণনা এ কথার ওপর একমত যে, ইচ্ছাকৃত এমন অপরাধ করলে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করেও নেয় তবুও অপরাধী থেকে কেসাস মওকুফ হবে না। চাই কেটে যাওয়া অঙ্গ আগের অবস্থায় ফিরে আসুক বা তার মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটি থেকে যাক। আর যদি অপরাধটি ভুলবশত হয়। এবং অপরাধীর ওপর কেসাসের রায়ও দিয়ে দেওয়া হয়। রায় দেওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তি তার কেটে যাওয়া অঙ্গ জোড়া লাগিয়ে নেয়। তবে এ ক্ষেত্রেও সব বর্ণনা এমনই যে, কেসাস রহিত করা হবে না।

তবে, যদি অপরাধীর বিরুদ্ধে কেসাসের রায় দেওয়ার আগেই আক্রান্ত ব্যক্তি তার কেটে যাওয়া অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে নেয়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. স্বীয় কিতাব ‘আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল’-এ উল্লিখিত মাসআলাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

فيقضي له بعقلها، ثم يردها صاحبها فثبتت، فلا اختلاف بينهم في أنه لا يرد العقل، اذلا ترجع علي قوتها، هذا مذهب ابن قاسم،

---

[২১] المدونة الكبرى، باب ماجاء فى دية العقل والسمع والاذنين، ج - ১৬، ص-১১১ .

وقول أشهب في كتاب ابن المواز، وروايته عن مالك.

والْاذن بمنزلة السن في ذالك، لا يرد العقل اذا ردها بعد الحكم فثبتت واستمسكت، وإنَّا اختلف فيهما اذا ردها فثبتتا، واستمسكتا وعادتا لهيئتهما قبل الحكم علي ثلاثة،

اقول :احدهُا: قوله في المدونة أنه يقتضي له بالعقل فيهما جميعا، اذلا يمكن أن يعودا لهيئتهما ابدا، وقال أشهب :أنه لا يقتضي له فيهما بشئ اذا عادا لهيئتهما قبل الحكم، والثالث الفرق بين السن والْاذن، فيقضي بعقل السن وان ثبتت، ولا يقضي له في الْاذن بعقل اذااستمسكت وعادت لهيئتها، وان لم تعد لهيئتها عقل له بقدر ما نقصت.....ولا اختلاف بينهم في أنه يقضي له بالقصاص فيهما وإن عادا لهيئتهما.

'যদি বয়স্ক ব্যক্তির দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য দিয়তের রায় দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সে দাঁতকে প্রতিস্থাপন করে এবং প্রতিস্থাপন সফল হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই যে, রায়-দেওয়া দিয়ত রহিত হবে না। কারণ, দাঁত তার আগের অবস্থায় কখনো ফিরে আসবে না। এটি ইবনু কাসেম রহ.-এর মাজহাব। আর ইবনুল মাওয়াজ রহ.-এর কিতাবে ইমাম আশহাব রহ.-এর এই অভিমত নকল করা হয়েছে যে, ইমাম মালিক রহ. থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে।

উল্লিখিত মাসআলাতে কানের হুকুমও দাঁতের হুকুমের মতোই। দিয়তের সিদ্ধান্ত হওয়ার পর আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার কানকে প্রতিস্থাপন করে এবং এই প্রতিস্থাপন সফল হয়, তাহলেও দিয়ত রহিত হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে না। তবে যদি দিয়তের সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করে এবং সেটি সফল হয় এবং কান আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে মালিকি মাজহাবের আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে এবং তিন ধরনের অভিমত বর্ণিত আছে।'

১. প্রথম অভিমত : যেটি 'মুদাওয়ানাতুল কুবরা' কিতাবে উল্লেখ আছে। কান ও দাঁত, দুটোর ক্ষেত্রেই পূর্ণ দিয়তের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। কারণ, এমনটি সম্ভব নয় যে, সেই কান ও দাঁত পরিপূর্ণভাবে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে।

২. দ্বিতীয় অভিমত : ইমাম আশহাব রহ. বলেন, দিয়তের সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে যদি কান ও দাঁতকে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাহলে কোনোটির জন্য দিয়তের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না।

৩. তৃতীয় অভিমত : কান ও দাঁত উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সেটি এই যে, দাঁতের ক্ষেত্রে দিয়ত আদায়ের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। যদিও দাঁতকে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং সেটি ভালোভাবে বসে যায়। আর কানকে যদি প্রতিস্থাপন করা হয় এবং সেটি ভালোভাবে লেগে গিয়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে সে ক্ষেত্রে দিয়তের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে না। আর সেটি যদি পুরোপুরি তার আগের অবস্থায় ফিরে না আসে, তাহলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সে পরিমাণ দিয়ত আরোপ করা হবে।... আর এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, দুটি অঙ্গই আগের অবস্থায় ফিরে আসলেও অপরাধীর বিরুদ্ধে কেসাসের সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।'[২২]

সারকথা এই যে, কোনো অবস্থাতেই কেসাস মওকুফ হবে না। অবশ্য দিয়তের ব্যাপারে তিন ধরণের অভিমত রয়েছে।

ক. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তার কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার কারণে দিয়ত ও ক্ষতিপূরণের বিধান রহিত হবে না।

খ. দিয়ত ও ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে।

গ. কানের দিয়ত রহিত হয়ে যাবে। আর দাঁতের দিয়ত রহিত হবে না।

এই তৃতীয় অভিমতে কান ও দাঁতের হুকুমের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, ইমাম আতাবি রহ. তার 'মুস্তাখরাজাহ' গ্রন্থে ইমাম ইবনু কাসেম রহ. থেকে ইয়াহইয়া রহ.-এর সূত্রে সেটির কারণ বর্ণনা করেছেন—

وسئل - يعني ابن القاسم - عن الرجل يقطع أذن الرجل فير دها وقد كانت اصطلمت فثبتت , أيكون لها عقلها تاما ؟ فقال : إذا ثبتت وعادت لهيئتها فلا عقل فيها , فإن كان في ثبوتها ضعف , فله بحساب ما يرى من نقص قوتها.

قيل له : فالسن تطرح , ثم يردها صاحبها فثبتت , فقال : يغرم

[২২] আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, খণ্ড : ৬১ পৃষ্ঠা : ৬৬,৬৭; কিতাবুদ দিয়ত লিল হাত্তাব : খণ্ড : ৬ পৃষ্ঠা : ২৬২, আল মাওয়াক : খণ্ড : ৬ পৃষ্ঠা : ২৬৪।

عقلها تاما , قيل له: فما فرق بين هذين عندك ؟ قال : لأن الأذن إنَّما هي بضعة , إذا قطعت ثم ردت, استمسكت , وعادت لهيئتها, وجرى الدم والروح فيها . وإن السن إذا بانت من موضعها ثم ردت لم يجر فيها دمها كما كان أبدا , ولا ترجع فيها قوتها أبدا . وإنَّا ردها عندي بمنزلة شيء يوضع مكان التي طرحت للجمال , وأما المنفعة فلا تعود إلى هيئتها أبدا .

'ইবনু কাসেম রহ.-কে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে অন্যের কান কেটে দিয়েছে এবং সেটি আগের জায়গায় লাগানো হয়। আর সেটি ভালোভাবে লেগেও যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির কানের জন্য কি পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে? উত্তরে আবুল কাসেম রহ. বলেন, কানটি যদি তার আগের জায়গায় লেগে যায় এবং আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলে কোনো দিয়ত দিতে হবে না। অবশ্য কানটি যদি তার আগের জায়গায় লাগার ক্ষেত্রে ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে সে ত্রুটি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি কারও দাঁত উপড়ে ফেলা হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি তার দাঁতকে আগের জায়গায় বসিয়ে নেয় ও সেটি ভালোভাবে লেগে যায়। তাহলে তার হুকুম কী হবে? উত্তরে তিনি বলেন, পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, এ দুটির মধ্যে আপনার কাছে কী ব্যবধান রয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, কান হলো একটি গোশতের টুকরো। সেটিকে কেটে দেওয়ার পর পুনরায় স্বস্থানে লাগালে সেটি লেগে যায় এবং ভালো হয়ে যায়। তার মধ্যে রক্ত চলাচল করে এবং জীবন ফিরে আসে। কিন্তু দাঁত যদি তার জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সেটিকে আগের জায়গায় বসানো হলে তার মধ্যে কখনোই রক্ত আসবে না। আর আগের শক্তিও তার মধ্যে আসবে না। আমার মতে দাঁতকে আগের জায়গায় পুনরায় বসানোর বিষয়টি তেমন, যেমন কোনা জিনিস ভেঙে যাওয়ার পর শুধু সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সেটিকে তার আগের জায়গায় রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার তার আগের সেই উপকারিতা কখনোই ফিরে আসে না।'

আল্লামা ইবনুর রুশদ রহ. তার কিতাব 'আল-বায়ান ওয়াত তাহসিল'-এ বর্ণিত

তিনটি অভিমতের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সেসব বর্ণনার কোনোটিতেই কেউ কেসাস ও জরিমানা আরোপের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য করেননি যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তার কর্তিত অঙ্গের প্রতিস্থাপন করলে তার অপরাধী থেকে জরিমানা মওকুফ হবে। তবে কেসাস মওকুফ হবে না।

আমার কাছে যে বিষয়টি স্পষ্ট হলো, (আল্লাহ ভালো জানেন) তা হলো এই যে, ইচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে এ কারণে কেসাস ওয়াজিব হয় যে, তা অপরাধীর পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘনের শাস্তি হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ওপর আমল করতেই এমনটি করা হয়েছে—

﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾

'সুতরাং কেউ যদি তোমাদের প্রতি জুলুম করে, তবে তোমরাও তার প্রতি তেমন জুলুম করতে পারো, যেমন জুলুম সে তোমাদের প্রতি করেছে।'[২৩]

এবং পবিত্র কুরআনের এই আয়াত—

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ.

'ক্ষতের কেসাস নেওয়া হবে।'

আক্রান্ত ব্যক্তি তার কর্তিত অঙ্গকে আগের জায়গায় লাগানোর কারণে অপরাধী ব্যক্তির সীমালঙ্ঘন শেষ হয়ে যায় না। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই কেসাস মওকুফ হবে না। আর দিয়ত ও ক্ষতিপূরণ সেসব অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রেই ওয়াজিব হয়, যেখানে অপরাধী ইচ্ছাকৃত কারও ওপর সীমালঙ্ঘন করে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে জরিমানাটি কেবল তার কাজের ক্ষতিপূরণ। আর আক্রান্ত ব্যক্তির যে অঙ্গটির উপকারিতা হারিয়ে গেছে তার প্রতিদানস্বরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এখন অঙ্গটি যদি তার আগের সেই স্বাভাবিক উপকারিতা ও সৌন্দর্যে ফিরে আসে, তাহলে জরিমানা আরোপ করার মতো ক্ষতি পাওয়া গেলো না। সুতরাং জরিমানার বিধান মওকুফ হয়ে গেলো।

তবে যেটি পরিস্কার বোঝা যায় তা হলো, মালিকি মাজহাবের পছন্দনীয় অভিমত হলো, 'কেসাস' ও 'জরিমানা' এ দুটি প্রয়োগের মধ্যে কোনো ধরনের পার্থক্য নেই। আর সেটি এভাবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকের কেটে ফেলা অঙ্গ স্বস্থানে জোড়া

[২৩] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৯৪।

দেওয়ার দ্বারা জরিমানা ও কেসাস কোনোটির হুকুমই মওকুফ হবে না। সুতরাং আল্লামা খলিল রহ. তার 'মুখতাসার' কিতাবে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া আল্লামা দারদির ও দুসুকি রহ. ও অন্যান্য আলেমগণ এ মতটিই পছন্দ করেছেন । আল্লামা দারদির রহ. এভাবে তার কারণ উল্লেখ করেন যে, মাথায় 'রক্তক্ষয়ী' আঘাত জনিত ব্যক্তি যদি একেবারেই ভালো হয়ে যায় এবং এতে যদি সামান্য পরিমাণ ত্রুটি বা দাগও না থাকে, তখনো এর দ্বারা জরিমানা রহিত হয় না । অনুরূপ হুকুম হবে দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের। যখন কোনো ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে পুনরায় স্বস্থানে লাগানো হবে এবং সুস্থ হয়ে যাবে, তখনো জরিমানা রহিত হবেনা। অথচ উভয়টিই অনিচ্ছাকৃত কর্ম ।[২৪]

## হানাফি মাজহাব

ইমাম মালিক রহ.-এর পর এ মাসআলাটিকে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ শাইবানি রহ. উল্লেখ করেন। তিনি তার 'আসল' নামক কিতাবে বলেন—

"وإذا قلع الرجل سن الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها، فثبتت، وقد كان القلع خطا ، فعلى القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن.

'কোনো ব্যক্তি অন্যের দাঁত উপড়ে ফেলেছে। যার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে, সে তার দাঁতটি নিয়ে পুনরায় স্বস্থানে বসিয়ে দিয়েছে ফলে সেটি লেগে গেছে ও সুস্থ হয়ে গেছে। আর দাঁত উপড়ানোর ঘটনাটি ছিলো ভুলক্রমে ঘটে-যাওয়া। কাজেই এমন ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তির ওপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর অনুরূপ হুকুম হবে কানের ক্ষেত্রেও।'[২৫]

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে স্বস্থানে জোড়া লাগিয়ে দেওয়ার দ্বারা অপরাধী থেকে জরিমানা রহিত হয় না। এরপর হানাফি মাজহাবের অন্যান্য ফকিহগণও এ মাসআলাটি গ্রহণ করেছেন। আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. বলেন—

---

[২৪] দুসুকি, আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. রচিত। খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৫৬-২৭৮।

[২৫] কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান রহ.-এর রচিত। অধ্যায় : দিয়ত, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬৭।

"واذا قلع الرجل سن الرجل خطأ ، فأخذ المقلوع سنه، فأثبتها في مكانها فثبتت، فعلى القالع أرشها، لأنها وان ثبتت لا تصير كما كانت، ألا ترى أنها لا تصل بعروقها؟ ..وكذلك الأذن إذا أعادها إلى مكانها، لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه في الأصل، وإن التصقت»

'যখন ভুলক্রমে কোনো ব্যক্তি অন্যের দাঁত উপড়ে ফেলবে। আর আক্রান্ত ব্যক্তি দাঁতটি আগের জায়গায় লাগিয়ে দেয় এবং সেটি ভালোভাবে লেগে যায়। এমন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। সেটি এ কারণে যে, দাঁতটি যদিও তার আগের জায়গায় লেগে গেছে। কিন্তু আগের সেই আসল অবস্থায় কখনো আসবে না। তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ করো না যে, সেটি তার শিরার সঙ্গে লাগে না? ...অনুরূপ হুকুম হবে কানের ক্ষেত্রেও। সেটিকে যখন তার আগের জায়গায় লাগানো হবে। (তখনো দিয়ত ওয়াজিব হবে।) কারণ, সেটি তার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে না। যদিও সেটি জোড়া লেগে যায়।'[২৬]

উল্লিখিত উদ্ধৃতিতে আল্লামা সারাখসি রহ. জরিমানা রহিত না হওয়ার কারণ বলেছেন যে, জোড়া লাগার পরও অঙ্গটি তার আসল অবস্থায় ফিরে আসে না। এখান থেকে পরবর্তী ফকিহগণ এ মাসআলা বয়ান করেছেন যে, কর্তিত অঙ্গটিকে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানোর পর যখন আগের সৌন্দর্য ও উপকারীতায় ফিরে না আসবে, তখন পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর সাধারণত কোনো অঙ্গই আগের অবস্থায় ফিরে আসে না। তবে যদি জোড়া লাগার পরে আগের সেই সৌন্দর্য ও উপকারিতা ফিরে আসে, তাহলে এমতাবস্থায় অপরাধী ব্যক্তির ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। যেভাবে দাঁত উৎপাটিত ব্যক্তির নতুন দাঁত উঠলে কিছু ওয়াজিব হয় না। যেমনটি আল্লামা জাইলায়ি রহ. শায়খুল ইসলাম থেকে উল্লেখ করেছেন।[২৭]

তবে হানাফিদের কাছে এ মাসআলাটি ভুলক্রমে ঘটে যাওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে ফরজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমনটি আপনি ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম সারাখসি

---

[২৬] আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ., খণ্ড : ২৬, পৃষ্ঠা : ৯৮; বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৩১৫। ফাতহুল কাদির, আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ., খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২২৭।

[২৭] তাবইনুল হাকাইক, আল্লামা জাইলায়ি রহ., খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৩৭। আল-বাহরুর রায়েক, আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ., খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩০৫। রদ্দুল মুখতার, আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ., খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৮৫।

রহ.-এর বক্তব্য দেখলেন। আর এ কারণেই ওইসব ফকিহগণ জরিমানা রহিত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। তবে আমি ইচ্ছাকৃত সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে হানাফি মাজহাবের কিতাবে এমন কোনো হুকুম পাইনি যে, সে ক্ষেত্রে কর্তিত অঙ্গটিকে দ্বিতীবার জোড়া লাগিয়ে নিলে তাদের মতে কেসাস রহিত হবে? স্পষ্ট কথা হলো, আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে দ্বিতীয়বার লাগিয়ে নিলেও কেসাস রহিত হবে না। আর তা এ কারণে যে, যেমনটি আমরা মালিকি মাজহাবের অভিমত তুলে ধরার সময় এ কথা উল্লেখ করেছিলাম যে, কেসাস মূলত অপরাধীর পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃত সীমালঙ্ঘনের শাস্তি স্বরূপ আরোপিত হয়। আর অঙ্গকে দ্বিতীয়বার জোড়ানোর পরেও সীমালঙ্ঘন অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং, ভুলবশত অপরাধের ক্ষেত্রে যখন হানাফি আলেমগণের মতে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের পরও জরিমানা রহিত হয় না। আর ইচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে তো মোটেই কেসাস রহিত হবে না।[২৮]

হ্যাঁ, তবে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ এ কথাটি উল্লেখ করেছেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির দাঁত যদি নিজ থেকে উঠে আসে, তাহলে কেসাস মওকুফ হয়ে যাবে।

তবে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বা কর্তিত অঙ্গকে জোড়া লাগানোর মাসআলাকে এটির ওপর কেয়াস করা যাবে না। আর তার দুটি কারণ রয়েছে।

ক. প্রতিস্থাপিত অঙ্গ কখনো নিজ থেকে ওঠা দাঁতের মতো শক্ত হবে না।

খ. নিজ থেকে দাঁত গজানোর বিষয়টি এ কথা প্রমাণ করে যে, অপরাধী দাঁতটিকে মূল থেকে উঠাতে সক্ষম হয়নি। ফলে কেসাস ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ হয়ে গেলো। তবে সার্জারির মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত অঙ্গের বিষয়টি এ হুকুমের বিপরীত। কেননা, তার মধ্যে আসল দাঁতের শক্তি আসে না এবং অপরাধী দাঁতকে মূল থেকে না উপড়ানোর বিষয়টি দাঁতকে সার্জারির মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং এ আলোচনার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, হানাফি মাজহাব মতেও আক্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার দ্বারা কেসাস রহিত হয় না। যেভাবে মালিকি মাজহাব অনুযায়ী কেসাস রহিত হয় না।

---

[২৮] রদ্দুল মুখতার, আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহ. খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৮৫-৫৮৬।

## শাফিয়ি মাজহাব

এরপর ইমাম শাফিয়ি রহ.-ও উল্লিখিত মাসআলার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে 'উম্ম' গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه، ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه، أو خاط الأنف أو الأذن، أو ربط السن بذهب أو غيره، فثبت وسأل القود فله ذلك، لأنه وجب له القصاص بإبانته

'কেউ যদি অন্যের নাক, কান কেটে দেয় বা সম্পূর্ণরূপে দাঁত উপড়ে ফেলে। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তি তার রক্তের সাহায্যে সে দাঁতকে জোড়া লাগিয়ে নেয় বা নাক, কান সেলাই করে নেয়। অথবা স্বর্ণ ইত্যাদির মাধ্যমে দাঁত লাগিয়ে নেয় এবং তা ভালোভাবে লেগে যায়। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেসাসের দাবি করে, তাহলে তার কেসাস নেওয়ার অধিকার রয়েছে। কেননা, অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার দ্বারাই তার ওপর কেসাস ওয়াজিব হয়ে গেছে।'[২৯]

আল্লামা নববি রহ. তার 'রওজা' নামক গ্রন্থে এ মাসআলাটির আলোচনা করতে গিয়ে তার সঙ্গে দিয়তের মাসআলাটি মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"قطع أذن شخص، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم، فالتصقت، لَم يسقط القصاص ولا الدية عن الْجاني، لْان الحكم يتعلق بلإبانة، وقد وجدت.

'কারও কান কেটে দেওয়া হলো। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ত গরম থাকা অবস্থায় সেটি আগের জায়গায় চেপে রাখলো, ফলে সেটি জোড়া লেগে গেলো, তাহলে এ অবস্থায় অপরাধী থেকে কেসাস ও দিয়তের কোনোটিই মওকুফ হবে না। কেসাস ও দিয়তের হুকুমটি অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তা এখানে পাওয়া গেছে।'[৩০]

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, উল্লিখিত মাসআলাতে শাফিয়ি

---

[২৯] কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফিয়ি রহ., খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫২।

[৩০] রওজাতুত তালেবিন, আল্লামা নববি রহ., খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৯৭। আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ২৫২।

মাজহাবের অভিমত হলো মালিকি মাজহাবের পছন্দনীয় অভিমতের অনুরূপ। আর সেটি এই যে, আক্রান্ত ব্যক্তি সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলেও দিয়ত ও কেসাসের কোনোটিই রহিত হবে না।

## হাম্বালি মাজহাব

এ মাসআলার ব্যাপারে হাম্বালি মাজহাবে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। আল্লামা কাজি আবু ইয়ালা রহ. সে অভিমত দুটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

"إذا قطع أذن الرجل فأبانها، ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت، فهل على الْجاني القصاص أم لا؟ قال أبو بكر في كتاب الخلاف :لا قصاص على الْجاني ، وعليه حكومة الْجراحة، فإن سقطت بعد ذلك بقرب الوقت أو بعده كان القصاص واجبا ، لأن سقوطها من غير جناية عليها من جناية الْأول، وعليه أن يعيد الصلاة .واحتج بأنها لو بانت لم تلتحم، فلما ردها والتحمت كانت الحياة فيها موجودة، فلهذا سقط القصاص.

وعندي أن على الْجاني القصاص، لأن القصاص يجب بالإبانة، وقد أبانها .ولأن هذا الإلصاق مختلف في إقراره عليه، فلا فائدة له فيه.

'কেউ যখন কারও কান কেটে দেয় এবং সেটি একেবারেই পৃথক হয়ে যায়। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিক কেটে-যাওয়া কানকে মাথার সাথে চেপে ধরে এবং সেটি জুড়ে যায়, তাহলে এমন ক্ষেত্রে অপরাধীর ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে কি না? ইমাম আবু বকর রহ. 'খেলাফ' গ্রন্থে বলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধীর ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে না। অবশ্য তার ওপর আঘাতের বিচার আরোপিত হবে। তবে যদি জোড়া লাগানো কান বা কর্তিত অঙ্গ অল্প সময়ের ব্যবধানে বা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পড়ে যায়, তাহলে অপরাধীর ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে। কারণ নতুন কোনো অপরাধ ছাড়াই কান পড়ে যাওয়া মূলত প্রথম অপরাধের কারণেই হয়েছে। আর তার ওপর এ যাবতকালীন আদায়কৃত নামাজকে পুনরায় পড়াও আবশ্যক। এ কথার স্বপক্ষে দলিল এই যে, সেটি যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো, তাহলে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগতো না। সেটি যখন তার আগের স্থানে

লাগানো হলো এবং জোড়া লেগে গেলো, তখন বোঝা যায় যে, তার মধ্যে জীবন ছিলো। এ কারণেই কেসাস রহিত হয়ে যাবে।

কাজি আবু ইয়ালা রহ. বলেন, আমার মতে অপরাধীর ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে। কারণ, অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করার কারণেই কেসাস ওয়াজিব হয়েছে। আর অপরাধী তা করেছে। আর জোড়া লাগার বিষয়টি হলো, তার স্থায়ীত্বের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। সুতরাং এমন জোড়া লাগার কোনো উপকারীতা নেই।'[৩১]

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. দুটি অভিমতই বর্ণনা করেছেন। তবে তার কোনোটিকেই তিনি প্রধান্য দেননি। একই পন্থা অবলম্বন করেছেন আবু ইসহাক ইবনু মুফলিহ।[৩২] আল্লামা মারদাবি, শামসুদ্দিন এবং ইবনু মুফলিহ রহ.ও দুটি অভিমত উল্লেখ করেছেন।[৩৩] আর আল্লামা বুহুতি রহ. আল্লামা আবু বকর রহ.-এর অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। আর তা হলো এই যে, কেসাস ও জরিমানা উভয়টিই রহিত হয়ে যাবে।[৩৪]

## প্রধান্যপ্রাপ্ত অভিমত

এ মাসআলাতে আমাদের কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত সেটি, যেটি মালিকি, হানাফি, শাফিয়ি মাজহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ এবং হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের একটি জামাত গ্রহণ করেছেন যে, আক্রান্ত ব্যক্তি সার্জারির মাধ্যমে তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার কারণে কেসাস ও জরিমানা কোনোটিই রহিত হবে না। কারণ, মূলত কেসাস হলো অপরাধীর থেকে সংঘটিত সীমালঙ্ঘনের শাস্তি। আর অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার দ্বারাই সীমালঙ্ঘন পাওয়া গেছে। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অপরাধী থেকে কেসাস নেওয়ার অধিকারী হয়েছে।

---

[৩১] মাসায়েলে ফিকহিয়া, আল্লামা আবু ইয়ালা রহ.-এর 'আর রিওয়ায়াতাইন ওয়াল ওজহাইন' কিতাব থেকে। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৭-২৬৮।

[৩২] আল মুগনি লি ইবনু কুদামা, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪২৩; শরহুল কাবির ৯, পৃষ্ঠা : ৪৩১; ওয়াল মাবদা লি ইবনু মুফলিহ, খণ্ড : ৮,, পৃষ্ঠা : ৩০৯।

[৩৩] আল ইনসাফ লিল মারদাবি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১০০; ওয়াল ফুরু লি ইবনু মুফলিহ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৫৫।

[৩৪] কাশশাফুল কিনা লিল বুহুতি, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৪১; ওয়া শরহুল মুনতাহাল ইরাদাত ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৬।

আর ভুলক্রমে অপরাধ সংঘটিত হলে আক্রান্ত ব্যক্তি জরিমানার অধিকারী হয়। অতএব, আপন অঙ্গকে প্রতিস্থাপনের কারণে এ অধিকার নষ্ট হবে না। আর নষ্ট না হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

১. আক্রান্ত ব্যক্তি স্বীয় কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা মূলত সেই ক্ষতের ডাক্তারি চিকিৎসা, যা অপরাধীর অপরাধের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। আর চিকিৎসার মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করাটা জরিমানা ও কেসাসের প্রতিবন্ধক হবে না। যেমনটি হুকুম রয়েছে মাথায় রক্তক্ষয়ী আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিধানের ক্ষেত্রে। সেখানে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি চিকিৎসা গ্রহণ করে এবং সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে কেসাস ও জরিমানার বিষয়ে তার অধিকার আদায়ে সেটি কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। এমনই হুকুম হবে অপরাধীর পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার ক্ষেত্রে। উল্লিখিত অপরাধের কারণে অপরাধীর ওপর কেসাস ও জরিমানার যে হুকুম আরোপিত হয়েছিলো, সে ক্ষেত্রে অঙ্গ প্রতিস্থাপন কোনো প্রভাব ফেলবে না।

২. আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার আঘাত প্রাপ্ত বা বিচ্ছিন্ন অঙ্গটিকে প্রতিস্থাপনের দ্বারা কিছুটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কখনোই আসল উপকারিতা ও সৌন্দর্যে ফিরে আসে না। সুতরাং কেসাস ও জরিমানা রহিত করলে আক্রান্ত ব্যক্তির অধিকার নষ্ট করা আবশ্যক হচ্ছে। অথচ শরিয়তের দৃষ্টিতে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সে অধিকারটি প্রমাণিত আছে।

৩. অঙ্গ কেটে ফেলার কারণে নিশ্চিতভাবে কেসাস ও জরিমানা আরোপ হয়েছে এবং কুরআন-হাদিসের অকাট্য বক্তব্যের মাধ্যমে সেটি প্রমাণিত। আর এমন নিশ্চিত বিষয় অনুরূপ নিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যমেই কেবল রহিত হতে পারে। তবে কুরআন-হাদিসে এমন কোনো স্পষ্ট বক্তব্যই নেই, যেখানে এ কথা বলা হয়েছে যে, কেটে যাওয়া অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করলে নিশ্চিতভাবে কেসাস বা জরিমানা রহিত হয়ে যায়।

সুতরাং যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তার ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার কারণে অপরাধী থেকে কেসাস বা জরিমানা রহিত হয় না। তখন এ প্রশ্ন এলো যে, আক্রান্ত ব্যক্তি সার্জারির মাধ্যমে যে কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করেছে, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি সেটিকে আবারও কেটে দেয়,

তাহলে তার ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে কি না? অধিকাংশ ফকিহ্ স্পষ্টভাষায় এ কথা বলেছেন যে, দ্বিতীয়বার কেসাস ওয়াজিব হবে না। আর অনেকে সেটির পক্ষে কারণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন যে, যে অঙ্গকে সার্জারির মাধ্যমে দ্বিতীয়বার লাগানো হয়েছে, সেটি তার আসল উপকারিতা ও সৌন্দর্যে ফিরে আসে না বিধায় উল্লিখিত জোড়া লাগার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা মওসুলি হানাফি রহ. এ সম্পর্কে বলেন—

والمقلوع لا ينبت ثانيا ، لانه لا يلتزق بالعروق والعصب، فكان وجود هذا النبات وعدمه سواء، حتّى لو قلعه إنسان لا شيء عليه.

'উপড়ানো অঙ্গ দ্বিতীয়বার জন্মায় না। কারণ, সেটি আগের মতো হুবহু হাড় ও শিরার সঙ্গে মেলে না। সুতরাং এমন অঙ্গের থাকা না থাকা সমান বিষয়। এমনকি কেউ যদি সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তাহলে তার ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে না।'[৩৫]

উল্লিখিত বক্তব্যের দাবি হলো এই যে, উপড়ানো অঙ্গকে দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেসাস বা দিয়তের কিছুই ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে অঙ্গটি জোড়া লাগা আর না লাগা দুটিকেই সমান মনে করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে অনেক বিচ্ছিন্ন অঙ্গের ক্ষেত্রে এমনটি সম্ভব যে, সেটিকে দ্বিতীয়বার লাগালে শিরা ও হাড়ের সঙ্গে জোড়া লেগে যায়। ফলে এমন অঙ্গের ক্ষেত্রে আল্লামা মুসিলি রহ. কর্তৃক বর্ণিত কারণটি কাজে আসবে না। তবে স্পষ্ট কথা তো এই যে, এমন অঙ্গের ক্ষেত্রে কেসাস ও দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কারণ সার্জারির মাধ্যমে সেটিকে দ্বিতীয়বার লাগানোর কারণে যদিও সেটি তার শিরা ও হাড়ের সঙ্গে জোড়া লেগে গেছে। কিন্তু তারপরও সেটি ত্রুটিযুক্ত অঙ্গ এবং সৃষ্টিগত স্বাভাবিক অঙ্গের সে অবস্থান অর্জন করতে সক্ষম না। সুতরাং সে অঙ্গের বিনিময়ে এমন সুস্থ অঙ্গ কাটা যাবে না, যেটি সৃষ্টিগত আসল অবস্থায় রয়েছে। তবে এমন ত্রুটিযুক্ত অঙ্গ কাটার কারণে দ্বিতীয় অপরাধীর ওপর জরিমানা আরোপ করা আবশ্যক হবে। এটি হলো হাম্বালি মাজহাবের আলেমদের অভিমত। আল্লামা বুহুতি রহ. বলেন—

(وإن قلعه)أي ما قطع ثم رد فالتحم(قالع بعد ذلك فعليه ديته)ولا قصاص فيه،لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة لنقصه بالقلع الأول.

'কেউ যদি এমন অঙ্গ কেটে দেয়—যা ইতোপূর্বে একবার কাটা

[৩৫] আল-ইখতিয়ার লি তালিলিল মুখতার, আল্লামা মুসিলি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৯।

হয়েছিলো এবং সেটিকে দ্বিতীয়বার লাগানো হয়েছে ও তার ক্ষত ভালো হয়ে গেছে—তাহলে দ্বিতীয়বার অঙ্গ কেটে দেওয়া ব্যক্তির ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তার ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ, সে (ত্রুটিপূর্ণ) অঙ্গের বিনিময়ে কেসাস হিসাবে সৃষ্টিগত সুস্থ অঙ্গ কাটা যায় না। কেননা, প্রথমবার সে অঙ্গটি কাটার কারণে সেখানে কেসাস ওয়াজিব হয়েছিলো।'[৩৬]

## দ্বিতীয় মাসআলা : কেসাসে কর্তিত অঙ্গের প্রতিস্থাপন

দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কেসাস হিসাবে যদি অপরাধীর অঙ্গ কাটা হয়, আর কেসাস নেওয়ার পর অপরাধী ব্যক্তি কর্তিত অংশটিকে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে এমন পদক্ষেপকে কি কেসাসের হুকুমের বিরুদ্ধে অবস্থান বলে মনে করা হবে? এবং তার থেকে কি দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে? না কি এমন কাজকে অগ্রহণযোগ্য মনে করা হবে?

সে ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ি রহ. এ কথার ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, অপরাধীর অঙ্গকে একবার বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে কেসাসের হুকুম আদায় হয়ে গেছে। এখন অপরাধী যদি তার অঙ্গকে দ্বিতীয়বার সেখানে লাগিয়ে নেয়, তাহলে সে কারণে আগের কেসাস নেওয়াটা অনর্থক হবে না। এ কারণে তার থেকে দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে না। আর সার্জারির মাধ্যমে যে অঙ্গ লাগানো হয়েছে, সেটিকে তার স্থানে রাখলে সেটি কেসাসের হুকুমের বিরুদ্ধে অবস্থান বলে মনে করা হবে না। সুতরাং ইমাম শাফিয়ি রহ. প্রথম মাসআলা তথা আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার মাসআলা আলোচনা করার পর বলেন—

وإن لم يثبته المجني عليه، أو أراد إثباته فلم يثبت وأقص من الْجاني عليه، فأثبته، فثبت، لَم يكن على الْجاني أكثر من أن يبان منه مرة، وان سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من الْجاني ثانية لَم يقطعه الوالي للقود، لأنه قد أتى بالقود مرة إلى أن يقطعه لأنه ألصق به ميتة.

'যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তার কর্তিত অঙ্গকে আগের জায়গায় না লাগায় অথবা লাগানোর ইচ্ছে করেছিলো। কিন্তু সেটি লাগেনি।[৩৭] আর

[৩৬] শরহে মুনতাহাল ইরাদাত, আল্লামা বুহুতি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৯৬।

[৩৭] এ শর্তটি হুকুমের জন্য 'ইহতিরাজি' (অন্য পদ্ধতিকে তার আওতা থেকে বের করার

অপরাধী থেকে সে অপরাধের কেসাস নেওয়া হয়, আর অপরাধী কেসাসে কর্তিত তার অঙ্গকে দ্বিতীয়বার যথাস্থানে লাগিয়ে নেয় এবং সেটি লেগে যায়, তাহলেও অপরাধী থেকে একবারের বেশি কেসাস নেওয়া যাবে না। আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক অপরাধী থেকে দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়ার দাবি জানালেও বিচারক অপরাধীর অঙ্গ কাটার হুকুম দেবে না। কারণ, বিচারক একবার তার ওপর কেসাসের হুকুম কার্যকর করেছেন। তবে অপরাধী একটি মৃত বস্তু জোড়া লাগালে সে ক্ষেত্রেই কেবল বিচারক দ্বিতীয়বার সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেন।'[৩৮]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, অপরাধীকে তার অঙ্গ প্রতিস্থাপনে বাধা দেওয়া যাবে না এবং কেসাসের হুকুমের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করায় তার প্রতিস্থাপনকৃত অঙ্গকে দ্বিতীয়বার কাটা যাবে না। আর ইমাম শাফিয়ি রহ. মৃত অঙ্গ লাগানোর কারণে সেটি কেটে ফেলার বিষয়ে যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে তৃতীয় মাসআলার অধিনে আলোচনা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

## হাম্বালি মাজহাব

এ মাসআলার ব্যাপারে হাম্বালি মাজহাবে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। যার একটি শাফিয়ি মাজহাবের মতো। আল্লামা ইবনু কুদামা রহ. ''আল-মুগনি' কিতাবে এ অভিমতের পক্ষে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—

وإن قطع أذن إنسان، فاستوفي منه، فألصق الجاني أذنه، فالتصقت، وطلب المجني عليه إبانتها، لَم يكن له ذلك، لأن الإبانة قد

---

জন্য) নয়। বরং কেবল মাসআলার একটি পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম না হলেও অপরাধী কীভাবে প্রতিস্থাপন করবে? সুতরাং তিনি বলছেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি সহিহ নয়। কারণ, অপরাধীর ক্ষেত্রে শুধু একবার তার অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা ওয়াজিব। সেটি তো হয়ে গেছে।

আর এখান থেকে স্পষ্টভাবে এ মাসআলাটি বের হয়ে আসে যে, যদি আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে তো অপরাধীর জন্য আরও উত্তমভাবে স্বীয় অঙ্গকে জোড়া লাগানো জায়েজ হবে। কেননা, এমন ক্ষেত্রে অপরাধী ও আক্রান্ত ব্যক্তি উভয়ের অবস্থান সমান।

[৩৮] কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফিয়ি রহ., খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫২। রওজাতুত তালেবিন, ইমাম নববি রহ., খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৯৭-১৯৮।

حصلت، والقصاص قد استوفي، فلم يبق له قبله حق ...والحكم في السن كالحكم في الأذن.

'যদি কারও কান কেটে দেওয়া হয় এবং অপরাধী থেকে তার কেসাস নেওয়া হয়, এরপর অপরাধী কেসাসে কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করে এবং সেটি লেগে যায়, এবং আক্রান্ত ব্যক্তি তার সে অঙ্গকে দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানায়, তাহলে তার এ দাবি গ্রহণ করা হবে না। কেননা, আগেই বিচ্ছিন্ন করার কাজটি সম্পন্ন হয়েছে এবং কেসাসও নেওয়া হয়ে গেছে। তাই এখন অপরাধীর ওপর আক্রান্ত ব্যক্তির আর কোনো অধিকারই বাকি নেই। ...কানের ক্ষেত্রে যে হুকুম, দাঁতের ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।'[৩৯]

এমনিভাবে আল্লামা কাজি আবু ইয়ালা রহ.-ও এ কথার ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন যে, বর্ণিত ক্ষেত্রে অপরাধী থেকে দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে না। তিনি বলেন—

فإذا قطعنا بها أذن الجاني، ثم ألصقها الجاني، فإن قال المجني عليه: ألصق أذنه بعد أن أثبتها، أزيلوها عنه، قلنا :بقولك لا نزيلها، لأن القصاص وجب بالإبانة وقد وجد ذلك.

'(কেসাস হিসাবে) অপরাধীর কান কেটে দেওয়ার পর সে যদি সেটিকে জোড়া লাগিয়ে নেয়। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, এই অপরাধী কেসাসে কাটা কান আবার জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে, সুতরাং সেটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হোক। এমন ক্ষেত্রে আমরা বলবো, তোমার কথা অনুযায়ী আমরা তার কানকে বিচ্ছিন্ন করবো না। কারণ, বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেসাস ওয়াজিব হয়েছিলো। আর সেটি আদায় হয়ে গেছে।'[৪০]

কিন্তু আল্লামা ইবনু মুফলিহ রহ. ফুরু নামক গ্রন্থে এ কথার ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করেন যে, এ ক্ষেত্রে অপরাধী থেকে দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে। তিনি বলেন—

ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص.

---

[৩৯] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪২৩। শরহুল কাবির, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৩১।

[৪০] কিতাবুর রেওয়ায়াতাইন ওয়াল ওজহাইন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

'অপরাধী ব্যক্তি যদি কেসাসে কর্তিত অঙ্গটিকে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগায়, তাহলে দ্বিতীয়বার তার থেকে কেসাস নেওয়া হবে।'[৪১]

আল্লামা মারদাবি ও বুহুতি রহ. এ অভিমতটিকে গ্রহণ করেছেন। আল্লামা বুহুতি রহ. বলেন—

ومن قطعت أذنه ونحوها كمارنه قصاصا ، فألصقها، فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها، لَم يكن له ذلك، لأنه استوفى القصاص .قطع به في المغني والشرح والمنصوص أنه يقاد ثانيا ، اقتصر عليه في الفروع، وقدمه في المحرر وغيره .قال في الإنصاف » في ديات الأعضاء ومنافعها :أقيد ثانية على الصحيح من المذهب . وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى .قال في شرحه :للمجني عليه إبانته ثانيا ، نص عليه، لأنه أبان عضوا من غيره دواما ، فوجبت إبانته منه دواما لتحقيق المقاصة.

'কোনো ব্যক্তির কান বা অনুরূপ কিছু কেসাস হিসাবে কেটে নেওয়া হলো—যেমন : নাকের কিনারা—আর অপরাধী সেটিকে দ্বিতীয়বার জোড়া লাগালো এবং সেটি ভালোভাবে জোড়া লেগে গেলো। এখন আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সেটিকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি জানানোর অধিকার নেই। কারণ, একবার সে অপরাধী থেকে কেসাস নিয়ে নিয়েছে। আল-মুগনি ও শরহুল কাবির গ্রন্থে এটিকে অকাট্য হুকুম বলা হয়েছে। অবশ্য (তাদের মাজহাবের ইমাম থেকে বর্ণিত) নস দ্বারা এটিই প্রমাণিত যে, এমন ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে। 'ফুরু' গ্রন্থে এ অভিমতের ওপর সিদ্ধান্ত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুহাররির ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত অভিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 'আল-ইনসাফ' গ্রন্থে অঙ্গ ও তার উপকারিতার দিয়তের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সহিহ মাজহাব অনুযায়ী দ্বিতীয়বার কেসাস নেওয়া হবে।[৪২] 'তানকিহ' গ্রন্থে এ অভিমতকে অকাট্য হুকুম বলা হয়েছে এবং 'আল-মুনতাহা' গ্রন্থে তার অনুসরণ করা হয়েছে। 'আত-তানকিহ' কিতাবের ব্যাখ্যায় বলা

[৪১] আল-ফুরু, ইবনু মুফলিহ রহ. খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৫৫। এরপর কাজি সেটিকে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেবে কিনা সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নাপাকের মাসআলার আলোচনায় সে সম্পর্কে কথা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

[৪২] আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৫৫।

হয়েছে, আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বিতীয়বার কেসাস নিয়ে তার অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে। এ হুকুমের বিষয়ে স্পষ্ট নস রয়েছে। কারণ, অপরাধী অন্যের অঙ্গকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। সুতরাং অপরাধীর অঙ্গকেও স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করা হবে। এতে করে সমতার বিষয়টি নিশ্চিত হবে।'[৪৩]

## মালিকি মাজহাব

মালিকি মাজহাবেও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কেটে যাওয়া অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা এসেছে। যেমনটি আমরা আগের মাসআলার আলোচনায় তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছি। তবে কেসাসের হুকুম কার্যকর হওয়ার পর অপরাধীর কেটে ফেলা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে যেরূপ স্পষ্টতার সঙ্গে শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের কিতাবে আলোচনা পেয়েছি অনুরূপ স্পষ্টতার সঙ্গে আলোচনা মালিকি মাজহাবে পাইনি। তবে তাদের কিতাবে আল্লামা ইবনু রুশদ রহ.-এর একটি বক্তব্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনা পেয়েছি। তিনি বলেন—

فإن اقتص بعد أن عادا لهيئتهما، فعادت أذن المقتص منه أو عينه فذلك، وإن لَم يعودا، وقد كانت عادت سن الْأول أو أذنه فلا شيء له، وإن عادت سن المستقاد منه أو أذنه، ولَم تكن عادت سن الْأول ولا أذنه غرم العقل .قاله أشهب في كتاب ابن المواز.

'আর যদি উভয় অঙ্গই প্রকৃত অবস্থায় ফিরে আসার পর কেসাস নেওয়া হয় এবং অপরাধীর কান বা চোখ আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাহলেও একই হুকুম হবে। আর যদি উভয় অঙ্গই স্বীয় প্রকৃত অবস্থায় ফিরে না আসে অথবা প্রথম জনের দাঁত বা নাক আগের অবস্থায় ফিরে আসে, (তাহলে তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ হবে না।) আর যদি অপরাধীর দাঁত বা কান আগের জায়গায় ফিরে আসে কিন্তু প্রথম ব্যক্তির দাঁত বা কান আগের জায়গায় ফিরে না আসে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হবে। আল্লামা আশহাব রহ. ইবনুল মাওয়াজ রহ.-এর কিতাবে অনুরূপ বলেছেন।'[৪৪]

সারকথা হলো, মালিকি মাজহাবে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজ অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করলে

---

[৪৩] কিতাবুল কেনা, আল্লামা বুহুতি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৬৪১।

[৪৪] আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, আল্লামা ইবনু রুশদ রহ., খণ্ড : ১৬, পৃষ্ঠা : ৬৮।

অপরাধী ব্যক্তির কেসাসে কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করাটা কেসাস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন না করে এবং অপরাধী তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে অপরাধী ক্ষতিপূরণ দেবে।

## হানাফি মাজহাব

হানাফি মাজহাবের গ্রন্থাবলিতে অপরাধী কর্তৃক অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মাসআলাটি পাইনি। তবে ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে 'আল মুহিত' গ্রন্থ সূত্রে আমাদের আলোচিত মাসআলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এমন একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। আর সেটি হলো এই—

> إذا قلع رجل ثنية رجل عمدا، فاقتص له من ثنية القالع، ثم نبتت ثنية المقتص منه، لَم يكن للمقتص له أن يقلع تلك الثنية التي نبتت ثانيا.
>
> 'কেউ যদি ইচ্ছাকৃত অন্যের সামনের দাঁত ফেলে দেয় আর এটির কেসাস হিসাবে অপরাধীর সামনের দাঁত ফেলে দেওয়া হয়; এরপর অপরাধীর দাঁত এমনিতেই ওঠে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির এ অধিকার নেই যে, সে দ্বিতীয়বার কেসাস হিসাবে অপরাধীর সামনের দাঁত ফেলে দেওয়ার দাবি করবে। যেটি দ্বিতীয়বার উঠেছে।'[৪৫]

উদ্ধৃতিটি এ কথার প্রমাণ করছে যে, হানাফি মাজহাবের ফকিহদের আসল মত হলো আক্রান্ত ব্যক্তি কেবল একবারই কেসাস নেওয়ার অধিকারী। তার এ অধিকার নেই যে, স্থায়ীভাবে অপরাধীর অঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে। সুতরাং পরিস্কার কথা হলো, এ মাসআলাতে হানাফিদের অভিমত হলো শাফিয়ি মাজহাবের অভিমতের অনুরূপ। আর সেটি হয়েছে কয়েকটি কারণে।

১. নিজ থেকে ওঠা সামনের দাঁত না উপড়ানোর বিষয়ে তারা মত দিয়েছে এবং এটিকে কেসাসের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে অবস্থান মনে করেনি। অথচ জোড়া লাগানো দাঁতের চেয়ে সেটি বেশি মজবুত এবং বেশি উপকারী হয়। সুতরাং জোড়া লাগানো দাঁতটিও কেসাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হওয়ার বিষয়টি আরও বেশি উপযুক্ত।

---

[৪৫] ফাতাওয়া হিন্দিয়া, আল বাবুর রাবে মিন জিনায়াত খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১১।

২. প্রথম মাসআলাতে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করেছি যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপন অপরাধীর ওপর কেসাস বা জরিমানা আরোপের মধ্যে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলবে না। বরং প্রতিস্থাপন ছাড়া কেসাসের যে হুকুম ছিলো সেটিই বাকি থাকবে। সুতরাং এই মাসআলার ওপর অপরাধীর অঙ্গকে প্রতিস্থাপনের মাসআলাকে কেয়াস করা হবে। আর তার থেকে যে কেসাস নেওয়া হয়েছে সেটির ক্ষেত্রে এটি কোনো প্রভাব ফেলবে না। অন্যথায় এটি তো ইনসাফ হতে পারে না যে, আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হবে। আর অপরাধীকে তা থেকে একেবারেই বাধা দেওয়া হবে।

সুতরাং এ মাসআলার ব্যাপারে শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের এক দল ফকিহের যে অভিমত সেটিই আমার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত। আর এই অভিমতটি হানাফি মাজহাবেরও দাবি। সেটি হলো এই যে, অপরাধী ব্যক্তির অঙ্গকে একবার বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা কেসাস আদায় হয়ে যাবে। এরপর দু-পক্ষই তাদের অঙ্গকে সার্জারির মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে স্বাধীন। যার ইচ্ছে হবে সে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তার অঙ্গকে জোড়া লাগাবে। এখন অপরাধী যদি এ কাজটি করে আর আক্রান্ত ব্যক্তি যদি না করে, তাহলে এমন কর্মের ভিত্তি হবে সেই কথার ওপর যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ শরীরে ইচ্ছে অনুযায়ী সংস্কার করার স্বাধীনতা রাখে। আর এ কথা বলা যাবে না যে, অপরাধীর এমন পদক্ষেপ কেসাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন : আক্রান্ত ব্যক্তি নিজ অঙ্গের প্রতিস্থাপন করলে আর অপরাধী প্রতিস্থাপন না করলে, এটিও কেসাসের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলবে না। প্রত্যেকেই নিজ শরীরের সমস্যার জন্য যে চিকিৎসা সহজ মনে করবে, তাই অবলম্বন করবে। আর শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমান-সমান করার কোনো পন্থা নেই। মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

## তৃতীয় মাসআলা : প্রতিস্থাপিত অঙ্গটি নাপাক বলে সাব্যস্ত হবে?

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করেছি, তা ছিলো কেসাসের মাসআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ যাবত আমরা কর্তিত অঙ্গ জোড়া লাগানোর মাসআলায় এ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, সেটি কেসাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কি না? ইতোপূর্বে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের অভিমত হলো কর্তিত অঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে কেসাসে সেটি কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা

বা প্রভাব বিস্তার করবে না। সুতরাং বিচ্ছিন্ন অঙ্গ জোড়া লাগানোর আগে যে হুকুম ছিলো, জোড়া লাগানোর পরও সেই একই হুকুম বহাল থাকবে। এবং জোড়া লাগানোর আগে যে কেসাস কার্যকর করা হয়েছে, দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানোর পর তা পুনরায় কার্যকর করার হুকুম দেওয়া হবে না।

আমরা এখন দ্বিতীয় একটি মাসআলার আলোচনায় যাবো। আর সেটি এই যে, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপরাধীর জন্য অঙ্গের প্রতিস্থাপন কি ধর্মীয় দৃষ্টিতে জায়েজ আছে? আর প্রতিস্থাপিত অঙ্গটি পবিত্র মনে করা হবে কি না? সে অঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে নামাজ পড়া জায়েজ হবে কি না?

উল্লিখিত মাসআলাটি এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে যে, জীবিত মানুষের বিচ্ছেদকৃত অঙ্গ পবিত্র হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ফকিহদের একটি দলের অভিমত এই যে, কোনো ধরনের শর্ত ছাড়া জীবিত মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ হারাম। তারা মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন—

ما قطع من حي فهو ميت

'জীবিত থেকে কর্তিত অংশ মৃতের হুকুমে।'[৪৬]

এবং আবু ওয়াকেদ লাইসি রা.-এর বর্ণিত হাদিস দ্বারাও তারা দলিল দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন—

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ قَالَ : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন সময় মদিনায় আগমন করেন, যখন মদিনাবাসী জীবিত উটের কুজ এবং দুম্বার নিতম্বের বাড়তি অংশ কেটে নিতো। তখন মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জীবিত প্রাণী থেকে যে অংশ কেটে নেওয়া হবে, সেটি মৃতের হুকুমে।'[৪৭]

---

[৪৬] ইমাম হাকিম রহ. মুস্তাদরাক গ্রন্থে উল্লিখিত ভাষ্যেই এ হাদিসটি আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে নকল করেছেন এবং এটিকে সহিহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। , খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৩৯। আল্লামা জাহাবি রহ. হাদিসটি প্রমাণিত হওয়ার দাবি করেছেন।

[৪৭] সুনানে তিরমিজি, অধ্যায় : শিকার, পরিচ্ছেদ : জীবিত প্রাণী থেকে কর্তিত অংশ মৃতের

এই হাদিসের আলোকে ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন যে, এই হুকুমটি সব ধরনের জীবিত প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। 'উম্ম' গ্রন্থে বলেন—

وإذا كسر للمرأة عظم، فطار، فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا .وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة، فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت ...وإن رفع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان فهو كالميتة، فعليه قلعه، وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه .فإن لَ يقلعه جبره السلطان على قلعه.

'যদি কোনো মহিলার হাড় ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে গোশত খাওয়া বৈধ এমন জবাইকৃত প্রাণী ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর হাড় সেখানে জোড়া লাগানো জায়েজ নেই। অনুরূপভাবে কারও দাঁত পড়ে গেলে সেটিও মৃতের হুকুমে হবে। সুতরাং কোনো দাঁত বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেটিকে পুনরায় লাগানো জায়েজ নেই।...যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হাড়কে মৃত প্রাণীর হাড় দ্বারা বা গোশত খাওয়া বৈধ নয় এমন জাবাইকৃত প্রাণীর হাড় দ্বারা অথবা কোনো মানুষের হাড় দ্বারা জোড়া লাগায়, তাহলে সেটি মৃতের হুকুমে হবে। সুতরাং সেটিকে খুলে ফেলা ওয়াজিব। সে যদি স্বেচ্ছায় না খোলে, তাহলে বাদশা তাকে খুলতে বাধ্য করবে। আর সে হাড় সঙ্গে নিয়ে যত নামাজ আদায় করেছে, সেগুলোকে পুনরায় আদায় করতে হবে।'[৪৮]

আমরা বিগত পৃষ্ঠাগুলোতে দ্বিতীয় মাসআলা বর্ণনা করার সময় ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর এ বক্তব্য নকল করেছিলাম—

وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من الْجاني ثانية، لَم يقطعه الوالي للقود، لأنه قد أتى بالقود مرة، إلا أن يقطعه، لأنه ألصق به ميتة.

'আক্রান্ত ব্যক্তির অভিভাবক যদি অপরাধীর জোড়া লাগানো অঙ্গকে দ্বিতীয়বার কেটে ফেলার দাবি জানায়, তাহলে বিচারক কেসাস হিসাবে সেটি বিচ্ছিন্ন করবে না। কারণ, একবার অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা তার থেকে কেসাস আদায় হয়ে গেছে। তবে বিচারক অপরাধীর সে অঙ্গকে

---

হুকুমে, হাদিস : ১৫০৮, ১৫০৯।

[৪৮] কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফিয়ি রহ., পরিচ্ছেদ : পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে যা কিছু সংযুক্ত করা হয়, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪।

এ কারণে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে যে, সে একটি মৃত অঙ্গকে নিজ শরীরে লাগিয়েছে।'[৪৯]

উল্লিখিত বক্তব্যটি ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর ওই অভিমতের প্রতি ইঙ্গিত করছে। সুতরাং যেন ইমাম শাফিয়ি রহ. ('কিতাবুল উম্ম'-এর উদ্ধৃতি থেকে যে বিষয়টি বুঝা যায়) অপরাধীর নিজ অঙ্গের প্রতিস্থাপনের প্রতিবন্ধকতাকে এ হিসাবে দেখেননি যে তা কেসাসের উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ। বরং তিনি এ দৃষ্টিকোণ থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপনকে জায়েজ মনে করেন না যে, শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নাপাকে পরিণত হয়। সুতরাং সেটিকে প্রতিস্থাপন জায়েজ নেই। আর যদি কেউ প্রতিস্থাপন করে, তাহলে বাদশাহ অঙ্গটিকে দ্বিতীয়বার বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেবে। কেননা, অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন না করলে তার নামাজ হবে না।

কিন্তু আমরা যখন শাফিয়ি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো দেখি, তখন এ কথা স্পষ্ট হয় যে, শাফিয়ি মাজহাবের বড়ো সংখ্যক ফকিহ জীবিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে পবিত্র মনে করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববি রহ. বলেন—

الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة ...ويستثنى أيضا شعر الآدمي، والعضو البان منه ...فهذه كلها طاهرة علي المذهب.

'মূলনীতি হলো, জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নাপাক। অবশ্য গোশত খাওয়া বৈধ এমন জীবিত প্রাণী থেকে যদি চুল কাটা হয়, তাহলে সেটি পাক হবে। ...অনুরূপভাবে মানুষের চুল ও তার বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে এ—জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নাপাক—মাসআলা থেকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। ...সুতরাং আমাদের মাজহাব অনুযায়ী এগুলোর সবই পাক।'[৫০]

আল্লামা খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

والجزء المنفصل من الحيوان الحي ومشيمته كميتته، أي ذلك الحي، إن طاهرا فطاهر، وإن نجسا فنجس ...فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر، ومن غيرها نجس.

---

[৪৯] কিতাবুল উম্ম, ইমাম শাফিয়ি রহ., খণ্ড : ৬ পৃষ্ঠা : ৫২।

[৫০] রওজাতুত তালেবিন, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫।

'জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ এবং তার কর্তিত নিতম্ব ওই প্রাণীর মৃত অবস্থার হুকুমে। অর্থাৎ সে প্রাণীটি যদি পাক হয়ে থাকে, তাহলে সে অঙ্গটি পাক হবে। আর প্রাণীটি নাপাক হলে অঙ্গটিও নাপাক হবে। ...সুতরাং মানুষ, মাছ বা পঙ্গপাল থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পাক। আর অন্যান্য প্রাণীর বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নাপাক।'[৫১]

আল্লামা রমলি রহ. বলেন—

والْجزء المنفصل بنفسه أو بفعل فاعل من الحيوان الحي كميتته طهارة وضدها ...فاليد من الآدمي طاهرة، ولو مقطوعة في سرقة.

'জীবিত প্রাণী থেকে নিজে নিজে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা কেউ বিচ্ছিন্ন করার কারণে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পাক-নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সেই প্রাণীর মৃত অবস্থার হুকুমে। সুতরাং মানুষের বিচ্ছিন্ন হাতও পাক। যদিও চুরির অপরাধে সেটি বিচ্ছিন্ন করা হয়ে থাকে।'[৫২]

এই বক্তব্যের নিচে আল্লামা শিবরামলাসি রহ. বলেন—

انظر لو اتصل الْجزء المذكور بأصله وحلته الحياة، هل يطهر ويؤكل بعد التذكية أولا؟ ونظيره ما لو أحيا الله الميتة ثم ذكيت، ولا يظهر في هذه إلا الحل، فكذا الْولى.

'লক্ষ করো, উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন অঙ্গ যদি তার মূলের সঙ্গে লেগে যায় এবং তার মধ্যে জীবন চলে আসে, তাহলে কি সেটি পাক হবে? জবাই করার পর খাওয়া যাবে কি না?... এটির দৃষ্টান্ত হলো ওই মাসআলা, যেখানে মারা যাবার পর মহান আল্লাহ সেটিকে দ্বিতীয়বার জীবিত করেছে, এরপর সেটিকে জবাই করা হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে হালাল হওয়ার বিষয়টিই ফুটে ওঠে। সুতরাং প্রথম মাসআলার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে।'[৫৩] (প্রাণীর মতোই তার বিচ্ছিন্ন অঙ্গের হুকুম হবে।)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো এ কথার প্রমাণ করে যে, জীবিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ শর্তহীনভাবে পাক। তবে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের হুকুম হলো, সেটি বিচ্ছিন্ন

---

[৫১] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮০।

[৫২] নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৮।

[৫৩] হাশিআতু নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২২৮।

হওয়ার পর যদি মূলের সঙ্গে জোড়া না লাগে, তাহলে সেটি নাপাক হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে। আর যদি জোড়া লেগে যায় এবং তার মধ্যে জীবন ফিরে আসে, তাহলে সেটি পাকের হুকুমে ফিরে আসবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর 'কিতাবুল উম্ম'-এর উদ্ধৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সুতরাং এমনটি হতে পারে যে, ইমাম শাফিয়ি রহ. তার অভিমত থেকে ফিরে এসেছেন কিংবা শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণ তার মতের বিপরীত মত গ্রহণ করেছেন। তবে মোটকথা হলো, বর্তমানে শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহদের কাছে গ্রহণযোগ্য মাজহাব হলো, মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পবিত্র হওয়া। আর এ অভিমত অনুযায়ী কোনো অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেটিকে প্রতিস্থাপন করলে দ্বিতীয়বার অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হবে না এবং সেটিকে সঙ্গে নিয়ে আদায়কৃত নামাজকে দ্বিতীয়বার আদায়ের হুকুম দেওয়া হবে না।

এ মাসআলার ব্যাপারে হানাফি মাজহাবের অভিমত হলো। যেসব অঙ্গে জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটে না। যেমন : নখ, দাঁত, চুল ইত্যাদি। সেগুলো সম্পর্কে তাদের আসল মাজহাব হলো জীবিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে নাপাক হবে না। কিন্তু যেসব অঙ্গে জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন : কান, নাক ইত্যাদি। এগুলো জীবিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে নাপাক হয়ে যাবে। তবে হানাফি মাজহাবের পরবর্তী ফকিহগণ এ মত দিয়েছেন যে, যার থেকে অঙ্গটি বিচ্ছিন্ন হয়েছে তার ক্ষেত্রে নাপাক থাকবে না। সুতরাং যার অঙ্গ সে যদি আসল অঙ্গের সাথে বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে জোড়া লাগিয়ে নেয়, তাহলে সেখানে নাপাকের হুকুম দেওয়া হবে না। তবে অন্যের ক্ষেত্রে সেটি নাপাক হবে। সুতরাং কেউ যদি নিজ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ ছাড়া অন্যের অঙ্গকে নিজ শরীরে জোড়া লাগায়, তাহলে সেটি নাপাক হবে। আর এ হুকুম ওই সময় পর্যন্ত বহাল থাকবে, যতক্ষণ তার প্রতিস্থাপিত অঙ্গে জীবন ফিরে না আসবে । আর জোড়া লাগানোর পরে যদি তার মধ্যে জীবন ফিরে আসে, তাহলে অন্যের প্রতিস্থাপিত অঙ্গও নাপাক হবে না।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. উল্লিখিত নীতিটি এভাবে বয়ান করেছেন—

إن أجزاء الميتة لا تخلو :إما أن يكون فيها دم أو لا، فالأولى كاللحم نجسة، والثانية ففي غير الخنزير والآدمي ليست بنجسة إن كانت صلبة، كالشعر والعظم بلا خلاف ...وأما الآدمي ففيه روايتان :في رواية نجسة ...وفي رواية طاهرة لعدم الدم، وعدم جواز البيع للكرامة.

'মৃত প্রাণীর অঙ্গ দুটি অবস্থার বাইরে নয়। হয়তো তার মধ্যে রক্ত থাকবে, অথবা থাকবে না। প্রথম প্রকারের অঙ্গ যেমন : গোশত। এ অঙ্গের হুকুম হলো নাপাক হওয়া। আর দ্বিতীয় প্রকারের অঙ্গের হুকুম হলো, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষ ও শূকর ছাড়া অন্য প্রাণীর শক্ত অঙ্গ পাক। যেমন : চুল, হাড় ইত্যাদি। ...তবে মানুষের ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমত রয়েছে। একটি অভিমত অনুযায়ী এমন অঙ্গ নাপাক। আর অন্য অভিমত অনুযায়ী তার মধ্যে রক্ত না থাকার কারণে সেটি পাক। অবশ্য মানুষের সম্মান, মর্যাদার কারণে সেগুলোর বিক্রয় জায়েজ নেই।'[৫৪]

তবে ফাতাওয়া তাতার খানিয়াতে উল্লেখ আছে—

قلع إنسان سنه ، أو قطع أذنه، ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى، أو صلى و سنه أوأذنه في كمه ، تجوز صلاته في ظاهر الرواية.

'কোনো ব্যক্তি যদি নিজের দাঁত উপড়ে ফেললো বা কান কেটে ফেললো, তারপর সেটিকে জোড়া লাগিয়ে নিলো এবং ওই অবস্থায়ই নামাজ আদায় করলো। অথবা উপড়ানো দাঁত কিংবা কর্তিত কান আস্তিনে রেখে নামাজ পড়লো। জাহেরুর রেওয়াত অনুযায়ী তার নামাজ হয়ে যাবে।'[৫৫]

উল্লিখিত মাসআলাটি তাজনিস, খুলাসা ও সিরাজুল ওহহাজ কিতাবেও উল্লেখ আছে, যেমনটি আল-বাহরুর রায়েক ও রদ্দুল মুখতার কিতাবে আছে। কিন্তু উল্লিখিত নীতির ভিত্তির ওপর অনেক আলেম এই অভিযোগ করেছেন যে, কান এমন একটি অঙ্গ যার মধ্যে জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটে। সুতরাং হানাফিদের নীতি অনুযায়ী বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সেটি নাপাক হওয়া উচিত। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ.-এর বর্ণনা অনুযায়ী আল্লামা মাকদিসি রহ. এভাবে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—

والجواب عن الإشكال أن إعادة الأذن وثباتها إنّما يكون غالبا بعود الحياة إليها، فلا يصدق أنه مما أبين من الحي، لأنها بعود الحياة إليها

[৫৪] আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৬।

[৫৫] ফাতাওয়া কাজিখান, পরিচ্ছেদ : কাপড়ে লাগা নাপাক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩০।

صارت كأنها لَم تبن، ولو فرضنا شخصا مات، ثم أعيدت حياته معجزة، أو كرامة، لعاد طاهرا.

'প্রশ্নের উত্তর এই যে, কানকে তার আসল অঙ্গের সঙ্গে জোড়া লাগানো এবং কান সে জায়গায় জোড়া লেগে যাওয়া এটি সাধারণত জীবন সঞ্চালনসহ হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য হবে না যে, সেটি কোনো জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কেননা, তার মধ্যে জীবন ফিরে আসার কারণে সেটি কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়নি বলে মনে করা হবে। আমরা যদি এক ব্যক্তির ব্যাপারে ধরে নেই যে, সে মারা গেছে তারপর কারামত বা মুজিজাস্বরূপ পুনরায় জীবিত হয়েছে, তাহলে সে পাক হয়ে যাবে।'[৫৬]

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. এ কথা বলে উল্লিখিত উদ্ধৃতির টীকা লিখেছেন যে—

أقول : إن عادت الحياة إليها فهومسلم، لكن يبقى الإشكال لو صلى وهي في كمه مثلا، والْأحسن ما أشار إليه الشارح ( أي صاحب الدر المختار) من الجواب بقوله وفي الْأشباه ...إلخ، وبه صرح في السراج ( أي حيث قال :والْأذن المقطوعة والسن المقطوعة طاهرتان في حق صاحبهما، وإن كانتا أكثر من قدر الدرهم )فما في الخانية من جوازصلاته ولو الْأذن في كمه، لطهارتها في حقه، لأنها أذنه.

'আমি বলি, প্রতিস্থাপিত অঙ্গে যদি জীবন ফিরে আসে, তাহলে এ কথাটি মেনে নেওয়া যায়—কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন তো এখনো থেকে যায় যে, বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে আস্তিনের মধ্যে রেখে নামাজ আদয় করলে কি নামাজ হয়ে যাবে? এ ব্যাপারে কত সুন্দর কথা সেটি, উত্তর দিতে গিয়ে যার দিকে ব্যাখাকার (আদদুররুল মুখতারের লেখক) 'আশবাহ কিতাবে আছে' বলে ইঙ্গিত করেছেন। 'সিরাজুল ওহহাজ' গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্তিত কান ও ভেঙে-যাওয়া দাঁত যার বিচ্ছিন্ন অঙ্গ হবে, তার ক্ষেত্রে সেটি পবিত্র (তবে অন্যের ক্ষেত্রে সেটি অপবিত্র)। যদিও সেটি এক দিরহামের বেশি পরিমাণ

[৫৬] শাফিয়ি মাজহাবের আল্লামা শিবরামলাসি রহ.-এর পক্ষ থেকে নিহায়াতুল মোহতাজের টীকায় সে দলিল উল্লেখ করেছেন, এটি হুবহু সেই দলিল।

হয়ে থাকে।) সুতরাং ফাতাওয়া তাতার খানিয়াতে যে কথা এসেছে, কর্তিত কানকে আস্তিনে রেখে নামাজ আদায় করলে নামাজ হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যখন কোনো ব্যক্তি নিজের বিচ্ছিন্ন কানকে নিজের আস্তিনে রাখবে। এখানে পবিত্র হওয়ার কারণ, কানটি তার নিজের।'[৫৭]

আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. 'আল-আশবাহ' কিতাবের যে ইবারতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন সেটি এই—

الْجزء المنفصل من الحي كميته، كالْأذن المقطوعة والسن الساقطة إلا في حق صاحبه فطاهر وإن كثر.

'জীবিত প্রাণী থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ ওই প্রাণীর মৃত অবস্থার হুকুমের মতো। যেমন : বিচ্ছিন্ন কান এবং পড়ে যাওয়া দাঁত। কিন্তু যার থেকে কেটে বা পড়ে গেছে তার ক্ষেত্রে সেগুলো পাক যদিও তার পরিমাণ বেশি হয়।'[৫৮] (তবে অন্যের ক্ষেত্রে নাপাক হবে)

উল্লিখিত ফিকহি উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, হানাফি আলেমদের অভিমত অনুযায়ী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ তার নিজের ক্ষেত্রে নাপাক নয়। অনুরূপভাবে প্রতিস্থাপনের পর তার মধ্যে জীবনের অনুপ্রবেশ ঘটলে প্রতিস্থাপিত অঙ্গটি অন্যের হলেও নাপাক নয়। তবে বিচ্ছিন্ন অঙ্গ অপর ব্যক্তির জন্য ততক্ষন পর্যন্ত নাপাক বলে গণ্য হবে, যতক্ষন পর্যন্ত তাতে প্রাণ সঞ্চারিত না হবে। অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, এই মাসআলাতে হানাফি আলেমদের অভিমত শাফিয়ি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমতের মতোই। আর সেটি হলো, বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে তার আসল স্থানে প্রতিস্থাপন করলে সেটি নাপাক থাকবে না। সুতরাং এমনটি করতে বাধা দেওয়া হবে না এবং তার কারণে নামাজ নষ্ট হবে না।

## মালিকি মাজহাব

এ মাসআলার ব্যাপারে মালিকি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ নাপাক নয়।

---

[৫৭] রদ্দুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৭। মিনহাতুল খলেক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১০৭।

[৫৮] আল-আশবাহ ওয়ান নাজায়ের, আল্লামা হামাবি রহ.-এর টীকাসহ। ফন নং দুই, অধ্যায় : পবিত্রতা, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০৩।

আল্লামা দারদির রহ. 'শরহে কাবির' কিতাবে বলেন—

فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد.

'নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ শর্তহীনভাবে পাক।'

আল্লামা দুসুকি রহ. এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন—

"أي بناء على المعتمد من طهارة ميتته، وأما على الضعيف فما أبين منه نجس مطلقا...على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقا، يجوز رد سن قلعت لمحلها لا على مقابله.

'মৃত মানুষ পাক' এই নির্ভরযোগ্য মতের ওপর ভিত্তি করে এই হুকুম দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মালিকি মাজহাবের দূর্বল অভিমত হলো মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সাধারনত নাপাক। যেহেতু নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পাক। তাই উপড়ে ফেলা দাঁতকে তার আপন জায়গায় দ্বিতীয়বার লাগানো জায়েজ আছে। অন্য কোনো স্থানে লাগানো জায়েজ নেই।'[৫৯]

এরপর আল্লামা হাত্তাব রহ. বলেছেন যে, নাপাক হওয়ার অভিমতটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত না হলেও, প্রতিস্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় সেটি প্রভাব ফেলবে। সুতরাং কেউ প্রতিস্থাপন করতে চাইলে প্রাথমিক পর্যায়ে তাকে নিষেধ করা হবে। কিন্তু যখন কেউ তার দাঁতকে স্বস্থানে প্রতিস্থাপন করে ফেলার পর সেটি জোড়া লেগে গোশতের সঙ্গে মিলে যাবে। তখন সেই দূর্বল অভিমত অনুযায়ীও নামাজ হয়ে যাবে।

যেমনটি 'বারজালির' কিতাবে উল্লেখ আছে—

إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به، فإن رده والتحم، جازت الصلاة به للضرورة.

'যদি কারও মাড়ি উপড়ে যায় এবং তা আপন জায়গায় বেঁধে নেয়,তাহলে তা নিয়ে নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না। তবে যদি সেটিকে আপন জায়গায় জোড়া দেয় এবং জোড়া লেগেও যায়, তাহলে অবশ্যই প্রয়োজনের কারণে তার নামাজ হয়ে যাবে।'[৬০]

---

[৫৯] দুসুকি আলা শরহে খলিল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪।

[৬০] মাওয়াহিবুল জালিল, আল্লামা হাত্তাব রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২১।

ইমাম জুরকানি রহ. 'আল-মুদায়ানা' কিতাব থেকে বর্ণনা করেন যে, ওই অঙ্গ নাপাক হওয়ার অভিমতটি যদিও দুর্বল। (যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি) তবে প্রয়োজনের মুহূর্তে এই বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাই তিনি বলেন—

وعلى عدم طهارة ميتته لا ترد سن سقطت، وعلى طهارته ترد .وظاهره وإن لَم يضطرلردها على هذا، بخلافه على الأول، فيجوز للضرورة كما في شرح المدونة، وروى عن السلف عبد الملك وغيره أنهم كانوا يردونهم ويربطونها بالذهب.

'মৃত প্রানী পাক না হওয়ার অভিমতের ওপর ভিত্তি করে পড়ে যাওয়া দাঁত প্রতিস্থাপন করা যাবে না। আর পাক হওয়ার অভিমতের ওপর নির্ভর করে প্রতিস্থাপন করা যাবে। সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ অভিমতের ওপর নির্ভর করে তাকে জোড়া লাগানোর ওপর বাধ্য করা যাবে না। তবে প্রথমটি এর বিপরীত। (অর্থাৎ পুনরায় জোড়া না লাগাতে বাধ্য করা যাবে।) অতএব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা জায়েজ আছে। যেমনটি 'মুদায়ানা' কিতাবের ব্যাখ্যায় রয়েছে। আমাদের আকাবির আবদুল মালিক ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন ক্ষেত্রে তারা প্রতিস্থাপন করতেন এবং স্বর্ণের মাধ্যমে বেধে রাখতেন।'[৬১]

এ উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয় যে, মালিকি মাজহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত হলো, বিচ্ছিন্ন অঙ্গ পাক। ফলে সেটিকে আগের স্থানে প্রতিস্থাপন করা জায়েজ আছে। সেটি যদি প্রতিস্থাপন করা হয় এবং জোড়া লেগে গোশতের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে দুটি অভিমতের ভিত্তিতে ওই অবস্থায় নামাজ আদায় করা জায়েজ আছে।

## হাম্বালি মাজহাব

উল্লিখিত মাসআলার ব্যাপারে হাম্বালি মাজহাবে দুটি বর্ণনা রয়েছে। আল্লামা ইবনুল মুফলিহ রহ. বলেন—

وإن أعاد سنه بحرارتها، فعادت فطاهرة، وعنه نجسة.

'যদি কোনো ব্যক্তি নিজের দাঁত গরম অবস্থায় লাগিয়ে দেয় এবং তা

[৬১] জুরকানি আলা মুখতাসারিল খলিল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯।

জোড়া লেগে যায়, তাহলে সেটি পাক বলে গণ্য হবে। আর তার থেকেই নাপাক হওয়ার ব্যাপারে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে।'[৬২]

কিন্তু আল্লামা মারদাবি রহ. পাক হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বলেন যে, অধিকাংশ আলেমই এ মতের দিকে ধাবিত হয়েছেন। তিনি বলেন—

فإن سقطت سنه فأعادها بحرارتها، فثبتت، فهي طاهرة .هذا المذهب وعليه الجُمهور، وقطع به أكثرهم، وعنه أنها نجسة ...وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعادها في الحال .قاله في القواعد.

'যদি কারও দাঁত পড়ে যায় এবং সে গরম অবস্থায় সেটিকে জোড়া লাগায় এবং ভালোভাবে জোড়া লেগে যায়, তাহলে সেটি পাক বলে গণ্য হবে। এটিই বিশুদ্ধ মাজহাব এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের অভিমত। তাদের অধিকাংশ এই অভিমতের ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। তবে তাদের থেকে নাপাক হওয়ার একটি অভিমত রয়েছে। ...কেউ যদি কান কেটে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে নেয়, তাহলে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। 'কওয়ায়েদ'-এর মধ্যে তিনি এ কথা বলেছেন।'[৬৩]

আল্লামা বুহুতি রহ. এ অভিমতের ওপর দৃঢ়তা পোষণ করেছেন।[৬৪] এ অভিমতটি সে উদ্ধৃতির মাধ্যমে সমর্থিত যেটি আল্লামা আবু ইয়ালা রহ. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. থেকে আল্লামা আসরাম রহ.-এর সূত্রে কেসাসের মাসআলায় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন—

ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف، فيأخذ المقتص منه، فيعيد بحرارته، فيثبت، هل تكون ميتة؟ فقال :أرجو أن لا يكون به بأس، فقيل له :يعيد سنه؟ قال :أما سن نفسه فلا بأس، وهذا يدل على الطهارة، لأنه بعض من الجُملة، فلما كانت الجُملة طاهرة كان أبعاضها طاهرة.

'ইমাম আসরাম রহ. ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, কেসাস

---

[৬২] আল-ফুরু, আল্লামা ইবনুল মুফলিহ রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭০।

[৬৩] আল-ইনছাফ, আল্লামা মারদাবি রহ., খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৮৯।

[৬৪] শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৫৫।

হিসাবে যার নাক কিংবা কান কেটে ফেলার পর সে ওই অঙ্গকে আগের জায়গায় প্রতিস্থাপন করেছে এবং তা ভালোভাবে জোড়া লেগে গেছে। এমন অঙ্গ কি মৃতের হুকুমে হবে? উত্তরে তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, এমন করলে কোনো সমস্যা হবে না। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, এমন ব্যক্তি কি তার দাঁতকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে? উত্তরে বললেন, নিজের দাঁত হলে তো কোনো সমস্যা নেই। তার এ উত্তরটি প্রমাণ করে যে, দাঁত পবিত্র। কারণ, দাঁতটি হলো সারা শরীরের একটি অংশ। সুতরাং যখন সারা শরীরই পবিত্র, তখন তার অংশও পবিত্র হবে।'[৬৫]

সব প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। ইতোপূর্বে আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তা থেকে এ কথাটি প্রমাণিত হলো যে, চার মাজহাবের প্রণিধানযোগ্য অভিমত হলো, কেউ তার বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করলে সেটি পাক বলে গণ্য হবে। এমন অঙ্গ নাপাক হওয়ার হুকুম দেওয়া যাবে না এবং এর কারণে নামাজ নষ্ট হওয়ার হুকুমও দেওয়া যাবে না। আর এ কারণে প্রতিস্থাপিত অঙ্গকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া যাবে না।

যখন এ বিষয়টি প্রমাণিত হলো যে, অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা কেসাসের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং এটি নাপাকিকেও আবশ্যক করে না। তখন এর দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এমন অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা জায়েজ আছে এবং তাতে কোনো সমস্যাও নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

## চতুর্থ মাসআলা : হদে কর্তিত অঙ্গকে প্রতিস্থাপন

চতুর্থ মাসআলা হলো, শরয়ি হদে যদি কারও কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হয়, যেমন : চুরি বা ডাকাতির অপরাধে কোনো অঙ্গ কেটে ফেলা হলো, তাহলে যার ওপর হদ প্রয়োগ করা হয়েছে, হদ কার্যকর করার পর তার জন্য সেই অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করা জায়েজ হবে কি না? আর এমন বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে প্রতিস্থাপন করার দ্বারা কি শরয়ি সাজার লঙ্ঘন করা অথবা বাতিল করা বলে গণ্য হবে?

ফকিহদের বক্তব্যের মধ্যে আমি এই মাসআলাটি পাইনি। না পাওয়ার সম্ভাব্য

---

[৬৫] কিতাবুর রেওয়াতাইনি ওয়াল ওজহাইনে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২০২।

কারণ এই হতে পারে যে, হদ হিসাবে যে অঙ্গ বিচ্ছেদ করা হয়ে থাকে, তার বাস্তবায়ন কেবল অপরাধীর হাত-পায়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। কারণ, যে হদ-এর মধ্যে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়, তা কেবল চুরি ও ডাকাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর এ অপরাধ দুটিতে যে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হয়, তা হাত কিংবা পা। সম্ভবত ফকিহগণ এ অঙ্গ দুটি বিচ্ছেদ হওয়ার পর দ্বিতীয়বার জোড়া লাগানোর বিষয়টি কল্পনাও করেননি। আর এ বিষয়টি আজ অবধি তেমনই রয়েছে, যেমন ছিলো ফকিহদের যুগে। বিজ্ঞানের আধুনিক চিকিৎসার অভিজ্ঞতায় যদিও অস্ত্রোপাচার ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ময়দানে নতুন নতুন আবিস্কারের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। কিন্তু আজ অবধি তারা বিচ্ছিন্ন অঙ্গকে স্বস্থানে জোড়া লাগানোর ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। অস্ত্রোপাচারের মাধ্যমে হাত-পা জোড়া লাগাতে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় এবং কঠিন কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও প্রতিস্থাপিত অঙ্গ আগের মতো কাজ করতে সক্ষম হয় না। এমনকি কাঠ বা লোহার কৃত্রিম অঙ্গ আসল অঙ্গ অপেক্ষা বেশি উপকারে আসে। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে উল্লেখ আছে—

> 'If the delicate sheaths constining the nerves are cut, however, as must happen if a nerve is partially or completely severd, regeneration may not be possible. Even if regeneration occures, it is unlikely to be complete... Defective regeneration is the main reason why limb grafts.
>
> usually are unsafisfactory. A mechanical artificial limb is likely to be of more value to the patient.'
>
> 'শিরাকে ঘিরে রাখা পাতলা আবরণটি যদি কেটে দেওয়া হয়, যেমন : কোনো হাড়কে পরিপূর্ণ বা আংশিক কাটার সময় সেটি কাটতে হয়,তাহলে দ্বিতীয়বার এই আবরণ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। যদিও বা দ্বিতীয় আবরণ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলেও সেটি আগের মতো পরিপূর্ণ সৃষ্টি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। দ্বিতীয়বার ওই আবরণটি সৃষ্টি না হওয়াই অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সফল না হওয়ার বড়ো কারণ। স্পষ্ট কথা হলো, প্রতিস্থাপিত অঙ্গ অপেক্ষা কৃত্রিম অঙ্গ রোগীকে বেশি উপকার করে।'[৬৬]

---

[৬৬] Encyclopaedia Britannica V. ২৮ P. ৭৪৭ ed ১৯৮৮।

অন্য এক জায়গায় লেখা আছে—

'Replacement of servered hands and arms has been tried in a few patients, and some of the results appear to have been worth-while: replacement of lower limbs seem much less justifiable, because the patient is likely to be better off with an artifical leg.'

'কোনো কোনো রোগীর কর্তিত হাত-পা প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে পরীক্ষা করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে যদিও তার কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে এ বিষয়টিও লক্ষ করা গেছে যে, নিচের অঙ্গগুলো, যেমন : পা। এগুলো ভালো হওয়ার বিষয়টি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কেননা, রোগীদের বেশির ভাগই কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দবোধ করে।'[৬৭]

এ ব্যাপারে আমি নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয়েছি এবং তারা এ কথার প্রতি সমর্থন জানিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, হাত-পায়ের প্রতিস্থাপন কখনোই সফল হবে না। সুতরাং হাত-পা প্রতিস্থাপনের বিষয়টি এমন যা বাস্তবতার আলো দেখতে পারে না। এমনকি বিজ্ঞানের এ যুগেও তা সফল হয়নি। ফলে এটিকে কেন্দ্র করে শরয়ি আলোচা করা একটি কাল্পনিক আলোচনায় পরিণত হবে। যার সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু কেসাসের মাসআলাটি এর বিপরীত। কেননা, কেসাসের মাধ্যমে হাত-পায়ের অংশগুলো থেকে কিছু কিছু অংশ বিচ্ছেদ করার পর সার্জারির মাধ্যমে তার প্রতিস্থাপন সম্ভব। সুতরাং সেটিকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা কোনো ধরনের বাস্তবতা বহির্ভূত অনর্থক আলোচনা হবে না। এ কারণে আমি সে ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

আর চুরি ও ডাকাতির শাস্তিস্বরূপ কর্তিত হাত-পায়ের মাসআলাটির সঙ্গে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই। (কারণ, সেগুলো প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়নি) সুতরাং বাস্তবে এমন বিষয় সংঘটিত হওয়ার আগে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা না করাই উত্তম। কেননা, আমাদের পূর্ববর্তী ফকিহ ও আকাবিরগণ কোনো সমস্যা সংঘটিত হওয়ার আগে তা নিয়ে বেশি চিন্তাভাবনা বা ঘাটাঘাটি অপছন্দ করতেন এবং

[৬৭] Micropaedia, Britannica, V. ১১ P. ৮৯৯, ed ১৯৮৮।

তারা বলেন— لا تجعلوا بالبلاء قبل نزوله বিপদ আসার আগেই তা (সমাধানের ব্যাপার) নিয়ে তাড়াহুড়ো করো না।'

তাই উল্লিখিত মাসআলার ব্যাপারে বাস্তবতা দেখা ছাড়া চূড়ান্ত পর্যায়ের কোনো কথা বলছি না; কিন্তু যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এমন ঘটনা ঘটেছে, তাহলে সে ক্ষেত্রে যেটি মূলনীতি হতে পারে তা উল্লেখ করছি। যেন এমন কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে, মাসআলা জানতে সে নীতিটির সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে। আর সে মূলনীতিটি হলো, উল্লিখিত মাসআলার দুটি সমাধান হতে পারে। যেমন :

## প্রথম সমাধান

আমরা হদকে কেসাসের সঙ্গে তুলনা করে এ কথা বলবো যে, কেসাস সম্পর্কে ইতোপূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এ কথাটি প্রমাণিত হয়েছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের পছন্দনীয় অভিমত অনুযায়ী একবার অঙ্গ বিচ্ছেদ করার মাধ্যমে কেসাসের হুকুম আদায় হয়ে যায়। কেসাসের হুকুমে এ কথা নেই যে, উল্লিখিত অঙ্গটি চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন থাকবে। সুতরাং হদের বিষয়টিও অনুরূপ হবে। একবার হাত বা পা বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে হদ কার্যকর করলে তা পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়ে যাবে। স্থায়ীভাবে হাত বা তার উপকারীতাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হদের উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এ কারণে চোর বা ডাকাতের জন্য কৃত্রিম হাত-পা ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। ফলে তার কর্তিত হাত-পাকেও প্রতিস্থাপনে কোনো বাধা নেই।

## দ্বিতীয় সমাধান

হদ ও কেসাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সেটি হলো, কেসাসের উদ্দেশ্য হলো অপরাধী আক্রান্ত ব্যক্তির অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আর সেটি শুধু তার অঙ্গ বিচ্ছেদ করার মাধ্যমেই আদায় হয়ে যায়। কারণ, অপরাধী থেকে সংঘটিত অপরাধ আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ বিচ্ছেদ থেকে অতিক্রম করেনি। আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য যখন তার অঙ্গকে প্রতিস্থাপনে কোনো বাধা নেই, তখন অপরাধীর ক্ষেত্রেও কোনো বাধা থাকবে না। সুতরাং শুধু অঙ্গ-বিচ্ছেদের মাধ্যমেই কেসাস আদায় হয়ে যায়। কিন্তু হদের শাস্তিস্বরূপ অঙ্গ বিচ্ছেদ করার বিষয়টি এর বিপরীত। কারণ অনুরূপ ক্ষতি সাধনের কারণে

হদের বিধান আরোপিত হয় না। বরং তা শুরু থেকেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নির্ধারিত শাস্তি। আর মহান আল্লাহ যখন হাত-পা কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সেখানে শুধু কেটে ফেলাই উদ্দেশ্য নয়। বরং কেটে ফেলার উদ্দেশ্য হলো অপরাধী থেকে তার উপকারীতা শেষ করা। সুতরাং আমরা যদি অপরাধীকে দ্বিতীয়বার প্রতিস্থাপনের অনুমতি দিই, তাহলে সেটি হবে হদের উদ্দেশ্য নষ্ট করা।

সুতরাং এ মাসআলা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার বিষয়টি এ কথার ওপর নির্ভর করবে যে, হদের উদ্দেশ্য কি শুধু অপরাধীকে কষ্ট দেওয়া, না তার অঙ্গকে একেবারে বিচ্ছেদ করে দেওয়া? প্রথম কথার ওপর ভিত্তি করে প্রতিস্থাপন জায়েজ আছে। আর দ্বিতীয়টির ওপর ভিত্তি করে জায়েজ নেই। উভয় সম্ভাবনার পক্ষে বহু দলিল রয়েছে। আর এখনই এর কোনো একটির ব্যাপারে নিশ্চিত হুকুম দেওয়া আমাদের ওপর আবশ্যক নয়। কেননা, আজ পর্যন্ত এ মাসআলাটি বাস্তবে সামনে আসেনি। আর যখন সেটি বাস্তবে আসবে, আল্লাহ তখনকার ফকিহদের অন্তরকে সে অভিমতের প্রতি অন্তর খুলে দেবেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে। ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

# বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা।' এটি আরবি ভাষায় রচিত «احكام التورق وتطبيقاته المصرفية» মাকালার তরজমা। যা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামির 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামি, মক্কা মুকাররমা' কতৃক আয়োজিত সপ্তম সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়েছিলো। বুহুস ফি কজায়া ফিকহিয়্যা মুআসারা'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

—আবদুল্লাহ মায়মান

# বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা

«احكام التورق وتطبيقاته المصرفية» ('বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা।') শিরোনামের এটি একটি মাকালা। যেখানে 'তাওয়াররুকের' বিধান এবং তার সেসব আমলি পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করেছি, বর্তমান সময়ে যে পদ্ধতিগুলো ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে চালু আছে অথবা সেগুলো চালু করার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ আমাকে সহিহ পথে থাকার তাওফিক দান করুন এবং পদস্খলন ও ভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

## 'তাওয়াররুকের' শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ।

তাওয়াররুক' শব্দটি 'وَ-رِ-ق' (وَ-তে জবর, ر-তে জের হবে।) মূলধাতু থেকে গৃহীত। যার অর্থ 'ঢালাই করা দিরহাম'। অনুরূপভাবে 'الرِّقَةُ' শব্দ থেকেও গৃহীত। আল্লামা আবু ওবাইদা রহ. বলেন, 'وَرِق' শব্দের অর্থ হলো রুপা। চাই সেটি দিরহামের মতো ঢালাইকৃত হোক বা না হোক।[৬৮]

[৬৮] লিসানুল আরব, আল্লামা ইবনু মুনজির রহ.-এর রচিত। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭৫। (১৪০৫ হিজরি সালে ইরান থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

অভিধানে 'তাওয়াররুক' (تَوَرُّق) শব্দ পাওয়া যায় না। অভিধান বিশারদগণ 'وَرِق' মূলধাতু থেকে যেসব নির্গত ক্রিয়াপদের আলোচনা করেছেন, সেগুলো শুধু 'ইফআল' ও 'ইস্তিফআলে' সীমাবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং কারও কাছে অধিক সম্পদ হলে তার সম্পর্কে আরবিতে বলা হয় ' أَورَقَ الرَّجُل ' (লোকটি অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে।) আর রুপা অনুসন্ধানকারীর ক্ষেত্রে আরবিতে 'مُسْتَوْرِق ' শব্দ ব্যবহার করা হয়। সম্ভবত ফকিহগণ সে ব্যক্তির জন্য 'তাওয়াররুক'-এর পরিভাষাটি তৈরি করেছেন, যে রুপা অর্জনে খুব বেশি কষ্ট শিকার করে।

ফকিহদের পরিভাষায় 'তাওয়াররুক' বলা হয়, কোনো ব্যক্তি বাকিতে পণ্য ক্রয় করলো। এরপর বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারও কাছে সে পণ্যটিকেই আগের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করে দিলো। এভাবে তার নগদ অর্থ অর্জিত হলো।[৬৯]

এ পরিভাষাটি তাওয়াররুক নামে কেবল হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের কিতাবে পাওয়া যায়। সুতরাং ইমাম শামসুদ্দিন ইবনুল মুফলিহ রহ. বলেন—

> ولواحتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين، فلا بأس ، نص عليه ، و هي التورق.
>
> 'কারও নগদ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায়, একশো টাকার পণ্য দুশো টাকায় (বাকিতে) কিনে নিলো, তাহলে এমনটি করায় কোনো সমস্যা নেই।'[৭০]

আল্লামা ইবনুল কইয়িম রহ. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ.-এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন—

> التورق آخية الربا.
>
> 'তাওয়াররুক' হলো সুদের গিট।'[৭১]

উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. থেকে যদি এ বক্তব্যটি বর্ণিত শব্দেই প্রমাণিত

---

[৬৯] আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়া কুয়েতিয়া। খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১৪৭।

[৭০] আল-ফুরু, ইবনু মুফলিহ রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭১।

[৭১] তাহজিবুস সুনান, আবু দাউদ। খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৮। آخية বলা হয় রশির এমন হাতলকে, যা একেবারে শেষ প্রান্তে হয় এবং যার মাধ্যমে পশুকে বাঁধা হয়। এ কথার উদ্দেশ্য হলো, 'তাওয়াররুক' সুদের দিকে নিয়ে যায়।

হয়, (অবশ্য নির্ভরযোগ্য হাদিসের কিতাবে আমি এটি পাইনি) তাহলে সেটি এ কথার দলিল যে, প্রথম শতাব্দি থেকেই 'তাওয়াররুক' শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, অভিধান বিশারদগণ এমনকি যারা ফকিহদের ব্যবহৃত পরিভাষা কেন্দ্রিক কিতাব রচনা করেছেন, যেমন : আল্লামা ফাইয়ুমি, মুতররিজি প্রমুখও এ শব্দটি উল্লেখ করেননি। আল্লামা ফাইয়ুমি রহ. অবশ্য 'তাওয়াররুকের' বর্ণিত পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে তার নাম দিয়েছেন 'ইনাহ'।[৭২] হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণ ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহগণ সেটিকে 'ইনাহ'-এর পদ্ধতিসমূহের একটি পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যার বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণের পরিভাষা অনুযায়ী 'তাওয়াররুক' ও 'ইনাহর' মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'ইনাহ' বলা হয় কোনো ব্যক্তি কারও কাছে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করলো। এরপর বিক্রেতা নিজেই পণ্যকে ক্রেতা থেকে আগের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নগদে ক্রয় করে নিলো। আর 'তাওয়াররুকের' মধ্যে বিক্রেতা বিক্রীত পণ্যের ক্রেতা হয় না। বরং ক্রেতা নগদ মূল্যে এমন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে সেটি বিক্রয় করে দেয়, যার সঙ্গে প্রথম বিক্রেতার (সেই লেনদেনের ব্যাপারে) কোনো সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং 'ইনাহ' চুক্তির মধ্যে পণ্যটি পুনরায় প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যায়। আর 'তাওয়াররুকের' মধ্যে বিক্রেতার কাছে ফিরে যায় না। বরং ক্রেতা সেটিকে নিজের মালিকানায় নেওয়ার পর নগদে বাজারে বিক্রয় করে দেয়। যেন তার মাধ্যমে নগদ অর্থ অর্জিত হয়। তবে যারা সেটিকে 'ইনাহ' চুক্তির আওতাভুক্ত করেছেন। তারা এটি লক্ষ করেছেন যে, এ পদ্ধতিটি নিচের বাজার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিষয়গুলোতে 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তির সঙ্গে মিল রাখে।

ক. তাওয়াররুক ও ইনাহ উভয় ক্ষেত্রে প্রথম বিক্রেতা তার পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করে।

খ. তাওয়াররুক ও ইনাহ উভয় ক্ষেত্রে প্রথম ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে, নগদ অর্থ অর্জন করা।

গ. প্রকৃত অর্থে সুদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হিলা ও বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে এ পদ্ধতি দুটি অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

---

[৭২] আল-মিসবাহুল মুনির, আল্লামা ফাইয়ুমি রহ.। খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩১।

## ১. হাম্বালি মাজহাব

হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের কিতাবগুলো দেখার পর 'তাওয়াররুকের' বিষয়ে তাদের অভিমত পরিস্কার হয়ে যায়। যদিও ইমাম আহমাদ রহ. থেকে এ ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমত বর্ণিত আছে। এক মত অনুযায়ী সেটি মাকরুহ কিন্তু হাম্বালি মাজহাবের ফকিহদের নিকট অগ্রগণ্য অভিমত হলো তাওয়াররুকের চুক্তিটি জায়েজ। ইবনুল মুফলিহ রহ. দুটি অভিমত উল্লেখ করার পর বলেন—

ولواحتاج إلى نقد فاشترى مايساوي مائة بمائتين فلا بأس، نص عليه ، وهي التورق، وعنه : يكره، و حرمه شيخنا.

'কারও যদি নগদ অর্থের প্রয়োজন পড়ে। আর সে একশো টাকা মূল্যের পণ্য দুইশো টাকায় বাকিতে ক্রয় করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। এ কথার ওপর ইমাম আহমদ রহ. স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। আর এটির নামই তাওয়াররুক। তবে ইমাম আহমাদ রহ.-এর একটি অভিমত এটাও আছে যে, এ ধরনের লেনদেন মাকরুহ। আর আমাদের শায়খ সেটিকে হারাম বলেছেন।'[৭৩]

অনুরূপভাবে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন—

ولو كان مقصود المشتري الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها. فهذا يسمى »: التورق.« ففي كراهته عن أحْمد روايتان.

'ক্রেতার উদ্দেশ্য অর্থ অর্জন, ফলে সে বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করে সেটিকে নগদ অর্থে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জন করে নেয়, তাহলে এমন লেনদেনকে তাওয়াররুক বলা হয়, আর সেটি মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে ইমাম আহমাদ রহ. থেকে দু-ধরনের বর্ণনা রয়েছে।'[৭৪]

কিন্তু আল্লামা মারদাবি রহ. বলেন—

لو احتاج الي نقد، فاشتري ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس،

[৭৩] আল-ফুরু, ইবনুল মুফলিহ রহ. খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৭১।

[৭৪] ফাতাওয়া শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ৩০।

نص عليه، وهوالمذهب، وعليه الاصحاب، وهي مسألة التورق.

'কারও নগদ অর্থের প্রয়োজন হলো। ফলে সে একশো টাকা মূল্যের পণ্যকে দেড়শো টাকায় ক্রয় করলো। এমন লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। এ হুকুমটি স্পষ্ট বলা হয়েছে। এটিই মাজহাব এবং এর ওপরই সবার মতামত আর এটিকেই তাওয়াররুকের মাসআলা বলা হয়।'[৭৫]

মারদাবি রহ. বললেন যে, মাজহাব হলো জায়েজ আর এর ওপরই হাম্বালিদের অধিকাংশ আলেম একমত। এ জন্যই আল্লামা বুহুতি রহ. বলেন, কারও নগদ অর্থের প্রয়োজন হলো, ফলে সে এক হাজার টাকা মূল্যের জিনিস তার চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয় করলো যেন এর মাধ্যমে নগদ অর্থ অর্জন হয়, তাহলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।'

'কাশশাফুল কেনা' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

ولو احتاج إنسان إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين، فلا بأس بذلك .نص عليه .وهي أي هذه المسألة تسمى مسألة التورق.

'কোনো ব্যক্তির নগদ অর্থের প্রয়োজন হলো, ফলে সে একশো টাকা মূল্যের পণ্যকে দেড়শো টাকায় কিনে নিলো, তাহলে এমন লেনদেনে কোনো সমস্যা নেই। এ কথাটি স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। আর এটিকে তাওয়াররুকের মাসআলা বলা হয়।'[৭৬]

আল্লামা বুহুতি রহ. এ ব্যাপারে কোনো ধরনের মতানৈক্য বর্ণনা করেননি। কারণ, তাদের মাজহাবে নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, এমন লেনদেন জায়েজ।

আল্লামা ইবনু কুদামা রহ.-এর বক্তব্য থেকে এটিই প্রকাশ পায়। যদিও তাওয়াররুকের মাসআলাটিকে তিনি সরাসরি উল্লেখ করেননি। তবে 'ইনাহ'-এর ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, 'ইনাহ' চুক্তির যে পদ্ধতিটি না জায়েজ সেটি এই যে, যে বিক্রেতা তার পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করেছে, সে নিজেই দ্বিতীয়বার কমমূল্যে সেই

---

[৭৫] আল-ইনসাফ, আল্লামা মারদাবি রহ., খণ্ড : ৪,পৃষ্ঠা : ৩৩৭। বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

[৭৬] কাশশাফুল কেনা, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৭৫। (মক্কা থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

পণ্য ক্রয় করে নেবে। এরপর তিনি বলেন—

وفي كل موضع قلنا لا يجوز له ان يشتري .لا يجوز ذلك لوكيله لانه قائم مقامه ويجوزلغيره من الناس سواء كان اباه أو ابنه أو غيرهما لانه غير البائع ويشتري بنسيئة فأشبه الأجنبي.

'আর সেসব জায়গা, যেখানে বিক্রেতার জন্য (পুনরায়) ক্রয়কে নাজায়েজ বলেছি সেসব ক্ষেত্রে বিক্রেতার ওকিলের জন্যও ক্রয় করা জায়েজ নেই। কারণ, ওকিল তার মুয়াক্কেলের স্থলাভিষিক্ত হয়। অবশ্য বিক্রেতা ছাড়া অন্যের জন্য সেটি ক্রয় করা জায়েজ আছে। চাই সে বিক্রেতার পিতা, সন্তান বা অন্য কেউ হোক না কেন। কারণ, এরা বিক্রেতা নয়, এরা কেবল নিজের জন্যই ক্রয় করেছে। সুতরাং এরা অপরিচিত ব্যক্তির মতো।'[৭৭]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি এ কথা প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় ক্রেতা যদি প্রথম বিক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ হয়, তাহলে এমন বিক্রয় জায়েজ আছে। আর তাওয়াররুকের মধ্যে এ পদ্ধতিটিই হয়ে থাকে।

এটি স্পষ্ট যে, হাম্বালিদের অগ্রগন্য অভিমত হলো তাওয়াররুক জায়েজ আছে। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. ও তার শাগরিদ আল্লামা ইবনুল কইয়িম রহ. নাজায়েজ বলেন। আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রহ. ক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করার পর বলেন—

والثالث : أن لا يكون مقصوده لا هذا ولا هذا، (يعني ليس مقصود المشتري الانتفاع بالسلعة ولا الاتجار فيها) بل مقصوده دراهم لحاجته اليها، وقد تعذر عليه أن يستسلف قرضا، أو سلما، فيشتري سلعة ليبيعها ويأخذ ثمنها، فهذا هو التو رق، وهو مكروه في اظهر قولي العلماء، وهذا إحدي الروايتين عن أحْمد.

তৃতীয় পদ্ধতি এই যে, পণ্যের মাধ্যমে উপকৃত হওয়া বা ব্যবসা করা কোনোটিই ক্রেতার উদ্দেশ্য হবে না। বরং তার উদ্দেশ্য হবে, নগদ অর্থ অর্জন করা, যেটি তার প্রয়োজন। আর এ জন্য কোনো ধরনের ঋণ নেওয়া বা অগ্রিম মূল্যে কিছু বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি বিধায় সে পণ্য

[৭৭] আল-মুগনি, আল্লামা ইবনু কুদামা রহ., খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৬। বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

বাকিতে বেশি মূল্যে ক্রয় করে সেটিকে বাজারে কমমূল্যে বিক্রয় করে নগদ অর্থ অর্জন করেছে। এ পদ্ধতিটিই হলো তাওয়াররুক। আলেমদের দুটি অভিমতের মধ্যে স্পষ্ট অভিমত হলো এমন বিক্রয় মাকরুহ। আর ইমাম আহমাদ রহ.-এর দুটি অভিমতের একটি এটি।'[৭৮]

আল্লামা ইবনুল কইয়িম রহ. বলেন—

فإن قيل : فما تقولون إذا لَم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينه ؟ قيل : هذه مسألة التورق , لأن المقصود منها الورق , وقد نص أحْمد في رواية أبي داود على أنها من العينة , وأطلق عليها اسمها . وقد اختلف السلف في كراهيتها , فكان عمر بن عبد العزيز يكرهها , وكان يقول « التورق أخية الربا . » ورخص فيها إياس بن معاوية . وعن أحْمد فيها روايتان منصوصتان , وعلل الكراهة في إحداهُما بأنه بيع مضطر وقد روى أبو داود عن علي « أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر . » فأحْمد رحْمه الله تعالى أشار إلى أن العينة إنَّما تقع من رجل مضطر إلى نقد , لأن الموسر يضن عليه بالقرض , فيضطر إلى أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها , فإن اشتراها منه بائعها كانت عينة , وإن باعها من غيره فهي التورق . ومقصوده في الموضعين : الثمن فقد حصل في ذمته ثمن مؤجل مقابل الثمن حال أنقص منه , ولا معنى للربا إلا هذا لكنه ربا بسلم , لَم يحصل له مقصوده إلا بمشقة , ولو لَم يقصده كان ربا بسهولة.

'যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, আপনারা বিক্রয়ের সে পদ্ধতির ব্যাপারে কী বলবেন, যেখানে বিক্রেতার কাছে পণ্য ফেরত যায় না? বরং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে যায়। আপনারা কি বিক্রয়ের এই পদ্ধতিকেও 'ইনাহ' নাম দেবেন? উত্তরে বলা হলো, এটি তাওয়াররুকের পদ্ধতি। সেটি এ কারণে যে, এখানে ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে নগদ অর্থ অর্জন করা। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে ইমাম আহমাদ রহ. স্পষ্ট বলেন, এটিও 'ইনাহ' চুক্তির একটি প্রকার। একে তিনি 'ইনাহ' নামেই আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য পূর্ববর্তী ফকিহগণ সেটি মাকরুহ হওয়ার বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন। সুতরাং উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহ. সেটিকে

[৭৮] ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৯, পৃষ্ঠা : ৪৪২।

মাকরুহ হিসাবে সাব্যস্ত করতেন। তিনি বলেন, 'তাওয়াররুক হলো সুদের গিট'। ইয়াস ইবনু মুআবিয়া রহ. এমন লেনদেন করার অনুমতি দিয়েছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. থেকে এ ব্যাপারে দু-ধরনের অভিমত বর্ণিত আছে। যে পদ্ধতিকে তিনি মাকরুহ বলেছেন, সেটির কারণ বর্ণনা করেছেন যে, এটি হলো নিরূপায় অবস্থায় পতিত অপারগ ব্যক্তির বিক্রয়। ইমাম আহমাদ রহ. এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কেবল সে ব্যক্তি 'ইনাহ' চুক্তি করে থাকে, যে নগদ অর্থ অর্জনে অপারগ ও নিরূপায় হয়। কেননা, স্বচ্ছল ব্যক্তিরা তাকে ঋণ দেওয়া থেকে কার্পণ্যতা করে। তাই দরিদ্র ব্যক্তি এ কাজ করতে বাধ্য হয় যে, সেই ধনী ব্যক্তি থেকে পণ্য ক্রয় করে সেটিকে আবারও বিক্রয় করে দেয়, তারপর দ্বিতীয় ক্রেতা যদি সেই আগের বিক্রেতা হয়, তাহলে এটি 'ইনাহ' চুক্তি হবে। আর ক্রেতা যদি প্রথম বিক্রেতা ছাড়া তৃতীয় কোনো ব্যক্তি হয়, তাহলে সেটি তাওয়াররুক হবে। এ উভয় অবস্থাতেই (প্রথম) ক্রেতার উদ্দেশ্য থাকে নগদ অর্থ অর্জন করা। এ পদ্ধতিতে লেনদেন করার কারণে ওই প্রথম ক্রেতার জন্য নগদে কম অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বেশি মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হয়। আর এটিকেই সুদ বলা হয়। অবশ্য এখানে সুদ আবশ্যক হয়েছে বাকি বিক্রয়ের মাধ্যমে। যেখানে সহজে তার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। যদি মাঝে এই বাকি বিক্রয় না হতো, তাহলে নিশ্চিত সুদ হয়ে যেতো।'[৭৯]

## ২. শাফিয়ি মাজহাবের সিদ্ধান্ত

সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকিহ যেটিকে 'ইনাহ' চুক্তি বলেছেন, ইমাম শাফিয়ি রহ. সেটি জায়েজ হওয়ার পক্ষে স্পষ্ট বক্তব্য দিয়েছেন। 'ইনাহ' বিক্রয় পদ্ধতি এই যে, প্রথম বিক্রেতাই পণ্যকে ক্রেতা থেকে কম মূল্যে ক্রয় করে নেওয়া। তিনি 'উম্ম' নামক নিজ গ্রন্থে খুব জোরালোভাবে স্পষ্টভাষায় 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তি জায়েজের কথা বলার পর বলেন—

وإذا كانت هذه السلعة لى كسائر مالى، لَم لا أبيع ملكى بما شئت وشاء المشترى؟

[৭৯] তাহজিবুস সুনান, আল্লামা ইবনুল কইয়িম রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০৮-১০৯। (পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সংস্করণ।)

'অন্যান্য সম্পদের মতো সেটি যখন আমার মালিকানায় এসে গেছে, তখন আমার মালিকানাধীন সম্পদ আমি যেভাবে ইচ্ছে বিক্রয় করবো যখন ক্রেতাও তা ক্রয় করতে চাচ্ছে।'[৮০]

'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তি জায়েজ হওয়ার পক্ষে ইমাম শাফিয়ি রহ. দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং সেখানে মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো কথা বলেননি।[৮১] আর শাফিয়ি মাজহাবের পূর্ববর্তী ফকিহগণও তার অনুসরণ করে কোনো ধরনের মাকরুহ হওয়া ছাড়াই 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তিকে জায়েজ বলেছেন। সুতরাং আল্লামা বাগাবি রহ. বলেন—

اذا باع شيئا الي أجل و سلم، ثم اشتراه قبل حلول الأجل يجوز، سواء اشتراه بمثل ما باع أو بأقل أو بأكثر، كما يجوز بعد حلول الأجل.

'কেউ যদি নির্দিষ্ট মেয়াদে কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রয় করে। এরপর সেটি ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে দেয়, এরপর সময় আসার আগেই প্রথম বিক্রেতা পণ্যটিকে দ্বিতীয়বার ক্রয় করে নেয়, তাহলে এমন পদ্ধতি জায়েজ আছে। চাই বিক্রেতা সেটিকে আগের মূল্যে ক্রয় করুক অথবা তার চেয়ে কমে, কিংবা বেশিতে—সময় শেষ হওয়ার পর যেমন ক্রয় করা জায়েজ আছে।'[৮২]

যেসব আলেম 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তিকে নাজায়েজ বলেছেন, তাদের সঙ্গে ইমাম মাওয়ারদি রহ. কঠিনভাবে তর্ক করেছেন। সেইসঙ্গে তারা আয়শা ও জায়েদ ইবনু আকরাম রা.-এর যে হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেন, সেটিরও উত্তর দিয়েছেন। আলোচনার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন—

وأما الجواب عن قولهم : إنه ذريعة إلى الربا الحرام ، فغلط بل هو سبب يَمنع من الربا الحرام ، وما منع من الحرام كان ندبا.

'যারা বলেন যে, 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তি সুদের একটি মাধ্যম, তাদের দাবির উত্তর এই যে, এই কথাটি ভুল। বরং এটি সুদ থেকে বাঁচার একটি

---

[৮০] মুখতাসারুল মুজানি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৮৫।

[৮১] কিতাবুল উম, পরিচ্ছেদ : বাকি বিক্রয়, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৮। (লাহোর থেকে প্রকাশিত সংস্করণ) খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৪৯ দারুল কুতাইবাহ থেকে প্রকাশিত।

[৮২] তাহজিব, আল্লামা বাগাবি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮৯।

মাধ্যম। আর যেটি সুদ থেকে বাঁচার মাধ্যম হবে, সেটি মুস্তাহাব হবে।'[৮৩]

আল্লামা মাওয়ারদি রহ. নিজের দাবির স্বপক্ষে দলিল দিতে খায়বারের খেজুরের বিষয়ে বর্ণিত হাদিসটি পেশ করেন।

অনুরূপভাবে ইমাম নববি রহ. শর্তহীনভাবে এমন বিক্রয়কে জায়েজ বলেছেন। তিনি বলেন—

ليس من المناهي بيع العينة وهو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداوسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد، أم لا .هذا هو الصحيح المعروف في كتب الاصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحق الاسفراييني، والشيخ أبو محمد :بأنه إذا صار عادة له، صار البيع الثاني كالمشروط في الاول، فيبطلان جميعا.

'ইনাহ চুক্তি নিষিদ্ধ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইনাহ চুক্তির পদ্ধতি এই যে, কেউ কোনো পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করবে এবং সেটি ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করে দেবে। এরপর মূল্য উসুলের আগেই সে পণ্যটিকে আগের চেয়ে কম মূল্যে নগদে ক্রয় করে নেবে। চাই সে শহরে ইনাহ বিক্রয় চুক্তি করার ব্যাপক প্রথা জারি থাকুক বা না থাকুক। এ কথাটিই বেশি সহিহ এবং মাজহাবের ইমামদের কিতাবে প্রসিদ্ধ। অবশ্য উসতাজ আবু ইসহাক ইসফিরাইনি ও শায়খ আবু মুহাম্মাদ রহ. এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, শহরে যখন ইনাহ চুক্তির ব্যাপক প্রথা জারি হবে, তখন দ্বিতীয় বিক্রয়টি প্রথম বিক্রয়ের মধ্যে শর্তের মতো হয়ে যাবে। যে কারণে দুটি বিক্রয়-চুক্তিই বাতিল হবে।'[৮৪]

তবে শাফিয়ি মাজহাবের পরবর্তী আলেমদের অনেকে বলেছেন যে, উল্লিখিত চুক্তিটি মাকরুহের সঙ্গে জায়েজ। কাজি জাকারিয়া আনসারি রহ. বলেন—

ويكره بيع العينة لما فيها من الاستظهار على ذي الحاجة ( وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها ) له ( ثم يشتريها ) منه

---

[৮৩] হাবিল কাবির, আল্লামা মাওয়ারদি রহ., খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৭-২৯০। (মক্কা থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

[৮৪] রওজাতুত তালেবিন, আল্লামা নববি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪১৭।

(بنقد يسير ( فيصح ) ذلك ( ولو صارعادة له ) غالبة.

'ইনাহ চুক্তি মাকরুহ। কারণ সেখানে মুখাপেক্ষি ব্যক্তির ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। ইনাহ চুক্তি এই যে, কেউ তার পণ্যকে বেশি মূল্যে বাকিতে বিক্রয় করে দিলো এবং পণ্যটি ক্রেতার কাছে হস্তান্তরও করলো। এরপর সে পণ্যটিকে ক্রেতার কাছ থেকে আগের চেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করে নিলো। এ পদ্ধতিটি জায়েজ আছে। যদিও শহরে এ পদ্ধতির লেনদেনের প্রচলন থাকে।'[৮৫]

অনুরূপভাবে আল্লামা খতিব শিরবিনি ও রমালি রহ. তাদের 'আল-মিনহাজ' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তিটি মাকরুহ বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।[৮৬]

তাওয়াররুকের বিষয়টিকে তারা ভিন্নভাবে আলোচনা করেননি। স্বতন্ত্রভাবেও না আবার 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তির একটি পদ্ধতি হিসাবেও বর্ণনা করেননি। তবে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তারা যখন এ পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন যে, প্রথম বিক্রেতাই সে পণ্যটিকে কম মূল্যে নগদে ক্রয় করতে পারবে। তখন তৃতীয় কোনো ব্যক্তি ক্রয় করলে সেটি আরও উত্তমরূপেই জায়েজ হবে।[৮৭] বরং ইমাম শাফিয়ি রহ. তাওয়াররুকের পদ্ধতিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, যারা 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তি না জায়েজ বলেন, তাদের ও আমাদের সবার কাছেই তাওয়াররুকের পদ্ধতিটি জায়েজ আছে। সুতরাং ইমাম শাফিয়ি রহ. তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন—

قيل :أفحرام عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل؟ فإن قال :لا، إذا باعه من غيره، قيل، فمن حرمه منه؟

'তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এ পদ্ধতিটি কি হারাম? যে, কোনো ব্যক্তি তার পণ্যকে নগদে বিক্রয় করতে চাইলে করবে—যদিও সে উল্লিখিত পণ্যকে বাকিতে ক্রয় করেছে? উত্তরে তারা যদি বলে—'না হারাম নয়—শর্ত হলো প্রথম বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারও কাছে বিক্রয় করতে হবে—তাহলে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, এ পদ্ধতিকে

[৮৫] আসনাল মাতালেব, আল্লামা আনসারি রহ., খ; ৪, পৃষ্ঠা : ১০৪।

[৮৬] মুগনিল মোহতাজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯। (বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

[৮৭] নিহায়াতুল মোহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৬০। (বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

(যেখানে প্রথম বিক্রেতার কাছেই দ্বিতীয়বার বিক্রয় করা হয়) কে হারাম করলো?'[৮৮]

এ কারণে আল্লামা ফাইয়ুমি রহ. 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তির ব্যাখ্যায় বলেন—

وذلك حرام إذا اشترط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم فإن لَم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعي لوقوع العقد سالما من المفسدات ومنعها بعض المتقدمين وكان يقول هي أخت للربا فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس فهي (عينة) أيضا لكنها جائزة باتفاق.

'এ পদ্ধতি হারাম হবে, যখন ক্রেতা বিক্রেতার ওপর এ শর্ত আরোপ করবে যে, নির্দিষ্ট মূল্যে সে নিজেই উল্লিখিত পণ্যটি ক্রয় করে নেবে। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যদি এ ধরনের কোনো শর্ত না থাকে, তাহলে এমন লেনদেনকে ইমাম শাফিয়ি রহ. জায়েজ বলেছেন। কারণ এ পদ্ধতিতে বিক্রয় চুক্তিটি নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিছু পূর্ববর্তী আলেমগণ এমন লেনদেনকেও নিষিদ্ধ বলেছেন। তারা বলেন, 'এটি সুদের একটি প্রকার।' অথচ পণ্য ক্রয়ের মজলিসেই সেটিকে যদি তৃতীয় কারও কাছে বিক্রয় করে দেয়, তাহলে এ পদ্ধতিও 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তির একটি পদ্ধতি হবে। তবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদ্ধতিটি জায়েজ।'[৮৯]

৩. মালিকি মাজহাব

মালিকি মাজহাব তালাশ করলে দেখা যায় যে, শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের আলেমগণ যে বিক্রয় পদ্ধতিকে 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তি নাম দিয়েছেন। মালিকি মাজহাবের আলেমগণ সেটিকে এমন বাকি বিক্রয়ের আওতাভুক্ত করেছেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেগুলো জায়েজ। কিন্তু সেগুলো না জায়েজ বিক্রয়ের দিকে ধাবিত করে।[৯০]

---

[৮৮] কিতাবুল উম, ইমাম শাফিয়ি রহ., খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২৫।

[৮৯] আল-মিসবাহুল মুনির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৪১।

[৯০] সুতরাং মালিকি মাজহাবে 'ইনাহ' একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা। যেটি 'بالشراء للامر المرابة' লেনদেনের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। যার ওপর নির্ভর করে বর্তমান সময়ের ইসলামি ব্যাংকসমূহের লেনদেন চলছে।

এমন বিক্রয় না জায়েজের ক্ষেত্রে অন্যান্য মাজহাব অপেক্ষা মালিকি মাজহাব বেশি কঠিন অবস্থানে। মালিকি মাজহাবের আলেমগণ পণ্য বিদ্যমান থাকাকালে এমন বিক্রয় চুক্তি বাতিল করাকে ওয়াজিব বলেছেন।[৯১] কিন্তু তাওয়াররুকের পদ্ধতিকে সেসব নিষিদ্ধ পদ্ধতির আওতাভুক্ত করেননি। আর মালিকি মাজহাবের ফকিহদের বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, তাদের কাছে তাওয়াররুকের পদ্ধতি জায়েজ আছে। আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. বলেন—

وسئل مالك عن رجل ممن يبيع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل فإذا قبضها منه ابتاعها منه ورجل حاضر كان قاعدا معهما فباعها منه ثم إن الذي باعها للأول اشتراها منه بعد ذلك في موضع واحد قال لا خير في هذا وأراه كأنه محلل بينهما.

'ইমাম মালিক রহ.-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে এভাবে 'ইনাহ' পদ্ধতিতে বিক্রয় করে। কারও কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তে বাকিতে পণ্য বিক্রয় করে। ক্রেতা যখন পণ্য হস্তগত করে নেয়, তখন তাদের সঙ্গে মজলিসে বসে থাকা তৃতীয় এক ব্যক্তি পণ্যটি ক্রয় করে নেয়। যার কাছে প্রথম ক্রেতা পণ্যটি বিক্রয় করে দিলো। এরপর প্রথমে যে ব্যক্তি বিক্রয় করেছিলো, তৃতীয় ব্যক্তি থেকে সে নিজেই পণ্যটিই দ্বিতীয়বার ক্রয় করে নেবে। আর এসব কার্যক্রম একই মজলিসে নিষ্পত্তি করা হবে। উত্তরে ইমাম মালিক রহ. বলেন, এমন লেনদেনে ভালো কিছু নেই। তার ধারণা হলো, এই তৃতীয় ব্যক্তি তাদের দু-জনের মধ্যে হিলাকারীর ভূমিকা পালন করেছে।'[৯২]

এ উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম মালিক রহ. এ পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন। কেননা, তৃতীয় ব্যক্তি প্রথম বিক্রেতার জন্য হালালকারীর ভূমিকা

---

[৯১] আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. বলেন, কেউ যদি তার পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করে, এরপর সে আগের চেয়ে কম নগদ মূল্যে ক্রয় করে নেয়, তাহলে ইবনু মাজেশুন রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী উভয় বিক্রয়-চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। চিন্তাভাবনা করার পর এটিকেই সহিহ মনে হয়। (মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, ইবনু রুশদ রহ., খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : (দারুল গরবিল ইসলামি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

[৯২] আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, আল্লামা ইবনু রুশদ রহ., খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৮৯। (দারুল গরবিল ইসলামি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

পালন করছে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি যদি পণ্যটিকে প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রয় না করে, তাহলে তার কাছে এ পদ্ধতিটি জায়েজ হবে।

আল্লামা ইবনু রুশদ রহ. অন্য এক জায়গায় বলছেন—

قال عيسي : وسمعت ابن القاسم سئل عن رجل اشتري من رجل سلعة بثمن الي اجل، ثم إن البائع أمر رجلا أن يشتري له سلعة بنقد، ودفع اليه دنانيره، فاشتراها المأمور من المشتري بأقل من الثمن الذي كان ابتاعها به المشتري، وقد علم المأمور أن الأمر باعها منه أو لَم يعلم، وقد فاتت السلعة، قال :لا خير فيه.

'ইসা রহ. বলেন, আমি ইবনুল কাসেম রহ. থেকে শুনেছি। তাকে এমন একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে নির্দিষ্ট মেয়াদে কারও থেকে বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করলো। এরপর বিক্রেতা তৃতীয় একজনকে নির্দেশ দিলো যে, ক্রেতা থেকে সেই পণ্যটিই নগদে ক্রয় করে আনো এবং বিক্রেতা তাকে মূল্য দিয়ে দিলো। প্রথম ক্রেতা যে মূল্যে সেটি ক্রয় করেছিলো আদিষ্ট ব্যক্তি তার চেয়ে কম মূল্যে সেটি ক্রয় করে নিলো। আদিষ্ট ব্যক্তি এ কথা জানুক বা না জানুক যে, তার আদেশদাতা সেটি বিক্রয় করেছে। আর তখন পণ্যের উপস্থিতি নেই। এমন অবস্থার হুকুম কী? উত্তরে ইমাম মালিক রহ. বলেন, এমনে লেনদেনে ভালো কিছু নেই।'[৯৩]

এ কারণে ইমাম দুসুকি রহ. বলেন, যেসব বাকি বিক্রয়ে অপবাদের আশঙ্কা রয়েছে, সেগুলো জায়েজ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। সেসব শর্তের একটি শর্ত এই যে—

أن يكون البائع ثانيا هو المشتري اولا، أو من تنزل منزلة، والبائع اولا هو المشتري ثانيا، أو من تنزل منزلته.

'দ্বিতীয় বিক্রেতাই প্রথম ক্রেতা হবে। অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কেউ হবে। আর প্রথম বিক্রেতাই দ্বিতীয় ক্রেতা হবে। অথবা তার স্থলাভিষিক্ত কেউ হবে।'[৯৪]

---

[৯৩] আল-বয়ান ওয়াত তাহসিল, আল্লামা ইবনু রুশদ রহ., খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৭৬। (দারুল গরবিল ইসলামি থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

[৯৪] দুসুকি আলাশ শরহিল কাবির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৭। (দারুল ফিরক থেকে

ইমাম করাফি রহ. বলেন—

إنَّا نَّمنع أن يكون العقد الثاني من البائع الْأول.

'আমরা এমন পদ্ধতির বিক্রয়কে তখন নিষেধ করি, যখন দ্বিতীয় বিক্রয় চুক্তিটি প্রথম বিক্রেতার সঙ্গে হবে।'[৯৫]

উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, মালিকি মাজহাবের ফকিহগণের কাছে কোনো ধরনের মাকরুহ ছাড়াই তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে বিক্রয় করা জায়েজ আছে।

## ৪. হানাফি মাজহাব

হানাফি মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহ তাওয়াররুকের পদ্ধতিকে 'ইনাহ' নামে উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদের মধ্যে থেকে কেউ এ পদ্ধতির বিক্রয়কে মাকরুহ বলেছেন যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ রহ.। আবার তাদের কেউ সেটিকে জায়েজ বলেছেন। যেমন : ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও অন্যান্য ফকিহ। আল্লামা সারাখসি রহ. বলেন—

وذكر عن الشعبي أنه كان يكره أن يقول الرجل للرجل أقرضني فيقول لا حتَّى أبيعك وإنَّا أراد بهذا إثبات كراهة العينة وهو أن يبيعه ما يساوي عشرة بخمسة عشر ليبيعه المستقرض بعشرة فيحصل للمقرض زيادة وهذا في معنى قرض جر منفعه والْقراض مندوب إليه في الشرع والغرر حرام إلا أن البخلاء من الناس تطرقوا بهذا إلى الإمتناع مما يدنوا إليه والْقدام على ما نهوا عنه من الغرور.

'ইমাম শাবি রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি এ কথাকে অপছন্দ করেন যে, একজন অন্যজনকে বললো, আমাকে ঋণ দাও। তখন উত্তরে সে বললো, আমি ঋণ দেবো না। তবে তোমার কাছে কোনো পণ্য বিক্রয় করবো। এটির মাধ্যমে 'ইনাহ' বিক্রয়ের পদ্ধতিকে মাকরুহ প্রমাণ করা উদ্দেশ্য। আর তা হলো, দশটাকা মূল্যের পণ্যকে পনেরো টাকায়

---

প্রকাশিত সংস্করণ)

[৯৫] আল-ফুরুক, আল্লামা করাফি রহ., খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

বিক্রয় করা। যেন ঋণ প্রার্থী সেটিকে দশটাকার বিনিময়ে বাজারে বিক্রয় করতে পারে। ফলে ঋণদাতা কিছু বেশি অর্থ পাবে। এ পদ্ধতিটি 'ঋণ দিয়ে উপকার গ্রহণ করার' নীতির আওতাভুক্ত। শরিয়তের দৃষ্টিতে ঋণ দেওয়া ভালো কাজ। তবে ধোঁকা দেওয়া হারাম। অবশ্য কৃপণ ব্যক্তিরা এ পদ্ধতির মাধ্যমে সাধারণভাবে ঋণ দেওয়ার পরিবর্তে ধোঁকা দেওয়ার একটি রাস্তা বের করেছে।[৯৬]

'ইনাহ' বিক্রয়ের ব্যাখ্যায় আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন—

بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه، اخترعه أكلة الربا، وهومكروه مذموم شرعا لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض.

'ইনাহ চুক্তি এই যে, লাভের সঙ্গে কোনো পণ্যকে বাকি বিক্রয় করা। যেন ঋণের আবেদনকারী সেটিকে কম মূল্যে বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। সুদ খোররা এ বিক্রয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এটি মাকরুহ এবং শরিয়তে অপছন্দনীয়। কেননা, এ পদ্ধতির কারণে ঋণ দেওয়ার সওয়াব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

এ উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

(قوله : وهو مكروه )أي عند محمد ، وبه جزم في الْداية . قال في الفتح : وقال أبويوسف : لا يكره هذا البيع ؛ لأنه فعله كثير من الصحابة وجدوا على ذلك ولَم يعدوه من الربا حتَّى لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره . وقال محمد : هذا البيع في قلبي كأمثال الْبال ذميم اخترعه أكلة الربا.

'আল্লামা হাসকাফি রহ.-এর কথা (এটি মাকরুহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে মাকরুহ। হেদায়া গ্রন্থের প্রণেতাও এ কথার প্রতি দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন। ফাতহুল কাদির কিতাবে আছে, ইমাম আবু ইউসফ রহ. বলেন, এ বিক্রয় চুক্তি মাকরুহ নয়। কেননা, অনেক সাহাবি এমনটি করেছেন, এর প্রশংসাও করেছেন সেটিকে সুদের আওতাভুক্ত করেননি।

---

[৯৬] আল-মাবসুত, ইমাম সারাখসি রহ., খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৬। (বৈরুত থেকে প্রকাশিত সংস্করণ)

এমনকি কেউ যদি একটি কাগজের টুকরোকে এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে, তাহলেও সেটি জায়েজ আছে। মাকরুহ হবে না। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন, আমার কাছে এ বিক্রয়টি মন্দের কারণে পাহাড় তুল্য। সুদ খোররা এটি আবিষ্কার করেছে।'[৯৭]

ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে মুহিত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে— 'ইনাহ' বিক্রয় চুক্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, সেটির ব্যাখ্যায় শায়খদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোনো কোনো শায়খ থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেটিই 'ইনাহ' বিক্রয়-চুক্তি, যেটিকে মালিকি মাজহাবে 'তাওয়াররুক' নাম দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

فيبيعه المقرض منه باثني عشر درهُما ثم يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل لرب الثوب ربح درهمين بهذه التجارة ويحصل للمستقرض قرض عشرة وقال بعضهم تفسيرها أن يدخلا بينهما ثالثا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض بإثني عشر درهما ويسلم إليه ثم يبيع المستقرض من الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلم الثوب إليه ثم إن الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل لصاحب الثوب عليه اثنا عشر درهما كذا في المحيط وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى العينة جائزة مأجور من عمل بها كذا في مختار الفتاوى.

'ইনাহ চুক্তি এই যে, ঋণদাতা ঋণের আবেদনকারীর কাছে বারো টাকায় একটি কাপড় (বাকি) বিক্রয় করবে। এরপর ক্রেতা সে কাপড়টিকে নগদে দশ টাকায় বিক্রয় করবে। এ পদ্ধতিতে লেনদেন করার কারণে কাপড়ের মালিকের যেন দুই টাকা লাভ হয়ে যায়। আর ঋণের আবেদনকারীর দশটাকা ঋণ মিলে যায়।

কোনো কোনো শায়খ বলেন, ইনাহ চুক্তির ব্যাখ্যা এই যে, ঋণদাতা ও ঋণের আবেদনকারী তাদের দু-জনের মধ্যে তৃতীয় একজনকে প্রবেশ করাবে। ঋণদাতা তার কাপড়কে ঋণের আবেদনকারীর কাছে বারো টাকায় বিক্রয় করবে। এরপর ঋণের আবেদনকারী সে কাপড়টিকে

[৯৭] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১০। (মতলব : ইনাহ বিক্রয়)

তৃতীয় ব্যক্তির কাছে দশ টাকায় নগদ বিক্রয় করবে এবং তাকে কাপড় হস্তান্তর করবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি সে কাপড়টিকেই তার আসল মালিকের কাছে নগদে দশ টাকায় বিক্রয় করবে এবং তার থেকে দশ টাকা উসুল করে তাকে কাপড় দিয়ে দেবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি উসুলকৃত সেই দশ টাকা ঋণের আবেদনকারীকে দিয়ে দেবে। এ পদ্ধতিতে ঋণের আবেদনকারী দশ টাকা পেয়ে গেলো। আর কাপড়ের মালিক তার কাপড়ের বিনিময়ে বারো টাকা পেয়ে গেলো। যা ভবিষ্যতে আদায় হবে। মুহিত কিতাবে আনুরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, ইনাহ চুক্তি জায়েজ আছে এবং তার ওপর আমলকারী সওয়াব পাবে। মুখতারুল ফাতাওয়া কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে।'[৯৮]

মাকরুহ ও জায়েজ উভয় অভিমতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, জায়েজের অভিমতকে প্রথম পদ্ধতি, তথা তাওয়াররুকের পদ্ধতির ক্ষেত্রে ধরা হবে। আর মাকরুহ হওয়ার অভিমতকে দ্বিতীয় পদ্ধতি, তথা সে ইনাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে ধরা হবে, যেটি সংখ্যা গরিষ্ঠ ফকিহদের কাছে ইনাহ।

তিনি বলেন—

ثم الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير في الصورة الْأُولى ، وكعود العشرة في صورة إقراض الخمسة عشر فمكروه ، وإلا فلا كراهة إلا خلاف الْأُولى على بعض الاحتمالات كأن يحتاج المديون فيأبى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديون ويبيعه في السوق بعشرة حالة ، ولا بأس في هذا فإن الْأَجل قابله قسط من الثمن والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب ، فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فمكروه أو لعارض يعذر به فلا ، وإنَّا نعرف ذلك في خصوصيات المواد وما لَم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة ؛ لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل بيع بيع العي.

'আমার অন্তরে যে বিষয়টি উদয় হচ্ছে তা হলো, যদি এমন কোনো

[৯৮] ফাতাওয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৮। (মাজেদিয়া প্রকাশনী)

পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যেখানে সেই পণ্য বা তার আংশিক বিক্রেতার কাছে ফিরে আসে; যেমন : কাপড় বা রেশমের বিক্রয়ে বিক্রেতার কাছে কিছু ফিরে আসা, তাহলে এমন বিক্রয় মাকরুহ হবে। অন্যথায় মাকরুহ হবে না। অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে অনুত্তম হবে। উদাহরণ-স্বরূপ, সে ক্ষেত্রে (মাকরুহ হবে) যেখানে ঋণের আবেদনকারী মুখাপেক্ষি থাকে আর যার কাছে ঋণ চাওয়া হচ্ছে, সে ঋণ দিতে অস্বীকার করছে; কিন্তু দশ টাকার পণ্যকে বাকিতে পনেরো টাকায় বিক্রয় করতে প্রস্তুত আছে; তাই মুখাপেক্ষি ব্যক্তি সে পণ্যটিকে পনেরো টাকায় বাকিতে ক্রয় করে বাজারে নগদে দশ টাকায় বিক্রয় করলে এমন লেনদেনের মধ্যে কোনো ধরনের সমস্যা নেই। কারণ, সময়ের বিনিময়ে মূল্যের একটি অংশ থাকে। আর সবসময় ঋণ দেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। অবশ্য দুনিয়ার সম্পদ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা মাকরুহ। কিন্তু কোনো ওজরের কারণে ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা মাকরুহ নয়। ভুক্তভোগীর অবস্থা ভেদে সেটি জানা যাবে পণ্যটি যদি বিক্রেতার কাছে ফেরত না আসে। তখন সেটিকে 'ইনাহ' বিক্রয় বলা যাবে না। কেননা, হুবহু পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফিরে যাওয়ার কারণে সেটিকে এই নাম দেওয়া হয়েছে। শুধু পণ্যের সত্তার কারণে এ নাম রাখা হয়নি। অন্যথায় সব বিক্রয়কে 'ইনাহ' বিক্রয় নাম রাখা হতো।'[৯৯]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. যে কথা বলেছেন, তা অতি বাস্তব সম্মত। এ কারণে অনেক হানাফি ফকিহ এটিকে গ্রহণ করেছেন এবং এর ওপর ফাতাওয়াও দিয়েছেন। আল্লামা আইনি রহ. বিনায়া কিতাবে বলেন—

أن الكراهة في هذا البيع حصلت من المجموع فإن الإعراض عن الإقراض ليس بمكروه، والبخل الحاصل من طلب الربح في التجارات كذلك وإلا لكانت المرابحة مكروهة.

'এ বিক্রয়ে যে মাকরুহের বিষয়টি এসেছে সেটি কয়েকটি বিষয়ের সমষ্টির কারণে এসেছে। অন্যথায় শুধু ঋণ না দেওয়া মাকরুহ নয়। ব্যবসাতে লাভ অর্জনের জন্য কার্পণ্যতা করাও মাকরুহ নয়। অন্যথায় সব ধরনের মুরাবাহা বিক্রয় মাকরুহ হতো।'[১০০]

---

[৯৯] ফাতহুল কাবির, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ২২৪। (রশিদিয়া প্রকাশনী)

[১০০] বক্তব্যটি 'বাহরুর রায়েক' খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৯৫-এ উল্লেখ আছে।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করার পর আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. বলেন—

وأقره في البحر والنهر والشرنبلالية وهو ظاهر ، وجعله السيد أبو السعود محمل قول أبي يوسف، وحمل قول محمد والحديث على صورة الع.

'বাহরুর রায়েক, নাহরুল ফায়েক ও শুরুম্বুলালিয়্যাহ কিতাবে এ অভিমতকে ঠিক বলা হয়েছে এবং এটিই স্পষ্ট। আবুস সঊদ রহ. এটিকে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতও হাদিসকে বিক্রেতার কাছে পণ্য ফিরে যাওয়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন।'[১০১]

আবুস সঊদ রহ. ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতকে পণ্য ফিরে যাওয়া পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কাজি খান রহ.-এর বক্তব্য থেকেও তার এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন—

وحيلة أخري :أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بثمن مؤجل ويدفع السلعة الي المستقرض، ثم إن المستقرض يبيعها من غيره بأقل مما اشتري، ثم ذلك الغير يبيعها من إلا لمقرض بما اشتري، لتصل السلعة اليه بعينها، ويأخذ الثمن، ويدفعه الي المستقرض، فيصل المستقرض الي القرض، ويحصل الربح للمقرض، وهذه الحيلة هي العينة التي ذكرها محمد رحمه الله تعالي.

'আর দ্বিতীয় একটি হিলা এই যে, ঋণদাতা ঋণের আবেদনকারীর কাছে কোনো পণ্য বাকি বিক্রয় করবে এবং পণ্যটি ঋণের আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করবে। এরপর ঋণের আবেদনকরারী তৃতীয় কারও কাছে ক্রয় মূল্যের চেয়ে কমে বিক্রয় করে দেবে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি সে পণ্যটিকেই তার ক্রয় মূল্যে ঋণদাতার কাছে নগদে বিক্রয় করবে। যাতে হুবহু সে পণ্যটিই ঋণদাতার কাছে পৌঁছে যায়। আর তৃতীয় ব্যক্তি ঋণদাতা থেকে মূল্য উসূল করে ঋণের আবেদনকারীকে দেবে। ফলে ঋণের আবেদনকারী ঋণ পেয়ে যাবে। আর ঋণদাতার লাভ হয়ে যাবে। এ হিলাটি হলো সরাসরি ইনাহ বিক্রয়। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যার আলোচনা করেছেন।'[১০২]

---

[১০১] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩১১।

[১০২] ফাতাওয়া কাজিখান, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৯। (ফাতাওয়া হিন্দিয়ার সঙ্গে মুদ্রিত সংস্করণ)

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ইমাম কাজিখান রহ. হানাফি মাজহাবের পূর্ববর্তী শায়খদের অন্তর্ভুক্ত। যার ইনতিকাল হয়েছে হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দিতে (৫৯২ হি.)। সুতরাং হানাফি ইমামদের অভিমত সম্পর্কে তিনিই ভালো জানবেন।

ওই 'ইনাহ' বিক্রয়, যেখানে পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যায়। কিন্তু হাম্বালি মাজহাবের ফকিহগণ যে পদ্ধতিকে 'তাওয়াররুক' বলেছেন। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করে বাজারে গিয়ে সেটিকে (৩য় কারও কাছে) ক্রয় মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করে। যেন সে নগদ অর্থ পেয়ে যায়। এমন পদ্ধতিকে হানাফি মাজহাবের কোনো ইমাম মাকরুহ বলেননি। বরং আল্লামা ইবনুল হুমাম, আইনি, ইবনু নুজাইম, নাহরুল ফায়েকের লেখক, আল্লামা শুরুম্বুলালি, আবুস সউদ রহ. এমন পদ্ধতিকে জায়েজ বলেছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন রহ. সেটিকে গ্রহণ করেছেন। আর আল্লামা কাজিখান রহ.-এর বক্তব্য থেকে এটিই প্রকাশ পায়। কারণ, সুদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে মানুষ যেসব হিলা গ্রহণ করে থাকে, তাওয়াররুককে তিনি সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত করেননি। আর ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে মাকরুহের যে অভিমত বর্ণিত আছে, সেটিকে তিনি এমন পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন, যেখানে পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যায়।

## ৫. ফকিহদের অভিমতের সারকথা

চার মাজহাবের ফকিহদের যে উদ্ধৃতি ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, তার আলোকে চার মাজহাবের সারকথা এই, যে চার মাজহাবেই তাওয়াররুক জায়েজ হওয়ার অভিমতটি গ্রহণযোগ্য। অবশ্য হাম্বালি ও হানাফি মাজহাবে সেটি মাকরুহ হওয়ার পক্ষে অভিমত রয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. থেকে মাকরুহের একটি বর্ণনা রয়েছে। ইবনু তাইমিয়া রহ. ও তার ছাত্র ইবনুল কইয়িম রহ. সেটিকে গ্রহণ করেছেন। আর হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমদের কেউ কেউ মাকরুহ হওয়ার অভিমতটি বর্ণনা করেছেন। যেমন : দুররুল মুখতার কিতাবের লেখক আল্লামা হাসকাফি রহ.। এবং তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অভিমতটিকে মাকরুহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেছেন।

মালিকি মাজহাবের বিষয়টি হলো, আমি তাদের কিতাবে স্পষ্টভাষায় তাওয়াররুকের আলোচনা পাইনি। অবশ্য ইনাহ বিক্রয় মাকরুহ হওয়ার জন্য

তারা এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, বিক্রীত পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করা হবে। সুতরাং তাওয়াররুকের পদ্ধতিটি তার বাইরে থাকবে।

অনুরূপভাবে শাফিয়ি মাজহাবের কিতাবেও স্পষ্টভাষায় তাওয়াররুকের আলোচনা পাইনি। কিন্তু শাফিয়ি মাজহাবের অধিকাংশ ফকিহ ইনাহ বিক্রয় জায়েজের বিষয়ে মতামত দিয়েছেন। যদিও শাফিয়ি মাজহাবের পরবর্তী ফকিহগণের অনেকে ইনাহ বিক্রয় মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন : আল্লামা রমলি ও আল্লামা খতিব শিরবিনি রহ.। তবে ইনাহ বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনায় এবং মাকরুহ বিক্রয়ের আলোচনার কোথাও তাওয়াররুকের কথা উল্লেখ করেননি।

আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. মাকরুহ হওয়ার বিষয়টিকে শুধু সে পদ্ধতির সঙ্গে বিশেষিত করেছেন, যেখানে পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যায়। তার এ কথাটি সঠিক বলে মনে হয়। কারণ, সেখানে হিলার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতা যখন এমন পদ্ধতি অবলম্বন করবে, যেখানে বিক্রীত পণ্যটি হুবহু প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যাবে, তখন নগদে কম মূল্যদাতা আর নির্দিষ্ট সময় আসলে বেশি মূল্য উসুলকারী একই ব্যক্তি হচ্ছে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত অর্থে এটি বিক্রয় ছিলো না। বরং প্রথম বিক্রেতা কেবল বিক্রয় পদ্ধতি অবলম্বনে হিলা করেছে। যেন নগদে কম অর্থের বিনিময়ে বাকিতে বেশি অর্থ পাওয়া যায়। আর সুদের অর্থ এটিই।

আর তাওয়াররুকের বিষয়টি হলো, সেখানে প্রথম বিক্রেতার ভূমিকা এ সীমা অতিক্রম করে না যে, তার পণ্যকে বাজার মূল্য অপেক্ষা বাকিতে বেশি মূল্যে বিক্রয় করছে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের মতে এ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা শরিয়ত সম্মত। এরপর প্রথম বিক্রেতার আর কোনো সম্পর্ক থাকে না যে, ক্রেতা সেটি ক্রয় করার পর কী করবে? কারণ, ক্রেতা সে পণ্যটিকে দ্বিতয়িবার প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করছে না। বরং বাজারে গিয়ে সে (অন্য কারও কাছে) বিক্রয় করছে। আর প্রথম ক্রেতা থেকে যে ব্যক্তি সেই পণ্যটি ক্রয় করছে, সে আগের মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে ক্রয় করছে। আর প্রথম ক্রেতা বিক্রেতাকে বাকিতে মূল্য পরিশোধ করে। সুতরাং দীর্ঘ সময় পর যে ব্যক্তি বেশি মূল্য নিচ্ছে, সে কম মূল্য দিচ্ছে না। আর সুদ তখনই হয়, যখন কম মূল্যদাতাই বাকিতে বেশি মূল্য গ্রহণ করবে।

অতএব যখন দাতা ও গ্রহীতা বাস্তবিক অর্থে ভিন্ন ব্যক্তি হলো, তখন সুদের সন্দেহও দূর হয়ে গেলো।

যেসব তাওয়াররুক পদ্ধতিকে মাকরুহ বলেছেন। তারা এ কারণে মাকরুহ বলেছেন যে, কার্যত শেষ ফলাফল এটিই দাঁড়ায় যে, প্রথম ক্রেতা যে মুহূর্তে কম অর্থ পাচ্ছে, সেই মুহূর্তে তার ওপর বেশি অর্থ ঋণ হিসাবে আরোপ হচ্ছে। তবে এ ফলাফলটি যেহেতু শরয়ি চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে এবং যার থেকে কম মূল্য গ্রহণ করা হচ্ছে সে ওই ব্যক্তি নয়, যে বেশি মূল্য পাচ্ছে। সেহেতু এমন চুক্তি জায়েজ হতে কোনো বাধা নেই। আর এ চুক্তিটি সেই চুক্তির মতো যার ব্যাপারে আবু সাইদ খুদরি ও আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিয়েছেন। সে হাদিসটি এই—

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع التمر بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে খয়বারের আমেল (জাকাত আদায়কারী) করে পাঠালেন। সে উন্নত খেজুর নিয়ে ফিরে এলো। এটি দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, খয়বারের সব খেজুরই কি এমন উন্নত? সে উত্তর দিলো, হে আল্লাহর রাসুল, এমনটি নয়। বরং আমরা উন্নত খেজুরের এক ছ'কে অনুন্নত খেজুরের দুই ছ'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। আর দুই ছ খেজুরকে তিন ছ'র বিনিময়ে নিয়ে থাকি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এমনটি কখনো করো না। প্রথমে অনুন্নত খেজুরকে দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করো। তারপর সে দিরহামের বিনিময়ে উন্নত খেজুর ক্রয় করো।'[১০৩]

বর্ণিত হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বিনিময়ের যে পদ্ধতির কথা বলেছেন, সেখানে এমন ফলাফলই প্রকাশ পায়। যা এক ছ'কে দুই ছ'র বিনিময়ের ফলে প্রকাশ পায়। কারণ, অনুন্নত খেজুরের

[১০৩] বুখারি, হাদিস : ২৩০৩।

মালিক তার দুই ছ খেজুর বিক্রয় করবে এবং তার মূল্য দিয়ে এক ছ উন্নত খেজুর ক্রয় করবে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটিকে জায়েজ বলেছেন। কারণ এ ফলাফলটি এমন দুটি জায়েজ চুক্তির মাধ্যমে এসেছে, যার পরস্পরের মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিলো না। এখান থেকে বুঝা যায়, বাস্তবিক শরয়ি পদ্ধতিতে লেনদেন করলে সে লেনদেনের শেষ ফলাফল সুদের মতো হওয়া এ বিষয়টিকে আবশ্যক করে না যে, সেটি হারাম।

তাছাড়া কুরআন-হাদিসের এমন কোনো বক্তব্য নেই, যা তাওয়াররুককে না জায়েজ সাব্যস্ত করে। আর তাওয়াররুকের পদ্ধতিকে ইনাহ বিক্রয়-পদ্ধতির আওতাভুক্ত করারও কোনো প্রমাণ নেই। কারণ, আয়শা রা.-এর হাদিস ছাড়া আর কোনো হাদিস বা আসারে ইনাহ বিক্রয়ের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর সে হাদিসটিকে ইমাম আবদুর রাজ্জাক, ইমাম দারা কুতনি ও ইমাম বাইহাকি রহ. নিজ নিজ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক-এর ভাষ্য এরূপ—

أخبرنا معمر والثوري عن أبِ إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مئة إلى أجل ثم اشتريتها منه بست مئة فنقدته الست مئة وكتبت عليه ثمان مئة فقالت عائشة بئس والله ما اشتريت وبئس والله ما اشتري أخبري زيد بن أرقم أنه. قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا أن يتوب

‘মামার ও সাওরি রহ. আবু ইসহাক রহ. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি তার স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন। সে কয়েকজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে আয়শা রা.-এর কাছে যায়। একজন মহিলা আয়শা রা.-কে জিজ্ঞেস করে, হে উম্মুল মুমিনিন, আমার একটি দাসী ছিলো। আমি তাকে জায়েদ ইবনু আরকাম রা.-এর কাছে। আটশো দিরহামের বিনিময়ে বাকিতে বিক্রয় করি। এরপর আমি সে দাসীকে নগদে ছয়শো দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নিই এবং তাকে ছয়শো দিরহাম পরিশোধ করি। আর তার দায়িত্বে আটশো দিরহামের ঋণ লিখে দিই। এ কথা শুনে আয়শা রা. বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি যা ক্রয় করেছো, তা খুবই

নিকৃষ্ট। আল্লাহর কসম! সে যা ক্রয় করেছে, তা খুবই নিকৃষ্ট। জায়েদ ইবনু আরকাম রা.-কে জানিয়ে দাও যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তার জিহাদ বাতিল হয়ে গেছে। তবে সে তাওবা করে নিলে (অনুরূপ হবে না।)।[১০৪]

বর্ণিত পদ্ধতির ওপর আয়শা রা. তিরস্কার করেছেন। কেননা, সেখানে দাসী তার আগের মালিকের কাছে ফিরে গেছে আর তার জন্য দুইশো দিরহামও বাকি রয়েছে। অবশ্য জায়েদ ইবনু আরকাম রা. নগদ ছয়শো দিরহামের জন্য সেটিকে যদি সাধারণ বাজারে ছয়শো দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্পষ্ট কথা এই যে, উল্লিখিত লেনদেনটি আয়শা রা.-এর তিরস্কারের আওতাভুক্ত হতো না। মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

বর্ণনাটিতে আবু ইসহাক রহ.-এর স্ত্রী অপরিচিত হওয়ার কারণে অনেকে সেটিকে ত্রুটিযুক্ত বলেছেন। কিন্তু আল্লামা জায়লায়ি রহ. বলেন, সে খুব উঁচু মর্যাদার অধিকারী মহিলা। আল্লামা ইবনু সাদ রহ. তাবাকাত কিতাবে তার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

## ফকিহগণ যে তাওয়াররুকের অনুমতি দিয়েছেন, তার বাস্তবতা

ইতোপূর্বে আমরা যে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তার সারকথা এই যে, সত্তাগতভাবে তাওয়াররুক একটি জায়েজ লেনদেন। এর সম্পর্কে সর্বোচ্চ সে কথা বলা যায়, যা আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. বলেছেন। বিক্রেতা যদি এ কথা জানতে পারে যে, ক্রেতার ব্যক্তিগত কারণে তার অর্থের প্রয়োজন আর অর্থের প্রয়োজনেই সে এ পণ্যকে বেশি মূল্যে ক্রয় করছে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে লেনদেন করা অনুত্তম হবে। সুতরাং বিক্রেতার যদি সামর্থ থাকে যে, ক্রেতাকে তার প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারবে, তাহলে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাকে ঋণ দেওয়াই উত্তম হবে এবং সওয়াবের মাধ্যম হবে। এ পরিস্থিতিতে ক্রেতাকে ঋণ না দিয়ে, বেশি মূল্যে তার কাছে পণ্য বিক্রয় করা অনুত্তম হবে। ক্রেতার নগদ অর্থের প্রয়োজন যত বেশি হবে, ঋণ দেওয়ার ফজিলতও তত বেশি হবে। আর তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে লেনদেনও তত ভদ্রতা বিবর্জিত কাজ হবে। কিন্তু তারপরও এ কথা বলা যাবে না যে, ঋণ

[১০৪] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাদিস : ১৪৮১২।

দেওয়া বিক্রেতার ওপর ওয়াজিব। তবে ক্রেতা যদি অনোন্যপায় অবস্থার শিকার হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া ওয়াজিব হবে। কারণ, সে অবস্থার জন্য শরিয়তের বিশেষ হুকুম রয়েছে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে অন্যকে ঋণ দেওয়া তো দূরের কথা তার প্রয়োজনীয় বস্তু তাকে দান বা সদাকা করা পর্যন্ত ওয়াজিব হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি এ কথা জানতে পারে যে, ক্রেতা তার সঙ্গে তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে লেনদেন করছে। তার ব্যাবসায়িক কাজে নগদ অর্থের প্রয়োজন। আর তার উদ্দেশ্য হলো অর্থায়নের জন্য নগদ অর্থ অর্জন করা। এমন ক্ষেত্রে বিক্রেতার জন্য উত্তম পদ্ধতি এই যে, ক্রেতার সঙ্গে সে 'শিরকাত বা মুদারাবার' চুক্তি করবে। কারণ, অর্থায়নের জন্য এ পদ্ধতি দুটি উত্তম। আর এ পদ্ধতি দুটি পরিহার করে তাওয়াররুকের পদ্ধতি অবলম্বন করা অনুত্তম। কারণ, তখন উত্তম পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব ও সহজ। কিন্তু তারপরও এ কথা বলা যাবে না যে, ওই পদ্ধতিটি সহিহ নয়। বিক্রেতার ওপর ওয়াজিব হলো, সে ক্রেতার সঙ্গে কেবল 'শিরকাত বা মুদারাবাতের' চুক্তি করবে। তাওয়াররুকের পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে না।

তবে উপরে আমরা এ আলোচনা করেছি যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহদের কাছে তাওয়াররুকের পদ্ধতি জায়েজ আছে। এটি সে তাওয়াররুকের হুকুম, যেখানে দুটি লেনদেন একেবারেই ভিন্ন হবে। একটি চুক্তি এই যে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (ক্রেতা) বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করবে। দ্বিতীয় চুক্তি এই যে, সে পণ্যটিকে বাজারে বিক্রয় করবে। ফকিহগণ যে তাওয়াররুকের আলোচনা করেছেন এবং যেটিকে জায়েজ বলেছেন সেটি এই পদ্ধতির তাওয়াররুক হবে যে, বিক্রয়ের পণ্য আগে থেকেই পরিপূর্ণভাবে বিক্রেতার মালিকানায় থাকবে। এরপর স্বতন্ত্র বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে পণ্যের সব ধরনের হুকুম ও অধিকার বিক্রেতা থেকে পরিবর্তন হয়ে ক্রেতার কাছে চলে যাবে। কিন্তু যদি এ লেনদেনের সঙ্গে অন্য কোনো আনুসাঙ্গিক বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তাহলে এমনটি হওয়া অসম্ভব নয় যে, তার হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। হয়তো নিশ্চিতভাবে নাজায়েজের হুকুম হবে বা মাকরুহের হুকুম লাগবে। অথবা উত্তম পদ্ধতির লেনদেনের সীমানা থেকে অনেক দূরে সরে যাবে।

তাওয়াররুক পদ্ধতির যে হুকুম এবং তার যে বাস্তবতায় আমরা উপনীত হলাম, হুবহু এ সিদ্ধান্তটিই স্থির করা হয়েছে 'রাবেতায়ে আল-আলম আল-ইসলামির'

'ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমি' মক্কা মুকাররমায় অনুষ্ঠিত তাদের পনেরোতম সেমিনারে। (সিদ্ধান্ত নম্বর : ৫) সে ধারার উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করা হলো—

أولا :أن بيع التورق، هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها

المشتري بنقد لغير البائع للحصول علي النقد( الورق)

ثانيا : أن بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء ، لأن الصلفي البيوع الاباحة، لقول الله تعالي :وأحل الله البيع وحرم الربا ولَم يظهر في هذا البيع ربا لا قصداولا صورة، ولأن الحاجة داعية الي ذلك لقضاء دين، أو زواج او قيرها . ثالثا :جواز هذا البيع مشروط بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به علي لا بائعها الأول، مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة المحرم شرعا، لاشتماله علي حلية الربا، فصار عقدا مجرما.

رابعا :أن المجلس. وهو يقرر ذلك يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالي لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم طيبة به نفوسهم ابتغاء مرضاة الله، لايتبعه منا ولا اذي، وهو من اجل انواع الانفاق في سبيل الله تعالي، لما فيه من التعاون والتعاطف،والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم وسد حاجاتهم، وانقاذهم من الاثقال بالديون والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الاقراض الحسن والحث عليه كثيرة لا تخفي، كما يتعين علي المستقرض التحلي بالوفاء وحسن القضاء وعدم المماطلة.

এক : তাওয়াররুকের বিক্রয় বলা হয়, বিক্রেতার হাতে থাকা বা মালিকানাধীন কোনো পণ্যকে বাকিতে বিক্রয় করা। তারপর ক্রেতা নগদ অর্থ অর্জনের লক্ষ্যে সেটিকে বিক্রেতা ছাড়া অন্যের কাছে নগদে বিক্রয় করা।

দুই : তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে বিক্রয় করা শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমদের অভিমত। কারণ, ক্রয়-বিক্রয়ের আসল হলো জায়েজ হওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে

হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' আর এ পদ্ধতিতে লেনদেন করলে ইচ্ছাকৃত বা পদ্ধতিগত কোনোভাবেই সুদের বিষয়টি প্রকাশ পায় না। কেননা, ঋণ পরিশোধ ও বিয়ে ইত্যাদির জন্য এমন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন হয়।

তিন : উল্লিখিত পদ্ধতির বিক্রয় জায়েজের শর্ত হলো, ক্রেতা যে মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করেছে, তার চেয়ে কম মূল্যে সরাসরি বা কোনো মাধ্যমে প্রথম বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করতে পারবে না। ক্রেতা সেটিকে যদি বিক্রেতার কাছে বিক্রয় করে, তাহলে তারা দু-জনেই হারাম—ইনাহ—চুক্তিকারী হবে। কারণ, পদ্ধতিটি সুদের হিলা সম্বলিত। এ কারণে সে চুক্তিটি হারাম হবে।

চার : অ্যাকাডেমি উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলোর অনুমতি দিচ্ছে। আর মুসলিমদের প্রতি আহ্বান করছে যে, তারা যেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতে তাদের সম্পদের বিষয়ে মহান আল্লাহর মনোনীত শরিয়তের ওপর চলার উদ্দেশ্যে মুখাপেক্ষি মানুষদেরকে ঋণ দেয়। আর ঋণ দেওয়ার পর তাদেরকে যেন কোনো ধরনের খোটা বা কষ্ট না দেয়। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের যত উত্তম পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো কর্জে হাসানা। কেননা, তার মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং তাদের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বতের বন্ধন তৈরি হয়। মুসলিমদের কষ্ট লাঘব করা হয়। তাদের প্রয়োজন পূরণ করা হয়। সম্পদের মাধ্যমে তাদের বোঝাকে হালকা করা এবং হারাম লেনদেনে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচানো হয়। কর্জে হাসানের ফজিলত, তার সওয়াব, প্রতিদান এবং সেটি দিতে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের অগণিত বর্ণনা আছে। ঠিক তেমনি ঋণগ্রহীতার দায়িত্ব হলো ওয়াদা পূরণ করা, সুন্দর প্রক্রিয়ায় ঋণ পরিশোধ করা এবং ঋণ আদায়ে কোনো ধরনের টালবাহানা না করা।[১০৫]

উল্লিখিত সিদ্ধান্তবলির মধ্যে চিন্তা করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়, তাওয়াররুকের

---

[১০৫] রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামির আয়ত্বাধীন ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমির সিদ্ধান্ত। পৃষ্ঠা : ৩২১-৩২২।

পদ্ধতি জায়েজ হওয়া এ শর্তের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে, পণ্যটি বিক্রেতার কবজায় থাকতে হবে এবং তাওয়াররুকের সঙ্গে অন্য কোনো বিষয় সম্পৃক্ত হবে না। সিদ্ধান্তের চতুর্থ প্যারাটিতে কর্জে হাসানা দেওয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে। কর্জে হাসানা দেওয়া তাওয়াররুকের পদ্ধতি অবলম্বন অপেক্ষা উত্তম।

তাওয়াররুকের শরয়ি হুকুম এবং সে সম্পর্কে ভূমিকা আলোচনা করার পর আমরা এখন সেসব তাওয়াররুকের আলোচনার দিকে যাবো, যেগুলোকে বর্তমান সময়ের ইসলামি ব্যাংকগুলো অর্থায়নের পদ্ধতি হিসাবে চালু করেছে।

## বর্তমান সময়ের ব্যাংকসমূহে তাওয়াররুকের কার্যত চলমান প্রক্রিয়া

যেহেতু অনেক ফিকহি কাউন্সিল ও সেমিনার তাওয়াররুক পদ্ধতি জায়েজের বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে। এ কারণে ইসলামি ব্যাংক এবং ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে সেটি কার্যকর ও বাস্তবায়ন শুরু করেছে। আর সেসব প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ পরিধিতে তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে অর্থায়নের বিষয়টি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আহলে ইলমদেরকে এর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে যারা শরিয়তের সব হুকুমকে এর সব ধরনের শর্ত পালনসহ প্রয়োগ করার প্রতি গুরুত্ব দেন এবং এর অপব্যবহার করার কারণে যেসকল সমস্যা সৃষ্টি হয় সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। এখানে আমরা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো বর্তমানে তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে লেনদেন করার ক্ষেত্রে যেগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত জরুরি।

### ১. তাওয়াররুকের লেনদেনে ব্যাপকতা

এ কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, নগদ অর্থ সংগ্রহের জন্য তাওয়াররুক একটি জায়েজ পন্থা ও শরিয়ত সম্মত হিলা। কিন্তু সেটি জায়েজ হওয়া সত্ত্বেও তা নিতান্তই একটি হিলা ও বিকল্প পদ্ধতি হওয়া থেকে বের হতে পারেনি। বাস্তবিক প্রয়োজনের সময় ব্যক্তি পর্যায়ে বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যেই এসব হিলা ও বিকল্প পদ্ধতির আবিষ্কার করা হয়ে থাকে। এ ধরনের হিলা বা বিকল্প পদ্ধতিগুলো এমন হওয়ার উপযুক্ত না যে, বড়ো ধরনের ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মৌলিক কাজের ভূমিকা রাখবে। এবং শরিয়তে মুহাম্মাদির কাঙ্ক্ষিত

অর্থনীতির চিত্র পেশ করার ক্ষমতা রাখবে। বড়ো ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হিলা ও বিকল্প পদ্ধতির ব্যাপকতা ইসলামি অর্থায়নের নীতিকে সামনে বাড়াতে প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, যখনই এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো হিলা ও বিকল্প পদ্ধতিতে অর্থায়নে ব্যাপকতা ঘটাবে, তখন শরিয়ত কর্তৃক উদ্বুদ্ধকৃত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

শরিয়তে ব্যবসায় অর্থায়নের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো শিরকাত ও মুদারাবার মাধ্যমে অর্থায়ন করা। কারণ, এটি এমন এক পদ্ধতি যা জনসাধারণের মধ্যে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করে। বড়ো বড়ো সম্পদশালীদের থেকে সম্পদের স্রোত সাধারণের দিকে ফিরিয়ে দেয়। সুতরাং তাওয়াররুক, মুরাবাহা ও অনুরূপ লেনদেনের ব্যাপকতাও বিশেষ করে যেগুলোকে সুদি ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলো শিরকাত ও মুদারাবার গণ্ডিকে সংকুচিত করে দেয়। আর এ ধরনের বিকল্প পদ্ধতির ব্যাপকতা সুদি দর্শনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যার মূল উদ্দেশ্যই হলো, কোনো ধরনের ক্ষতির ঝুঁকি বহন ছাড়াই লাভ অর্জন করা। এবং তা বর্তমানের প্রচলিত পুজিবাদি নীতির মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে না।

ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে সেগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো, সেগুলো থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ফিকহি কাউন্সিলর সেমিনার এবং ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যবেক্ষণ কমিটি তাদেরকে 'মুরাবাহা লিল আমের বিশ শেরা' এবং তাওয়াররুক ইত্যাদির মতো বিকল্প পদ্ধতিসমূহ জায়েজের ফতোয়া দিয়েছিলো। কেননা, সেসব ইসলামি ব্যাংক এমন পরিবেশে কাজ শুরু করেছিলো, যা নিরেট সুদি লেনদেনে ভরপুর ছিলো। আর শিরকাত ও মুদারাবার নীতিতে অর্থায়ন করা তখন খুব কঠিন ছিলো। সুতরাং এ ধরনের পরিবেশে লেনদেন করতে উল্লিখিত বিকল্প পদ্ধতিসমূহের প্রয়োজন ছিলো। যেন প্রাথমিক পর্যায়ে নিরেট সুদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আর সাধারণ মানুষ এমন অর্থায়নের পদ্ধতির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে, যা তাদেরকে একেবারে নিরেট সুদি লেনদেনে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। কিন্তু যেসব ফকিহ এমন বিকল্পকে জায়েজ বলেছিলেন তাদের ধারণায়ও ছিলো না যে, এসব প্রতিষ্ঠান চির দিনের জন্য বিকল্প পদ্ধতিসমূহের ওপরই আস্থা রাখবে। এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেসব পদ্ধতিকেই মৌলিক নীতিতে পরিণত করবে। সেগুলোকে এমন বুনিয়াদি কার্যক্রম হিসাবে গ্রহণ করবে যার মাধ্যমে সবসময় লেনদেন চলতে থাকবে।

বর্তমানে ইসলামি ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠার ত্রিশ বছরের অধিক সময় অতিক্রম করেছে। এ সময়ে মধ্যে তার সংখ্যা ও পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বড়ো সংখ্যক গ্রাহক তাদের সঙ্গে লেনদেন করছে। এমন প্রতিষ্ঠানসমূহের শরয়ি পর্যবেক্ষণ কমিটির সময় এসেছে যে, তারা সেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুরাবাহা ও তাওয়াররুকের পদ্ধতি কম ব্যবহার করতে এবং শিরকাত ও মুদারাবার মতো উত্তম লেনদেন বেশি করতে তাকিদ দেবে। তাদের সব ধরনের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিককে স্থায়ী পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত করবে। যেন ইসলামি ব্যাংকগুলো ইসলামি উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এবং ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে তার উজ্জল আকৃতিতে তুলে ধরবে। বিশ্বের সামনে এটিকে এমনভাবে প্রকাশ করবে না যে, এটি কেবল হিলা ও বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায়। কারণ, এ ধরনের কর্মপদ্ধতি দুর্নামের কারণ হবে, যা শুধু এসব প্রতিষ্ঠানের জন্যই নয় বরং তা ইসলামি অর্থনীতির জন্যও দুর্নামের কারণ হবে।

অনেক সময় খারাপের রাস্তা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এমন প্রস্তাব পেশ করা হয় যে, ইসলামি ব্যাংকিং পদ্ধতিতে 'তাওয়াররুকের' পদ্ধতিকে একেবারে নিষিদ্ধ করা হোক। এ ব্যাপারে ইসলামি ফিকহ অ্যাকাডেমির সম্মানিত ভোক্তা জেনারেল সেক্রেটারির পক্ষ থেকে নিচের এই প্রশ্নটি পেশ করা হয়েছে—

'তাওয়াররুকের ব্যাপকতার কারণে ইসলামি ব্যাংকিংএ সৃষ্ট ঋণের আধিক্য, ইসলামি ব্যাংকিং এবং সুদি ব্যাংকিংয়ের মধ্যে পার্থক্যকারী দূরত্ব কমে যাওয়া, শিরকাতের ওপর তাওয়াররুক বৃদ্ধি পাওয়া এবং পুঁজিগোছা যাওয়ার ঝুঁকিকে সহনীয় করে তোলা ইত্যাদি বিষয়ের কারণে তাওয়াররুককে একেবারে নিষিদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কি? যদিও সত্তাগতভাবে সেটি বৈধ আছে।'

আমার দৃষ্টিতে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইসলামি অর্থব্যবস্থার এই প্রাথমিক পর্যায়ে তাওয়াররুককে একেবারে নিষিদ্ধ করা হলে কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে বাস্তবিক অর্থেই তাওয়াররুকের সম্মুখীন হতে হয়। তবে শরয়ি নিয়ন্ত্রন কমিটির (SSB) জন্য উচিত হলো নিচের দুটি ক্ষেত্রে এ সকল লেনদেনের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা—

প্রথম ক্ষেত্র :

শরয়ি নিয়ন্ত্রন কমিটি শুধু সেসব ক্ষেত্রে তাওয়াররুকের লেনদেন করার অনুমতি দেবে যেখানে বাস্তবিক অর্থে তাওয়াররুকের প্রয়োজন রয়েছে।

আর ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সমগ্র লেনদেনের মধ্যে তাওয়াররুকের পরিমাণ কমানোর ব্যাপারে তাকিদ দেবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্র :

তাওয়াররুকের পদ্ধতিগুলো এমন সব বিষয় থেকে মুক্ত হতে হবে, যেগুলো তাওয়াররুককে জায়েজের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। কিংবা এর মাকরুহ হওয়ার সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে না। লেনদেনকে শুধু কৃত্রিম পদ্ধতির লেনদেনে পরিণত করে। এ ধরনের কিছু বিষয়ের প্রতি সামনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

## ২. বিক্রেতার পক্ষ থেকে তাওয়াররুককারীকে পণ্য ক্রয়ের ওকিল বানানো

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, ফকিহগণ যে তাওয়াররুকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং যেটি জায়েজ হওয়ার হুকুম দিয়েছেন, সেটি হলো ওই তাওয়াররুক যা ভিন্ন দুটি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। প্রথম চুক্তিটি হলো, বিক্রেতার তার মালিকানাধীন এবং কবজায় থাকা কোনো পণ্যকে তাওয়াররুককারীর কাছে বাকিতে বিক্রয় করবে। আর দ্বিতীয় চুক্তিটি হলো, তাওয়াররুককারী ক্রেতা উল্লিখিত পণ্যটিকে এমন কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রয় করবে, যার সঙ্গে প্রথম বিক্রেতার উল্লিখিত লেনদেনের বিষয়ে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ পদ্ধতির সঙ্গে আরও একটি চুক্তিকে সংযুক্ত করে থাকে। সে চুক্তিটি হলো ওকিলের চুক্তি। যেমন : যখন ব্যাংকের কোনো গ্রাহক তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে অর্থায়ন চাইবে, তখন ব্যাংক তার মালিকানাধীন কোনো পণ্যকে উল্লিখিত গ্রাহকের কাছে বিক্রয় করে না; বরং সে বাজার থেকে উল্লিখিত পণ্য ক্রয়ের মুখাপেক্ষি হয়। সুতরাং ব্যাংক যদি তার কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে পণ্যটি ক্রয় করে, তাহলে সেটি গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজে উল্লিখিত পণ্যটি ক্রয় করে না। বরং তাওয়াররুককারীকেই নিজের প্রতিনিধি হিসাবে উল্লিখিত পণ্য ক্রয়ের ওকিল নির্ধারণ করে। এরপর তাওয়াররুককারী মূল চুক্তিকারী হিসাবে ব্যাংক থেকে বাকিতে ক্রয় করে তৃতীয় পক্ষের কাছে নগদে বিক্রয় করে দেয়। এ ক্ষেত্রে অনেক ব্যাংকের চলমান সাধারণ নিয়ম এই যে,

ব্যাংক আসল বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে না। বরং ক্রয়ের ওকিল হিসাবে তাওয়াররুককারীকেই মূল্য অর্পণ করে।

উল্লিখিত লেনদেন-পদ্ধতিতে ওকালতের সম্পর্কটি তাওয়াররুককারীর সঙ্গে হওয়ার কারণে লেনদেনটি সুদি লেনদেনের সঙ্গে সাদৃশ্যময় হয়ে গেছে। কেননা, তাওয়াররুককারী ব্যাংক থেকে কম অর্থ নিচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় আসলে তাকে বেশি অর্থ পরিশোধ করছে। যদিও তাওয়াররুককারীর অর্থ নেওয়ার বিষয়টি ক্রয়ের ওকিল হিসাবে হয়েছে, ঋণী হিসাবে হয়নি। কিন্তু শুধু এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি উল্লিখিত লেনদেনকে সুদি লেনদেন থেকে দূরে রাখতে সক্ষম নয়। আর এ ধরনের ওকালতের চুক্তি কখনো কখনো লেনদেনকে হারাম করে দেয় আবার কখনো মাকরুহে পরিণত করে।

সুতরাং তাওয়াররুককারী ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে পণ্যটি ক্রয় করার পর ব্যাংকের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে স্বতন্ত্র কোনো চুক্তি করা ছাড়া যদি নিজের জন্য ক্রয় করে নেয়, তাহলে এমন লেনদেন কোনোভাবেই জায়েজ হবে না। কারণ, ওকিল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আর দ্বিতীয় একটি কারণ হলো, পণ্যের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের ঝুঁকির বিষয়টি ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। তবে ক্রয়ের পর ওকিল যদি ব্যাংকের শরণাপন্ন হয় এবং ব্যাংকের সঙ্গে স্বতন্ত্র ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে উল্লিখিত লেনদেনটি বাতিল না হলেও মাকরুহ থেকে মুক্ত নয়। কারণ, এটি অনেকটা কৃত্রিম লেনদেনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং শরিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিটির জন্য আবশ্যক হলো এমন ওকালতের চুক্তি নির্ভর পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা। যেন তাওয়াররুক তার আসল পদ্ধতিতে ফিরে আসে।

## ৩. দ্বিতীয়বার বাজারে পণ্য বিক্রয় করার জন্য তাওয়াররুককারীর পক্ষ থেকে বিক্রেতাকে ওকিল বানানো

তাওয়াররুকের ক্ষেত্রে ওকালতের আরও একটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। সেটি হলো, তাওয়াররুককারী বিক্রেতা থেকে পণ্য ক্রয়ের পর পণ্যটি বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতাকেই ওকিল বানানো। যেমন : জায়েদ কোনো ব্যাংক থেকে অর্থায়ন চাইলো। এরপর ব্যাংক থেকে বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করলো। এরপর জায়েদ সেই ব্যাংককেই তার ক্রয়কৃত পণ্যকে বাজারে বিক্রয়ের ব্যাপারে ওকিল বানালো।

ব্যাংক তৃতীয় পক্ষের কাছে পণ্যটি নগদে বিক্রয় করার পর জায়েদকে সে মূল্য দিয়ে দিলো। তারপর ঋণের মেয়াদ শেষ হলে জায়েদ ব্যাংককে ঋণ পরিশোধ করলো। (শরয়ি দৃষ্টিতে এপদ্ধতিটি জায়েজ আছে কি না?)

এখন উল্লিখিত ওকালত-চুক্তি যদি প্রথম বিক্রয় চুক্তির মধ্যে এভাবে শর্ত করা হয়ে থাকে যে, জায়েদ এ শর্তে ব্যাংক থেকে পণ্য ক্রয় করলো যে, ব্যাংক তার ওকিল হিসাবে সেটিকে বাজারে বিক্রয় করে দেবে, তাহলে এমন চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। কারণ, এ বিক্রয় চুক্তিটি ওকালতের চুক্তির সঙ্গে শর্ত করে করা হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকিহের অভিমত অনুযায়ী এমন শর্তযুক্ত চুক্তি ফাসেদ। তবে বিক্রয় চুক্তিটি যদি উল্লিখিত শর্তমুক্ত হয়, এরপর জায়েদ স্বতন্ত্র চুক্তির মাধ্যমে ব্যাংককে তার পক্ষ থেকে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ওকিল নির্ধারণ করে, তাহলে লেনদেনটি ফাসেদ না হলেও মাকরুহ হবে। কেননা, এখানে ব্যাংক এমন ভূমিকায় উপনীত হচ্ছে যে, পণ্যের বিক্রেতা হিসাবে সে জায়েদকে কম অর্থ দিচ্ছে আর মেয়াদ শেষে তার থেকে বেশি অর্থ নিচ্ছে। যদিও অর্থ দেওয়া-নেওয়ার বিষয়টি ভিন্ন দুটি চুক্তি ও লেনদেনের মাধ্যমে হচ্ছে, যেটি উল্লিখিত লেনদেনকে সরাসরি সুদি লেনদেন থেকে দূরে রাখছে। কিন্তু এই সামান্য পার্থক্য সুদি অর্থায়নের লেনদেনের সঙ্গে সাদৃশ্য হতে দূরে রাখে না। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সুক্ষ্ম পার্থক্যটি শুধু কাগজের সাইনে সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তব পরিস্থিতিতে তার কার্যকরী কোনো ভূমিকা থাকে না।

## আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের মাধ্যমে তাওয়াররুক

অনেক ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংকগুলোর তাওয়াররুকের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেননা, এ মার্কেটগুলো সংক্ষেপে দ্রুত গতিতে অনেক বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করে থাকে। কম্পিউটারের মাধ্যমে মাত্র কয়েক মিনিটে হাজার হাজার লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

উল্লিখিত মার্কেটের মাধ্যমে তাওয়াররুকের কার্যক্রম সম্পন্ন পরার পদ্ধতি হলো। আন্তর্জাতিক মার্কেটের কোনো একজন দালালের সঙ্গে ব্যাংক এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, ব্যাংকের জন্য সে আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে পণ্য ক্রয় করবে। এরপর ব্যাংক তার কাছে বিক্রয় করার কথা জানালে সে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তৃতীয় কারও কাছে পণ্যটি বিক্রয় করে দেবে। সুতরাং যখন কোনো গ্রাহক তাওয়াররুকের

পদ্ধতিতে ব্যাংকের কাছে অর্থায়ন চায়, ব্যাংক তখন ওই দালালকে আন্তর্জাতিক মার্কেট থেকে পণ্য ক্রয় করতে বলে। এরপর ব্যাংক ওই পণ্যকে তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে অর্থায়নে আগ্রহী গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রয় করে। তারপর সে দালালকে তাওয়াররুককারীর পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মার্কেটে সে পণ্যটি নগদে বিক্রয় করতে বলে। এভাবেই তাওয়াররুককারী দ্রুত লেনদেনের মাধ্যমে নগদ অর্থ পেয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের মাধ্যমে তাওয়াররুকের কার্যক্রম নিচের পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

ব্যাংক দালালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে নগদ এক হাজার ডলারে কোনো পণ্য ক্রয় করলো। এরপর এগারোশো ডলারে তাওয়াররুককারীর কাছে পণ্যটি বাকিতে বিক্রয় করলো। তাওয়াররুককারী ওই দালালের মাধ্যমে অন্য আরেকজন ক্রেতার কাছে উল্লিখিত পণ্য নগদ এক হাজার ডলারে বিক্রয় করলো। সুতরাং এ পদ্ধতির মাধ্যমে তাওয়াররুককারী নগদ এক হাজার ডলার পেয়ে গেলো। আর বাকির মেয়াদ শেষ হলে সে ব্যাংককে এগারোশো ডলার পরিশোধ করবে।

এই কর্মপদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, শরয়ি দৃষ্টিতে এর কয়েকটি বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ। আর সে বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অত্যন্ত জরুরি।

ক. আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের অধিকাংশ লেনদেন এমন, যেগুলো আসলে কোনো বাস্তব ক্রয় বিক্রয় নয়। সেখানে ক্রেতার কাছে পণ্য হস্তান্তর করা হয় না। বরং কম্পিউটারের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে বহু বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করা হয়। এরপর উভয় রেটের মধ্যকার মূল্যের মধ্যে সমন্বয় করে লেনদেনের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এ লেনদেনের মধ্যে অনেক লেনদেন এমন আছে, যা ভবিষ্যতের বিক্রয় যা শরয়ি দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। আর কিছু আছে তাৎক্ষণিক বিক্রয় তবে সেগুলোতে পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া, অন্য পণ্য থেকে ভিন্ন থাকা, পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় ও কবজায় থাকাসহ আরও অনেক শরয়ি শর্তের প্রতি লক্ষ রাখা হয় না। বরং শুধু রশিদ লেনদেনের মাধ্যমেই বিক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আবার অধিকাংশ সময় এ রশিদগুলো কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরং রশিদ বাহকের জন্য এ অধিকার থাকে যে, রশিদে উল্লিখিত তার নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য সে গোডাউন

থেকে নিতে পারবে, যেখানে হাজার হাজার টন পণ্য রাখা হয়েছে। তার রশিদে যে পরিমাণ পণ্যের উল্লেখ আছে, সে পরিমাণকে অন্য পণ্য থেকে ভিন্ন করে রাখা হয় না। ফলে ক্রয়কৃত পণ্য (ভিন্ন না থাকার কারণে) তা ক্রেতার ঝুঁকিতে আসে না। আর ক্রেতা সে পণ্যকে কবজা করা বা নিজের দায়িত্বে নেওয়ার আগেই অন্যের কাছে বিক্রয় করে দেয়। ফলে সেখানে ঝুঁকির দায়িত্ব বহন ছাড়া লাভ অর্জনের বিষয়টি সামনে আসে। (শরিয়তে যেটি জায়েজ নেই।)

আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটে প্রকৃত শরয়ি লেনদেন হওয়া সম্ভব নয়। তবে সেখানে লেনদেনকারীরা যদি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে থেকে শরয়ি শর্তাবলি পালনে সচেষ্ট থাকে, তাহলে প্রকৃত শরয়ি লেনদেন সম্ভব হতে পারে। শরয়ি নিয়ন্ত্রণ কমিটি এবং সে মার্কেটে লেনদেনকারী সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে নতুন নীতিমালা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ছাড়া এমনটি করা সহজ হবে না। যাতে করে সেসব সদস্যবৃন্দ শরয়ি শর্তাবলি মানতে স্বচেষ্ট থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে যথার্থভাবে বাস্তবায়ন করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পণ্য-বাজারে তাওয়াররুক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে লেনদেন করা জায়েজ হবে না।

খ. আমরা যদি এ কথা মেনেও নিই যে, আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটের লেনদেনগুলোর সবগুলো পর্যায় যথার্থ সতর্কতার সঙ্গে পূর্ণ করা হয়, যাতে বাস্তবিক অর্থে শরয়ি শর্তাবলি পালনের মাধ্যমে সেখানে লেনদেন হয়। এরপর পূর্ববর্ণিত শর্তসাপেক্ষেই তাওয়াররুক করা হয় তারপরও সে ক্ষেত্রে, ব্যাংকের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের পর অন্য ক্রেতার কাছে বিক্রয় করার আগে সেটি অবশ্যই ক্রেতার কবজায় আসতে হবে। অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে সরাসরি কবজা পাওয়া যেতে হবে। কিংবা তার ওকিলের মাধ্যমে কবজা পাওয়া যেতে হবে। পণ্য কবজা করার জন্য এ ক্ষেত্রে তাওয়াররুককারীর পক্ষ থেকে ব্যাংকের জন্য তার ওকিল হওয়া জায়েজ নেই। কেননা, ব্যাংক নিজেই তো বিক্রেতা। সুতরাং তাকে অবশ্যই বিক্রীত পণ্যকে নিজ কবজা থেকে বের করে ক্রেতা বা তার এমন কোনো ওকিলের কাছে হস্তান্তর করতে হবে, যে বিক্রেতা ছাড়া অন্য কেউ হবে।

গ. আমরা যদি ধরে নিই যে, দালালই হলো ক্রেতার ওকিল। সে ক্রেতার ওকিল হিসাবে ব্যাংক থেকে পণ্যটি কবজা করার পর অন্য ক্রেতার কাছে বিক্রয় করছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, উল্লিখিত দালালই ব্যাংকের ওকিল ছিলো—ব্যাংকের ওকিল হিসাবে প্রথম বিক্রেতা থেকে সে পণ্যটি ক্রয় করে কবজা করেছে এবং তাওয়াররুককারীর কাছে বিক্রয় করেছে—ব্যাংকের ওকিল হওয়ার কারণে সে ব্যাংকের অবস্থানে রয়েছে। সুতরাং তার জন্য ক্রেতার পক্ষ থেকে ওকিল হওয়া জায়েজ হবে না।

উল্লিখিত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য এটি ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই যে, প্রথম বিক্রেতা থেকে ব্যাংক পণ্য ক্রয়ের পর তাওয়াররুককারীর দায়িত্বে ছেড়ে দেবে। এরপর যখন দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে, যা পণ্য কবজার হুকুমে তখন পণ্যটি ব্যাংকের দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যাবে। এরপর তাওয়াররুককারী এখন ব্যাংক বা দালালকে অন্যের কাছে উল্লিখিত পণ্য বিক্রয়ের ওকিল বানাতে পারে। এ ক্ষেত্রে তাওয়াররুককারী পণ্য ক্রয়ের সময়েই যদি ওকিল বানানোর শর্তারোপ করে, তাহলে চুক্তিটি ফাসেদ হবে। যেমনটি আগে উল্লেখ করেছি। আর ব্যাংক তার কাছে পণ্য হস্তান্তরের কার্যাবলি সম্পন্ন করার আগেই যদি ওকালতির চুক্তি করে, তাহলে সেটিও জায়েজ হবে না। কারণ, তখন পর্যন্ত পণ্যটি ব্যাংকের দায়িত্বে রয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারের এই দ্রুত বিক্রয় পদ্ধতি কার্যক্রমে এ ধরণের বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা খুবই কঠিন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, যে দালাল তাওয়াররুককারীর পক্ষ থেকে ওকিল হিসাবে পণ্য কবজা করার পর অন্য ক্রেতার কাছে বিক্রয় করবে আর যে দালাল ব্যাংকের পক্ষ থেকে ওকিল হয়ে পণ্য ক্রয় করবে। তারা দু-জন ভিন্ন ব্যক্তি হবে। একজন হবে ব্যাংকের ওকিল, আর অন্যজন হবে তাওয়াররুককারীর ওকিল। প্রথম পদ্ধতিতে একজন দালাল হওয়ার কারণে সব ধরনের আবশ্যকীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন যেহেতু কষ্টসাধ্য। বরং গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেও সেটির প্রকৃত বাস্তবায়ন হবে না বললেই চলে। বিধায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং শরিয়া নিয়ন্ত্রণ কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম পদ্ধতির অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না।

ঘ. আন্তর্জাতিক পণ্য বাজারের লেনদেনকে কম্পিউটার স্ক্রিনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা হয়। আর এখনো পর্যন্ত আমার কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি যে, কেবল কম্পিউটার স্ক্রিনে ক্রেতার নাম প্রকাশ পেলেই মালিকানা পরিবর্তন, কবজা পাওয়া এবং দায়িত্ব পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি সংঘটিত হয় কি না? সুতরাং কম্পিউটারের মাধ্যমে সংঘটিত লেনদেন জায়েজ বা না জায়েজ বলার আগে সে সম্পর্কে আইন ও প্রচলনের আলোকে স্বতন্ত্র গবেষণা করা জরুরি।

ঙ. ইতোপূর্বে যেসব শরয়ি শর্তের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলো কেবল চুক্তি সহিহ হওয়ার শর্ত ছিলো। তবে শরিয়ার নীতিগত দিক থেকে দেখলে আমরা এ বিষয়টি দেখতে পাই যে, ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে যেসব পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, সেগুলো ফকিহদের বর্ণিত সাদাসিধে পদ্ধতির ওপর নেই। সুতরাং তাওয়াররুকের সেসব সাদাসিধে পদ্ধতিই যদি অনুত্তম হয়ে থাকে, তাহলে এই বিদঘুটে পদ্ধতির ব্যাপারে কী ধারণা করা যায়? যার সঙ্গে এমন অনেক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে, যেগুলোতে শরয়ি শর্তাবলি বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন, বিশেষত, এই ধরনের দ্রুত লেনদেন।

অতএব, ব্যাংকিং কার্যক্রমে তাওয়াররুক পদ্ধতির পরিমাণ কমানোর প্রয়োজনীয়তা এবং মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন পর্যন্ত সেটি সীমিত রাখার ব্যাপারে আমরা যা কিছু বলেছি, সে কথাকেই এ বিষয়টি সমর্থন করে এবং এ লেনদেনকে সঠিকভাবে সম্পাদন করার জন্য তার আবশ্যকীয় শর্তাবলির বাস্তবায়নও জরুরি। যেন সেটি সুদের সব মন্দ প্রভাব ও পরিণতির সঙ্গে মিলে গিয়ে সুদের সঙ্গে সাদৃশ্যময় কর্মপদ্ধতিতে পরিণত না হয়ে যায়।

والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وهو المستعان وصلي الله علي نبينا الكريم وعلي أله وأصحابه أجمعين، وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

## আলোচনার সারকথা

১. তাওয়াররুক বলা হয়, ক্রেতা কর্তৃক (কোন জিনিস) বেশি মূল্যে বাকিতে ক্রয় করার পর সেটিকে কম মূল্যে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে নগদে বিক্রয় করা। যেন তার প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় হয়।

২. তাওয়াররুক ও বাইয়ে ইনার মধ্যে পার্থক্য হলো, তাওয়াররুককারী

পণ্যটিকে তৃতীয় ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করে। আর বায়ে ইনার ক্রেতা সেটিকে প্রথম বিক্রেতার কাছেই বিক্রয় করে।

৩. তাওয়াররুক পদ্ধতিতে বিক্রয় জায়েজের ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. থেকে দু-ধরনের অভিমত বর্ণিত আছে। তবে প্রসিদ্ধ অভিমত হলো সেটি জায়েজ। হাম্বালি মাজহাবের মুহাক্কিকগণ এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। তবে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও তার ছাত্র হাফেজ ইবনুল কইয়িম রহ. না জায়েজ হওয়ার অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

৪. শাফিয়ি মাজহাবের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের কাছে তাওয়াররুক পদ্ধতির লেনদেন জায়েজ আছে। কেননা, তারা স্পষ্ট ইনাহ্ পদ্ধতির লেনদেনকেই জায়েজ বলেছেন। সুতরাং তাওয়াররুকের ব্যাপারটি তো আরও উত্তমভাবে জায়েজ হবে।

৫. ইনাহ্ পদ্ধতির লেনদেন হারাম হওয়ার ব্যাপারে মালিকি মাজাহাবের আলেমগণ কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তবে ইনাহ্ লেনদেন বাস্তবায়নের জন্য তারা এই শর্তারোপ করেছেন যে, পণ্যটি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং পণ্যটি যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে না যায়, বরং তৃতীয় কারও কাছে সেটি বিক্রয় করা হয়, তাহলে হারাম হবে না।

৬. হানাফি মাজহাবের পরবর্তী ফকিহদের কেউ কেউ তাওয়াররুক পদ্ধতিকে ইনাহ্ সাব্যস্ত করে সেটি মাকরুহ্ হওয়ার কথা বলেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অভিমত হলো ইমাম ইবনুল হুমাম রহ.-এর অভিমত। আর সেটি হলো, পণ্যটি যদি প্রথম বিক্রেতার কাছে ফিরে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রটিই কেবল ইনাহ্ পদ্ধতি বলে গণ্য হবে। তবে ক্রেতা যদি পণ্যটিকে বাজারে (তৃতীয় কারও কাছে) বিক্রয় করে, তাহলে সেটি মাকরুহ্ হওয়া ছাড়াই জায়েজ। তবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা অনুত্তম।

৭. চার মাজহাবের অগ্রগণ্য অভিমত অনুযায়ী তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে লেনদেন করা জায়েজ। কিন্তু সেটি অপেক্ষা সুদহীন ঋণ দেওয়া উত্তম।

৮. জায়েজের এ বিধান সে পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ তার সঙ্গে অন্য কোনো সমস্যা সংযুক্ত না হবে।

৯. ব্যাংক যদি বাজার থেকে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে তাওয়াররুককারীকে ওকিল

নির্ধারণ করে এরপর ব্যাংক থেকে ক্রয়ের ক্ষেত্রেও সে নিজে ব্যাংকের ওকিল হয়, তাহলে এ পদ্ধতি জায়েজ নেই। কারণ, ওকিল বিক্রয়ের উভয় পক্ষের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তবে যদি শুধু ক্রয়ের ব্যাপারে তাকে ওকিল বানানো হয় এরপর স্বতন্ত্র প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে স্বতন্ত্র চুক্তি করে সে পণ্যটি ক্রয় করে, তাহলে এমন ক্রয়-চুক্তি সহিহ আছে কিন্তু সেটিও কারাহাতমুক্ত নয়।

১০. তাওয়াররুককারী যদি তৃতীয় পক্ষের কাছে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যাংককেই তার ওকিল বানায় আর এই ওকালতের চুক্তিটি মূল বিক্রয় চুক্তির মধ্যেই শর্ত করা হয়ে থাকে, তাহলে সে চুক্তিটি নাজায়েজ ও ফাসেদ হবে। তবে যদি মূল বিক্রয় চুক্তির মধ্যে ওকালতের চুক্তি না করা হয় বরং বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন করার পর স্বতন্ত্রভাবে ওকালতের চুক্তি করে থাকে, তাহলে চুক্তিটি সহিহ হবে তবে কারাহাত মুক্ত হবে না।

১১. অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পণ্য-মার্কেটে তাওয়াররুকের পদ্ধতিতে লেনদেন করার ক্ষেত্রে চুক্তি ফাসেদ হয়ে যায়। কারণ, শরিয়তের দৃষ্টিতে চুক্তি সহিহ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সেখানে পাওয়া যায় না।

১২. আলোচনায় উল্লিখিত সব শরয়ি শর্তাবলি পূর্ণাঙ্গরূপে পাওয়া গেলে যদিও চুক্তি সহিহ হয়ে যাবে। কিন্তু সম্ভাব্য সমস্যার দিকটি বিবেচনা করে এমন লেনদেনের ব্যাপক অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

# তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ও আবাসস্থলের হুকুম

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

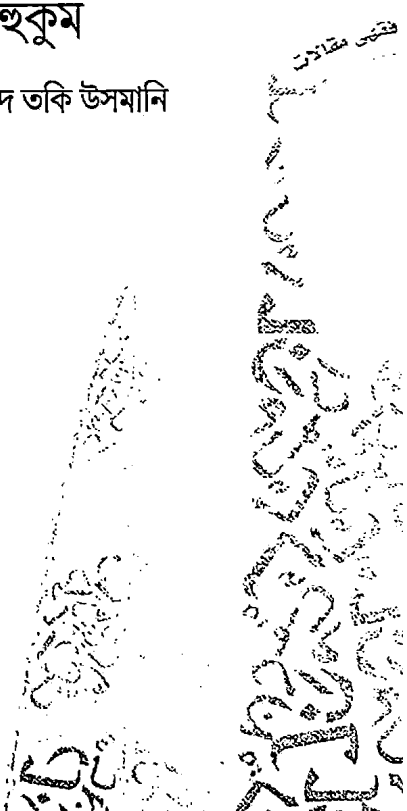

মাকালাটি 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমের' চতুর্থ খণ্ডে ছিলো। সেখানে তিনি এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ব্যাপক উপকারের লক্ষ্যে এখানে তার তরজমা পেশ করা হলো।

এ মাসআলাটিকে কেন্দ্র করে যেহেতু ফকিহদের মাঝে মতানৈক্য হয়েছে। ফলে মাওলানা মুহাম্মাদ তকি উসমানি 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিমে' তার বিশদ আলোচনা করেছেন। এখানে সে দীর্ঘ আলোচনার তরজমা পেশ করা হলো।

—মায়মান।

# তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ও আবাসস্থলের হুকুম।

এ কথার ওপর সব আলেম একমত যে, রজয়ি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ ও বাসস্থানের খরচ সরবরাহ করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব। অবশ্য বায়েন তালাকপ্রাপ্তার বিষয়ে আলেমদের তিনটি প্রসিদ্ধ অভিমত রয়েছে—

প্রথম অভিমত : এ অভিমতটি ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার সঙ্গীদের। তাদের দাবি হলো, বায়েনপ্রাপ্তা স্ত্রী সর্ববস্থায় ভরণপোষণ ও বাসস্থানের খরচ পাবে। চাই সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। একই অভিমত উমর ইবনু খত্তাব, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর। এবং ইমাম হাম্মাদ, ইমাম শুরাইহ, ইমাম নাখায়ি, ইমাম সাওরি, ইবনু শুবরুমাহ, জাসান ইবনু সলেহ এবং উসমান বাত্তি রহ. প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমদের অভিমতও এটি। সেই সঙ্গে ইবনু লাইলা রহ.-এরও একটি অভিমত অনুরূপ রয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত : ইমাম আহমাদ, ইমাম ইসহাক রহ. ও আহলে জাহেরদের। তাদের দাবি হলো, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা কোনো ধরনের ভরণপোষণ ও বাসস্থানের খরচ পাবে না। তবে গর্ভবতী হলে পাবে। হাসান বসরি, আমর ইবনু দিনার, আতা ইবনু রবাহ, ইকরামা ও ইমাম শাবি রহ. প্রমুখেরও একই অভিমত। ইবরাহিম ও ইবনু আবু লাইলা রহ. থেকেও এমন অভিমত বর্ণিত আছে।

তৃতীয় অভিমত : ইমাম শাফিয়ি ও মালিক রহ.-এর। তাদের দাবি হলো, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা সর্বাবস্থাতে বাসস্থানের খরচ পাবে। তবে ভরণপোষণ পাবে কেবল গর্ভবতী হলে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পাবে না। ইমাম আওজায়ি, লাইস ইবনু সাদ, আবদুর রহমান ইবনু মাহদি ও আবু ওবাইদ রহ. প্রমুখ আলেমদের অভিমতও এমনই। ইবনু আবি লাইলা রহ. থেকে অনুরূপ একটি অভিমত বর্ণিত আছে।[১০৬]

ভরণপোষণ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা না করার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদ ও ইসহাক রহ. ফাতেমা বিনতু কায়েস রা. -এর হাদিসের মাধ্যমে দলিল দিয়ে থাকেন। ভরণপোষণ ও বাসস্থানের খরচ ওয়াজিব না হওয়ার বিষয়ে হাদিসটিতে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে—

عن الشعبى قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله- صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة. فقالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السكنى والنفقة، قالت - فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة وأمرنى أن أعتد فى بيت ابن أم مكتوم رضى الله عنه.

'শাবি রহ. থেকে বর্ণিত, আমি একবার ফাতেমা বিনতু কায়েস রা.-এর কাছে গিয়ে তার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, তার স্বামী তাকে বায়েন তালাক দিলো। তিনি বলেন, ভরণপোষণ ও বাসস্থানের বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করলাম। কিন্তু আমার জন্য তিনি কোনো বাসস্থান বা ভরণপোষণের সিদ্ধান্ত দিলেন না। বরং আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন ইবনু উম্মে মাকতুমের বাড়িতে ইদ্দত পালন করি।'[১০৭]

ইমাম শাফিয়ি ও মালিক রহ.পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির মাধ্যমে তাদের পক্ষে দলিল দিয়ে থাকেন—

---

[১০৬] উমদাতুল কারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬১৯। আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস রহ. খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬৫। সুরা, তালাক।

[১০৭] মুসলিম, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : তিন তালাক প্রাপ্তা কোনো খরচ বা আবাসস্থান পাবে না। হাদিস : ৩৭৭৮।

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। তারা গর্ভবতী হলে তাদের জন্য ব্যয় করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে।'[১০৮]

আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তার জন্য শর্তহীনভাবে আবাসস্থান দেওয়ার কথা বলেছেন। আর খরচ দেওয়ার হুকুমটিকে গর্ভের সঙ্গে শর্তযুক্ত করেছেন। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কাছে 'মাফহুমে মুখালিফ' (বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য) দলিল বলে বিবেচ্য হয়। সুতরাং এই আয়াতের 'মাফহুমে মুখালিফ' থেকে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, তালাকপ্রাপ্তা যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকে, তাহলে সে খরচ পাবে না।

ইমাম আবু হানিফা রহ. নিজ মাজহাবের পক্ষে পবিত্র কুরআন, হাদিস, সাহাবিদের বক্তব্য এবং কিয়াসের আলোকে দলিল দিয়েছেন।

ক. মহান আল্লাহ বলেন—

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

'তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে বিধিমত সম্মানজনক ভরণপোষণ দেওয়া মুত্তাকিদের কর্তব্য।'

'আয়াতটিতে 'তালাক প্রাপ্তা' একটি ব্যাপক শব্দ। যার মধ্যে রজয়ি ও বায়েন উভয় তালাকপ্রাপ্তাই রয়েছে। আর 'মাতা' (مَتَاعٌ) শব্দটিও ব্যাপক। যার অধিনে ভরণপোষণ দুটিই রয়েছে। আল্লামা ইবনু জারির তবারি রহ. নিজ তাফসির গ্রন্থে বলেন—

يعني تعالي: ذكره بذلك ولمن طلق من النساء علي مطلقها من الأزواج متاع، يعني بذلك ما يستمتع به من ثياب و كسوة ونفقة أو خادم الخ.

'মহান আল্লাহ বর্ণিত শর্তের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, যেসব মহিলাদেরকে তাদের স্বামী তালাক দেবে সেসব স্বামীর ওপর স্ত্রীকে

[১০৮] সুরা তালাক, আয়াত : ৬।

ভরণপোষণ দেওয়া আবশ্যক। আর 'মাতা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাপড়-চোপড়, হাত খরচ বা খাদেম ইত্যাদি যার মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করা হয়।'

অধমের (লেখক আল্লামা তকি উসমানি) আরজি হলো, কখনো কখনো মনে হয় যে, উল্লিখিত আয়াতে نفقة-এর অর্থ একেবারেই স্পষ্ট। এ কথার স্বপক্ষে দলিল হলো এর আগের আয়াতটি—

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾

'তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে ইনতিকাল করে। তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বের না করে। আর তাদের এক বৎসরের ভরণপোষণের ওসিয়ত করে'[১০৯]

সকল আলেমের মতে আয়াতটির 'مَتَاعٌ' শব্দ দ্বারা আবাসস্থান ও ভরণপোষণ উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনু জারির রহ. দলিলস্বরূপ অনেক সাহাবি ও তাবেয়িদের বক্তব্য নকল করেছেন।

সুতরাং এটারও সম্ভাবনা আছে যে, যে মহিলার স্বামী মারা যায় তার ব্যাপারে মহান আল্লাহ হুকুম বর্ণনা করার পর তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্য (مَتَاعٌ)-এর হুকুম দিয়েছেন। কেননা, এখানে এ সংশয়েরও অবকাশ রয়েছে যে, আগের আয়াতের (مَتَاعٌ) (ভরণপোষণ)-এর হুকুমটি কেবল বিধবার মৃত স্বামীর সঙ্গে বিশেষিত। তাই মহান আল্লাহ সে সন্দেহকে দূর করে দিয়েছেন 'لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ' 'তালাকপ্রাপ্তারা ন্যায়সঙ্গত ভরণপোষণ পাবে' এ উক্তির মাধ্যমে।

খ. মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

'আর পিতার কর্তব্য হলো যথাবিধি সন্তানের (সন্তানের মায়ের) ভরণপোষণ দেওয়া।'[১১০]

---

[১০৯] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৪০।

[১১০] সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩৩।

ইতোপূর্বের বর্ণনাভঙ্গি থেকে এ কথা জানা যায় যে, হুকুমটি তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সেখানে তালাকের কথা বলা হয়েছে শর্তহীনভাবে। যেখানে রজয়ি বা বায়েন তালাকের মাঝে কোনো ধরনের পার্থক্য করা হয়নি।

গ. মহান আল্লাহ বলেন—

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। তারা গর্ভবতী হলে তাদের জন্য ব্যয় করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা সন্তান প্রসব করে।'[১১১]

ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. বলেন, এ আয়াতটি স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খরচ বহন করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে তিনভাবে ইঙ্গিত করে।

এক. বাসস্থানের অধিকার তালাকদাতার সম্পদের মধ্যে রয়েছে। যেটিকে মহান আল্লাহ স্বীয় বাণীর মাধ্যমে ওয়াজিব করেছেন। কারণ, আয়াতটি রজয়ি ও বায়েন উভয় ধরনের তালাকপ্রাপ্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এটি নফকা ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে। কেননা, বাসস্থানের দায়িত্ব তালাকদাতার সম্পদের মধ্যে। আর খরচটিও তার একটি অংশ বিশেষ।

দুই. দ্বিতীয় কারণ হলো—

মহান আল্লাহ বলেন, 'لَا تُضَارُّوهُنَّ' 'তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না।' আর এ কথাটি স্পষ্ট যে, বাসস্থান না পাওয়ার কারণে যেমন কষ্ট হয়, তেমনই খরচ না পাওয়ার কারণেও কষ্ট হয়। (বরং খরচ না দেওয়ার কারণে বেশি কষ্টের সম্মুখীন হয়।) যেমনটি ইমাম কুরতবি রহ. নিজ তাফসিরে বয়ান করেছেন।[১১২]

---

[১১১] সুরা তলাক, আয়াত : ৬।

[১১২] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ১৬৭।

তিন. তৃতীয় কারণ হলো,

> মহান আল্লাহ বলেন— 'لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ' 'তাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করো না।'

আর খরচ না দেওয়ার কারণেও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল্লামা মারদিনি রহ. 'আল-জাওয়াহিরুন নাকি' কিতাবে বলেন, যদি এমনটি বলা হয় যে, পবিত্র কুরআনের আয়াতে 'তাদের ওপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি' করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাসস্থানের সংকীর্ণতা। কেননা, স্থানের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা হয়ে থাকে। খরচের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা হয় না। এমন বক্তব্যের উত্তরে আমরা বলবো, এ আয়াতে সংকীর্ণতা থেকে স্থানের সংকীর্ণতা উদ্দেশ্য নিলে একই কথা দু-বার বলা আবশ্যক হয়। তার কারণ হলো, উপরের আয়াতে স্থানের সংকীর্ণতার আলোচনা করা হয়েছে। সেটি হলো— 'أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم' 'তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দাও, যেখানে তোমরা নিজেরা বাস করো।' আগে আমরা যে বক্তব্য দিয়েছি তার আলোকে দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয়। আর সেটি হলো, খরচ না দেওয়া সংকীর্ণতার আওতাভুক্ত। বাসস্থান না দেওয়া সংকীর্ণতার আওতাভুক্ত নয়। কেননা, বাসস্থান দিলে তালাকপ্রাপ্তার ওপর একই স্থানে থাকা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু তাকে যদি আবাসস্থান না দেওয়া হয়, তাহলে তালাকপ্রাপ্তার ইচ্ছে অনুযায়ী যেখানে মন চাইবে সেখানে থাকতে পারবে। সুতরাং আবাসস্থান না দেওয়ার ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তা বেশি স্বাধীনতা পাবে। কুদুরি গ্রন্থের প্রণেতা 'তাজরিদ' নামক কিতাবে এ কথাটি বলেছেন।[১১৩]

পবিত্র কুরআনে 'وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ' আয়াতটির মাধ্যমে দলিল দেওয়ার বিষয়টি হলো। হানাফিদের কাছে 'মাফহুমে মুখালিফ' দলিল নয়। যেমনটি তাদের মাজহাবে প্রমাণিত আছে। এ আলোচনার মধ্যে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে গর্ভবতীদের কথা এ কারণে উল্লেখ করেছেন যে, অনেক সময় গর্ভকাল দীর্ঘ হয়ে থাকে। তাই এই আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সেসব মানুষদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, গর্ভকাল দীর্ঘ হওয়াটা যেন গর্ভবতী মহিলার নফকার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে

[১১৩] আল-জাওয়াহিরুন নাকি, বাইহাকি কিতাবের টীকায় সংযুক্ত করে ছাপানো সংস্করণে। খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৭৭৬।

এ কথা বলা হয়েছে যে, বাচ্চা প্রসাব করা পর্যন্ত খরচ দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। সুতরাং আয়াতে 'গর্ভবতী' হওয়ার শর্তটি গর্ভহীনদেরকে বের করার জন্য নয়।

আমাদের এ কথার পক্ষে দলিল হলো, আয়াতটিতে রজয়ি ও বায়েন তালাকপ্রাপ্তা উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর রজয়ি তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কারও কোনো মতানৈক্য নেই। যদিও সে রজয়ি তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী না হোক। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ' وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ ' এ আয়াতটি রজয়ি তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। একইভাবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রেও সেটি অগ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. নিজ তাফসির গ্রন্থ আহকামুল কুরআনে এ আয়াতের নিচে কতই না সুন্দর কথা বলেছেন।

তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন—

﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

'তারা যদি গর্ভবতী হয়ে থাকে, তাহলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের পেছনে খরচ করো।'

আয়াতটি বায়েন ও রজয়ি তালাকপ্রাপ্তা উভয় শ্রেণিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এরপর এ বিধানটি দুই অবস্থা থেকে খালি নয়—

১. গর্ভের কারণে তাদের নফকা দেওয়া ওয়াজিব হচ্ছে।
২. স্বামীর ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে স্বামীর ওপর তাদের নফকা দেওয়া ওয়াজিব।

যেহেতু সকল ফকিহ এ কথার ওপর একমত যে, যে আয়াতের আলোকে রজয়ি তালাকপ্রাপ্তার জন্য নফকা দেওয়া ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে তা মূলত গর্ভের কারণে নয়, বরং স্বামীর ঘরে আবদ্ধ থাকার কারণে হয়েছে। সেহেতু এটাও স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা মহিলারও ঠিক একই কারণে নফকা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তার কারণ হলো, উল্লিখিত আয়াতের যে 'জমিরটি' (নাম পুরুষ) নফকার অধিকারী হওয়ার দলিল হয়, সেটি রজয়ি তালাকপ্রাপ্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব মহান

আল্লাহর এই বাণীটি 'فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ' তাদের জন্য খরচ করো।'এই ইল্লত বর্ণনার জন্য এসেছে যে, সেই তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর ঘরে আবদ্ধ। কেননা, যে 'জমির' (নাম পুরুষ) তার ওপর প্রমাণ বহণ করছে সেটি 'মানতুক বিহি'(স্পষ্ট বর্ণনা)-এর স্থলাভিষিক্ত।

অন্যভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, গর্ভবতীকে খরচ দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো গর্ভের কারণে সে খরচের অধিকারী হচ্ছে। অথবা স্বামীর বাড়িতে আবদ্ধ থাকার কারণে। গর্ভের কারণে যদি নফকা পাওয়ার অধিকারী বলে বিবেচিত হতো, তাহলে সেখানে এ বিষয়টি আবশ্যক হতো যে, গর্ভের বাচ্চার মালিকানায় কোনো সম্পদ অর্জিত হলে, সেটিকে তার পিছেই ব্যয় করতে হবে। যেমন : ছোটো বাচ্চার খরচ তার সম্পদ থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে। অথচ সকল ফকিহ এ কথার ওপর একমত পোষণ করেছেন যে, গর্ভের বাচ্চার মালিকানায় কোনো সম্পদ অর্জিত হলেও স্বামীর ওপর স্ত্রীর নফকা দেওয়া ওয়াজিব। গর্ভের বাচ্চার সম্পদ থেকে তার খরচ দেওয়া হবে না। এ মাসআলাটি এ কথার দলিল যে, তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীকে যে নফকা দেওয়া হয়, সেটির কারণ হলো, স্বামীর বাড়িতে তাকে আবদ্ধ করে রাখা।

তবে কেউ যদি এমন প্রশ্ন করে যে, তাহলে নফকা ওয়াজিব করার বর্ণনায় গর্ভবতীকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাঝে কী উপকারিতা রয়েছে? তার এমন প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেওয়া হবে যে, রজয়ি তালাকপ্রাপ্তা তো আগে থেকেই হুকুমের আওতাভুক্ত রয়েছে। আর গর্ভহীন মহিলার নফকা না দেওয়ার বিষয়ে কেউ অস্বীকৃতি জানায়নি। এমনিভাবে বায়েন তালাকপ্রাপ্তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। আর নফকা ওয়াজিব করার আলোচনায় 'حَمْل'-এর বর্ণনা এ কারণে করা হয়েছে যে, কখনো কখনো গর্ভের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে থাকে। আবার কমও হয়ে থাকে। সুতরাং حَمْل -এর কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে এ কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া হলো যে, হায়েজের সময়ের চেয়ে যদি গর্ভের সময়টি দীর্ঘ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী স্ত্রীর নফকা দেওয়া ওয়াজিব হবে।[১১৪]

---

[১১৪] ইলাউস সুনান, পরিচ্ছেদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা বাসস্থান ও নফকা পাবে। খণ্ড :

অধমের (লেখকের) আরেকটি আরজি হলো, উল্লিখিত আয়াতে বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নফকা দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার বিষয় প্রমাণ করতে চতুর্থ আরেকটি কারণও রয়েছে। আর সেটি হলো, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত কেরাত—

اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم.

'তোমরা যেখানে থাকো এমন জায়গায় তাদেরকে থাকতে দাও এবং তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তাদের খাতে খরচ করো।'[১১৫] এটি হলো এমন এক 'শাজ' কেরাত, যাকে খবরে ওয়াহেদের স্থানে রাখা যায় না।

ঘ. জাবের রা. থেকে সুনানে দারা কুতনিতে বর্ণিত আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

المطلقات ثلاثا لها السكني والنفقة

'তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা আবাসস্থান ও খরচ পাবে।'[১১৬]

ইলাউস সুনান গ্রন্থে আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানি রহ. বলেন, হাদিসটির কিছু বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও তাদের সবাই নির্ভরযোগ্য। আর ইমাম দারা কুতনি ও তার শায়খ ছাড়া বাকি সবাই মুসলিম শরিফের বর্ণনাকারী।[১১৭]

বর্ণিত হাদিসগুলোর বিষয়ে ইমাম জায়লায়ি রহ. শায়খ আবদুল হক রহ.-এর অভিযোগ নকল করেছেন যে, এ বর্ণনার একজন বর্ণনাকারী আবু জুবায়ের 'মুদাল্লিস' (যে বর্ণনাকারী তার শায়খের নাম বাদ দিয়ে বর্ণনা করে)। সুতরাং জাবের রা. থেকে সরাসরি শোনার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তার থেকে 'আন' (عن) শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা দলিলযোগ্য নয়। তাই ইমাম লাইস রহ. ছাড়া অন্য যারাই আবু জুবায়ের থেকে সরাসরি শোনা প্রমাণিত হওয়া ছাড়া বর্ণনা করবে, তাদের বর্ণনা দলিলযোগ্য হবে না। ইলাউস সুনান

---

১১, পৃষ্ঠা : ১০৪।

[১১৫] তাফসিরে রুহুল মায়ানি, সুরা তালাক, খণ্ড : ২৮, পৃষ্ঠা : ১৩৯।

[১১৬] সুনানে দারা কুতনি, অধ্যায় : তালাক, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২১। হাদিস : ৫৯।

[১১৭] ইলাউস সুনান, পরিচ্ছেদ : বায়েন তালাকপ্রাপ্তা আবাসস্থান ও নফকা পাবে। খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১০৪।

কিতাবে আল্লামা শিব্বির আহমাদ উসমানি রহ. এভাবে উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে, ইমাম মুসলিম রহ. আবু জুবায়ের থেকে 'আন' (عن) শব্দে একাধিক হাদিস বর্ণনা করেছেন। অথচ সেসব হাদিস ইমাম লাইসের সূত্রে বর্ণিত নয়।[১১৮] এখান থেকে বুঝা যায় যে, শায়খ আবদুল হক রহ. যে নীতি বর্ণনা করেছেন, সেটি ইমাম মুসলিম রহ.-এর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যথায় এমন সূত্রে তিনি হাদিস বর্ণনা করতেন না।

শায়খ আবদুল হক রহ. দ্বিতীয় যে প্রশ্ন করেছেন সেটি এই যে, হাদিসটিতে 'হরব ইবনু আবুল আলিয়া' নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। ফলে তার বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দলিল দেওয়া সহিহ নয়। কিন্তু হরব ইবনু আবুল আলিয়া' মুসলিম শরিফের বর্ণনাকারী। যেমনটি 'তাহজিবুত তাহজিব' এ উল্লেখ আছে।) তার ব্যাপারে সর্বোচ্চ এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে যে, সে বিতর্কিত বর্ণনাকারী। আর বিতর্কিত বর্ণনাকারীদের বর্ণিত হাদিস 'হাসান' পর্যায়ের নিচে হয় না। সুতরাং ইমাম মারদিনি রহ. বলেন, যদি এমন অভিযোগ করা হয় যে, ইমাম ইবনু মায়িন রহ. হরব ইবনু আবুল আলিয়াকে দুর্বল বর্ণনাকারী বলেছে, তাহলে আমরা বলবো যে, ইবনু মায়িন রহ.-এর উল্লিখিত বক্তব্যের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। যেমনটি ইমাম মাজি রহ. ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। আর ওবাইদুল্লাহ ইবনু উমর কওয়ারিরি রহ. হরব ইবনু আবুল আলিয়া নামক বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তার নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, ইমাম মুসলিম রহ. নিজ সহিহ গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন।[১১৯]

ঙ. ইমাম তহাবি রহ. তার শরহে মাআনিল আসার গ্রন্থে হাম্মাদ ইবনু সালমা আন হাম্মাদ আনিশ শাবি'-এর সূত্রে ফাতেমা বিনতু কায়েস থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, তার স্বামী তাকে তিন তালাক দিলে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১১৮] মুসলিম, অধ্যায় : হজ, পরিচ্ছেদ : ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ করা জায়েজ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৩৯। সেখানে একটি হাদিস এমন রয়েছে যে, মুআবিয়া ইবনু আম্মার আল-ওয়াহনি আন আবু জুবায়ের আন জাবের। এ সূত্রে একাধিক হাদিস রয়েছে। অথচ সে সূত্রে ইমাম লাইস নেই বা জাবের থেকে তার শোনার বিষয়ে স্পষ্ট কোনো প্রমাণ নেই।

[১১৯] আল-জাওহারুন নাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪৭৭। বাইহাকির টীকায় ছাপানো।

ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, কোনো আবাসস্থান ও নফকা পাবে না। এরপর উমর রা.-কে ফাতেমা বিনতু কায়েসের এ ঘটনাটি জানানোর পর তিনি বললেন—

لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لقول امرأة.. لعلها أوهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لها السكنى والنفقة.

'একজন মহিলার কথার ওপর নির্ভর করে আমরা কুরআনের আয়াত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে ছাড়তে পারি না। এমনটি হতে পারে যে, সে হয়তো কোনো সন্দেহের শিকার হয়েছে। আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, এমন মহিলা আবাসস্থান ও খরচ পাবে।'

কাজি ইবরাহিম ও আল্লামা ইবনু হাজম রহ. তার থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমনটি আল্লামা মারদিনি রহ. 'আল-জাওহারুন নাকি' কিতাবে বর্ণনা করেছেন। (কাজি ইসমাইলের সূত্রে যে বর্ণনা নকল করেছেন, সেটি বেশি স্পষ্ট।)

মোটকথা, উল্লিখিত হাদিসগুলো বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর ওপর আবাসস্থান ও খরচ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে একেবারেই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। ইবরাহিম নাখায়ি রহ. যদিও উমর রা.-এর যুগ পাননি। তারপরেও কেবল দুটি হাদিস ছাড়া তার সব মুরসাল হাদিস সহিহ-এর হুকুমে। আর বর্ণিত হাদিসটি এ দুটি হাদিসের মধ্য থেকে নয়। যেমনটি ইমাম মারদিনি রহ. ইবনু মায়িন রহ. থেকে নকল করেছেন এবং আল্লামা ইবনু আবদুল বার রহ. 'তামহিদ' কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম নাখায়ি রহ.-এর 'মুরসাল' হাদিসগুলো সহিহ। তিনি নিজ সূত্রে আমাশ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা ইমাম নাখায়ি রহ.-কে বললেন, আপনি হাদিস বর্ণনা করার সময় সূত্রসহ বর্ণনা করবেন। তাদের প্রস্তাবের উত্তরে ইমাম নাখায়ি রহ. বললেন, আমি যখন আবদুল্লাহ বলি, তখন বুঝবে যে, হাদিসটি একাধিক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত। আর তোমাদের সামনে হাদিস বর্ণনার সময় যখন কোনো বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করি, তখন যে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করি, তার

থেকেই সে হাদিসটি বর্ণিত। আবু উমর রহ. বলেন, এখান থেকে বুঝা যায় যে, ইবরাহিম নাখায়ি রহ.-এর 'মুরসাল' হাদিস 'মুসনাদ' হাদিস অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী।[১২০] অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, ইবরাহিম নাখায়ির সেই মুরসাল হাদিসগুলো, যেগুলো আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ও উমর রা. থেকে বর্ণিত সেগুলোর সবই সহিহ হাদিসের পর্যায়ে। সেইসঙ্গে তার বর্ণিত 'মুরসাল' হাদিসগুলো তার 'মুসনাদ' হাদিস অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী। ইয়াহইয়া আল কত্তান রহ. ও অন্যান্যরা এ অভিমতটি নকল করেছেন।[১২১]

১. আরও একটু সামনে মুসলিম শরিফের ৩৫৯৮ নম্বর হাদিসের অধিনে আবু আহমাদ (তিনিই হলেন আজ জুবায়রি) আম্মার ইবনু জুরাইক থেকে, তিনি আবু ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনু খত্তাব রা. ফাতেমা বিনতু কায়সের হাদিস শোনার পর বলেন—

لا نترك كتاب الله و سنة نبينا محمد صلى الله عليه و سلم لقول امراة، لا ندري لعلهاحفظت أو نسيت، لا السكني والنفقة.

'একজন মহিলার কথার ওপর নির্ভর করে আমরা আল্লাহর কিতাব এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকে পরিহার করতে পারি না। আমরা জানিনা যে, সে মহিলা বিষয়টি মনে রাখতে পেরেছে না কি ভুলে গেছে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা আবাসস্থান ও খরচ পাবে।'

এ বর্ণনাতে উমর ইবনু খত্তাব রা. স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, ফাতেমা বিনতু কায়স রা.-এর হাদিসটি কুরআন ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আর কুরআন ও হাদিসে এ বিধান রয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তা আবাসস্থান ও নফকা পাবে। উসুলে হাদিসে এ কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কোনো সাহাবি যদি বলে যে, 'সুন্নত হলো এমন' তাহলে সেটি মারফু হাদিসের পর্যায়ে হবে। এ বিষয়ে উমর রা.-এর কাছে কোনো মারফু হাদিস না থাকলে তিনি ফাতেমা বিনতু কয়েস রা.-এর হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করতেন না।

উল্লিখিত বর্ণনার বিষয়ে ইমাম বাইহাকি রহ. এ অভিযোগ করেছেন যে,

---

[১২০] আত-তামহিদ, পরিচ্ছেদ : তাদলিস ও কার বর্ণনা গ্রহণ করা হবে এবং কারটি হবে না। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭-২৮।

[১২১] আল-জাওহারুন নাকি।

উল্লিখিত হাদিসের সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু আদম, আম্মার ইবনু জুরাইক থেকে বর্ণনা করেছেন। এবং তারা তাতে 'আমাদের নবির সুন্নত'-এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। সুতরাং এ অংশটি আবু আহমাদ জুবায়েরের এককভাবে বাড়ানো। অথচ ইয়াহইয়া ইবনু আদম আবু আহমাদ জুবায়রির অপেক্ষা বেশি স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলো। আল্লামা মারদিনি রহ. এভাবে এ কথার উত্তর দিয়েছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনু আদম ও আবু আহমাদ জুবায়রির বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা, জুবায়রি তার বিরোধিতা করেনি। বরং সে এমন একটি অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেছেন, যেটিকে ইয়াহইয়া ইবনু আদম বর্ণনা করেনি। আর জুবায়রি রহ. হলেন ধীশক্তিমানদের ইমাম। তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার রহ. বলেন, 'জুবায়রি অপেক্ষা বেশি ধীশক্তিমান আমি আর কাউকে দেখিনি।' সুতরাং এই বর্ধিত অংশ একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে বাড়ানো বিধায় সেটি গ্রহণ করা ওয়াজিব।

তারপর জানার বিষয় হলো, জুবায়রি রহ. ওই বর্ধিত অংশের ব্যাপারে একক ব্যক্তি নন। বরং তার স্বপক্ষে নিচের সাক্ষীগুলো ও তাবেগুলো রয়েছে।

২. মুসলিম শরিফের একই পরিচ্ছেদে ৩৫৯৮ নম্বর হাদিসে এ ঘটনাটির বর্ণনা এভাবে এসেছে—

«احْمد بن عبدة الضبي حدثناابو داؤد سليمان بن معاذ عن أَبِي اسحاق»

এ সূত্রে আবু আহমাদ আম্মার ইবনু রজিকের হাদিস বর্ণনা করেন।

৩. ইমাম বাইহাকি রহ. আশআছ ইবনু সিওয়ারের বর্ণনা, عن الحكم وحماد عن ابراهيم عن الاسود عن عمر رضى الله عنه এ সূত্রে গ্রহণ করেছেন এবং সে বর্ণনাতে 'আমাদের নবির সুন্নত' বাক্য রয়েছে। অবশ্য ইমাম বাইহাকি রহ. এ বর্ণনার ওপর প্রশ্ন তুলেছেন যে, আশআছ ইবনু সিওয়ার একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তার প্রশ্নের উত্তর এই যে, আশআছের সূত্রটি অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমে সমর্থন পাওয়ার যোগ্য। এ কারণে আল্লামা আজালি ও ইবনু মায়িন রহ. তাকে নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। একইসঙ্গে ইবনু মায়িন রহ. তার সম্পর্কে বলেন, হাদিসের মূল বক্তব্যের বিষয়ে আশআছ ইবনু সিওয়ারের কোনো খারাবি দেখি না। অবশ্য অনেক সময় হাদিসের সূত্রে সে ভুল করে ফেলে। সে

ওইসব বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বর্ণনাকে ইমাম মুসলিম রহ. তার কিতাবে অন্য বর্ণনার সমর্থক হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[১২২]

৪. নিচের সূত্রে ইমাম বাইহাকি রহ. একটি বর্ণনা নকল করেছেন—

رواه الحسن بن عمار عن سلمة بن كهيل عن عبد بن خليل عن عمر رضي الله تعالى عنه.

সেখানে 'আমাদের নবির সুন্নত' বাক্য বিদ্যমান আছে। এ বর্ণনাতে ইমাম বাইহাকি রহ. এ অভিযোগ করেন যে, সেখানে হাসান ইবনু উমারাহ' নামক বর্ণনাকারী দুর্বল। হাসান ইবনু উমারার সমালোচনার বিষয়ে সবার জানা। কিন্তু তার সেসব বর্ণনার বিষয়ে দোষারোপ করা হয়, যেগুলোকে 'আল-হাকাম' থেকে বর্ণনা করেন। এ ছাড়া অন্যান্যদের থেকে তার যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো মুতাবআতের দরজা থেকে নিচে পড়ে যায় নি।

৫. মুছান্নিফ ইবনু আবু শাইবা রহ. তার 'মুছান্নাফে' এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন—

حدثنا جرير عن مغيرة، قال : ذكرت لابراهيم حديث فاطمة بنت قيس، فقالابراهيم : لاندع كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة.

ইবরাহিম রহ.-এর এ বক্তব্য ওকি সুফিয়ান থেকে আর সুফিয়ান সালামাহ ইবনু কুহাইল থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম আবদুর রাজ্জাক রহ. তার 'মুছান্নাফে' একই ধরনের বর্ণনা নকল করেছেন।[১২৩]

৬. মুছান্নিফ ইবনু আবি শাইবা রহ. তার 'মুছান্নাফে' এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন—

حدثنا وكيع، قال جعفر بن برقان : عن ميمون بن مهران قال: عمر : لا ندع كتاب ربناوسنة نبينا لقول امرأة.

মোটকথা, আবু আহমাদ জুবায়রি রহ.-এর বর্ণিত হাদিসের উল্লিখিত পাঁচটি সমর্থক হাদিস পাওয়া গেলো। আর তার প্রত্যেকটিতে কুরআন ও সুন্নাহর কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং কোনো দলিল ছাড়া কেবল ধারণার বশিভূত হয়ে

---

[১২২] মিজানুল ইতেদাল।

[১২৩] মুছান্নাফু আবদুর রাজ্জাক, পরিচ্ছেদ : গর্ভবতী মহিলার নফকা, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৪, হাদিস: ১২০২৭।

তার বর্ধিত অংশকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

চ. অনেক আসারের মাধ্যমে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাজহাবটি সমর্থিত। সুতরাং উমর রা., আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, জাবের ইবনু আবদুল্লাহ রা., ইবরাহিম নাখায়ি, ইমাম শাবি, ইমাম শুরাইহ রহ.-এর বক্তব্য দ্বারা সেটি সমর্থিত। যেমনটি মুছান্নাফে ইবনু আবি শাইবা রহ. তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। হাদিস বর্ণনার এক পর্যায়ে ৩৬০৬ নম্বর হাদিসে তিনি এই আসারটি বর্ণনা করেন।

عن عائشة رضي الله عنها انها قالت :ما لفاطمة خير ان تذكر هذا، قال :تعني قولًا لاسكني ولا نفقة.

'আয়শা রা. বলেন, ফাতেমা বিনতু কায়েসের বায়েন তালাকপ্রাপ্তার আবাসস্থান ও খরচ না পাওয়া বিষয়ক হাদিসটি বর্ণনা করা উচিত নয়।'

ইমাম বুখারি রহ. ওরওয়া থেকেও অনুরূপ আসার বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত বক্তব্যটি এরূপ—

عن عائشة انها قالت :ما لفاطمة الا تتقي الله، تعني في قولها لا سكني ولا نفقة.

'আয়শা রা. বলেন, ফাতেমার কী হলো যে, সে এ কথার—বায়েন তালাকপ্রাপ্তার জন্য আবাসস্থান ও নফকা কোনোটিই হবে না—ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছে না কেন? ইমাম তহাবি রহ. বর্ণনা করেন, একবার ফাতেমা বিনতু কায়েস ওই হাদিসটি বর্ণনা করেন। তখন উসামা ইবনু জায়েদ রা.-এর হাতে একটি লাঠি ছিলো। সেটিকে (অসন্তুষ্ট প্রকাশ করতে) তার দিকে ছুড়ে মারেন। সারকথা হলো, বর্ণিত সব হাদিস এ কথার বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, উল্লিখিত সাহাবিগণের অভিমত অনুযায়ী বায়েন তালাকপ্রাপ্তা আবাসস্থান ও নফকা পাবে। আর উমর রা. সাহাবিদের উপস্থিতিতে ফাতেমা বিনতু কায়েস রা.-এর হাদিসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং উপস্থিত সাহাবিদের কেউ উমর রা.-এর এ অসন্তুষ্টির প্রতিবাদ করেননি। সুতরাং সেখানে উপস্থিত সাহাবিগণ উমর রা.-এর বক্তব্যের প্রতিবাদ না করা এ কথাকে প্রমাণিত করে যে, তাদের মাজহাবও উমর রা.-এর মাজহাবের অনুরূপ।

বিভিন্ন হাদিসের সমষ্টি থেকে ফাতেমা বিনতু কায়েস রা.-এর বিষয়ে এমনটি জানা যায় যে, প্রকৃত অর্থে তিনি নিজ স্বামীর বাড়ি থেকে অন্যত্র যাওয়ার বিষয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন। কেননা, তার বাড়িটি ছিলো আতঙ্কজনক জায়গায়। আর এই মহিলা তার শশুর বাড়ির মানুষের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করতেন। এ কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের ওপর আমল করে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾

'তাদেরকে বাড়ি থেকে বের করা হবে না। তবে তারা যদি স্পষ্ট কোনো অশ্লীল কাজ করে, তাহলে বের করা হবে।'[১২৪]

অশ্লীলের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, বাড়ির মানুষদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা করা অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত।[১২৫]

আর তার খরচ বিষয়ক পরিচ্ছেদের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, তার স্বামী ওকিলের মাধ্যমে তার খরচের জন্য কিছু যব পাঠাতেন। কিন্তু তিনি সেটিকে নিজের জন্য কম মনে করে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং এমনটি হতে পারে যে, তার ফিরিয়ে দেওয়ার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগের চেয়ে বেশি নফকা দিতে নিষেধ করেছেন। যে কারণে সে মহিলা এমনটি মনে করেছিলো যে, বায়েন তালাকপ্রাপ্তা স্বামীর থেকে খরচ পায় না। আর উমর রা. সে মহিলার এমন ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখানে এমনটি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে যখন স্বামীর বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে চলে গেলো, তখন তাকে খরচ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কেননা, খরচ দেওয়া হয় স্বামীর বাড়িতে থাকার কারণে। তাই যখন স্বামীর বাড়িতে থাকলো না, তখন খরচও পেলো না। (মহান আল্লাহ ভালো জানেন।) পরবর্তী সময়ে আমি দেখতে পাই যে, ইমাম আবু বকর জাসসাস রহ. ফাতেমা বিনতু কায়েস রা.-এর হাদিসের ক্ষেত্রে সে ব্যাখ্যা করেছেন, যা আমি উল্লেখ করেছি। তিনি বলেন—

---

[১২৪] সুরা তালাক, আয়াত : ১।

[১২৫] মুছান্নিফ আবদুর রাজ্জাক, অধ্যায় : বিবাহ, পরিচ্ছেদ : অশ্লীল কাজ করা, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩২৩, হাদিস নং ১১০২২।

فلما كان سبب النفقة من جهتها كانت بمنزلة الناشزة، فسقتت نفقتهاوسكناها جميعا.

‘বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ফাতেমা বিনতু কায়েস রা.-এর পক্ষ থেকে হয়েছিলো। সুতরাং সে অবাধ্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাই তার জন্য আবাসস্থান ও খরচ উভয়টি রহিত হয়ে গেছে।[১২৬] মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

[১২৬] আহকামুল কুরআন, ইমাম জাসসাস রহ., সুরা তালাক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৫৬৭।

# ইজতিহাদ ও তার বাস্তবতা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'ইজতিহাদ ও তার বাস্তবতা'—এটি একটি তীক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ভাষণ। যা শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) জামেয়া দারুল উলুম করাচির 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের সামনে দিয়েছিলেন। যেটি মৌলবি মুহাম্মাদ জাকারিয়া খজদারি ও মৌলবি তাহের মাসউদ লিখেছেন। 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়েছে।'

২৯ সফর ১৯৩০ হিজরি (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ) বুধবার দিবসে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) জামেয়া দারুল উলুম করাচির 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের উদ্দেশে ইজতিহাদ বিষয়ে দূরদর্শি একটি ভাষণ দেন। যেখানে ভ্রান্ত দর্শন, ইজতিহাদের বাস্তবতা, ইজতিহাদ বিষয়ে মস্তিষ্কে আধুনিকতা ঢুকে পড়া এবং তার হৃদয়গ্রাহী সমাধান দিয়েছেন। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার উদ্দেশ্য এবং বর্তমান সময়ে হওয়া ইজতিহাদের বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর সারগর্ভ ও মূল্যবান আলোচনা করেছেন। 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ'-এর ছাত্র মৌলবি মুহাম্মাদ জাকারিয়া খুজদারি ও মৌলবি মুহাম্মাদ তাহের মাসউদ তা লিপিবদ্ধ করেন। সর্বসাধারণের উপকারার্থে বক্তব্যটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

—আবদুল্লাহ মায়মান

# বিষয় বস্তু নির্বাচন

'ইজতিহাদ এবং তার বাস্তবতাকে' এ কারণে আলোচ্যবিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছি যে, পশ্চিমা দর্শনের প্রভাবে আমাদের সমাজের বিভিন্ন আঙ্গিকে যেসব গোমরাহি ছড়িয়ে আছে, তার একটি মৌলিক কারণ ইজতিহাদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা। আপনারা বিভিন্ন শ্রেণির লোকদের পক্ষ থেকে, বিশেষত পশ্চিমা ধ্যানধারণায় প্রভাবিত লোকদের থেকে এই স্লোগান অনেক শুনেছেন। তারা এসব প্রচুর বলে বেড়ায়—আলেমগণ ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। আমাদের যুগে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সে কারণে ইজতিহাদের অনেক প্রয়োজন রয়েছে।

যেখানেই পশ্চিমাদের অপছন্দনীয় কোনো মাসআলা সামনে আসে, সেখানে তাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বলা হয়, এ বিষয়ে ইজতিহাদ করা দরকার। আলেমগণ ইজতিহাদ করছে না। এটি প্রচলিত একটি স্লোগান। যা বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে খুব শোনা যায়।

## উত্তরের প্রয়োজনীয়তা

আজকের আলোচনায় আমি প্রথমে এ কথা বলার ইচ্ছে করেছি যে, ইজতিহাদের বিষয়ে তাদের মস্তিষ্কে কী কী ভ্রান্তি বিরাজ করছে এবং তার সঠিক অবস্থা কী হবে? তাদের দাবি—ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে কোনো ইজতিহাদ চলবে না—স্লোগানের বিরুদ্ধে যদি বলা হয়, তাহলে এমন উত্তরে

তারা শান্ত হতে পারবে না। কারণ তারা ইজতিহাদের সঠিক পরিচয় সম্পর্কেই অজ্ঞ। সুতরাং অন্য কোনোভাবে তাদের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। এজন্য তাদের মস্তিষ্কে বদ্ধমূল ভ্রান্ত দর্শন প্রথমে দূর করা জরুরি।

## পশ্চিমা ভ্রান্ত ধারণা

### ১. কুরআন-হাদিসের ভাষ্যে ইজতিহাদ বৈধ

তাদের মস্তিষ্কে চেপে বসা প্রথম ভ্রান্ত ধারণাটি হলো, কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের বিপক্ষে নিজের বিবেককে ব্যবহার করে তার রহস্য ও উপকারীতার ভিত্তিতে হুকুমের পরিবর্তন করার নাম হলো ইজতিহাদ। সাধারণত যারা এমন বক্তব্য দেয়, তাদের মস্তিষ্কে এই চিন্তা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কুরআন-হাদিসের বিধান বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কোনো উপকারের প্রতি লক্ষ রেখে নাজিল হয়েছে। ওই বিষয়ে বর্তমানে আগের সে উপকারীতা পাওয়া যায় না বা তার বিপরীত কোনো উপকারীতা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং আমরা নিজেদের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেবো যে, বর্তমান সময়ের উপকারীতা কী? আগের হুকুমকে এই যুগের ওপর ঢালাওভাবে চাপিয়ে দেবো না। বরং বিধানে কোনো পরিবর্তন আনবো।

### ২. ইজতিহাদ দ্বারা কেবল শিথিলতা ও সহজতা উদ্দেশ্য

তাদের দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হলো, তারা মনে করে ইজতিহাদ দ্বারা সবসময় কোনো শিথিলতা বা সহজতার সুযোগ খোঁজা যাবে। কোনো জিনিসকে প্রথমে হারাম বা না জায়েজ মনে করা হতো, ইজতিহাদের ফলে এখন সেটিকে জায়েজ বা বৈধ মনে করা হবে। শরিয়তে কোনো কিছু নিষিদ্ধ ছিলো ইজতিহাদের মাধ্যমে সেটি নিষিদ্ধ না হওয়া উচিত। সুতরাং এমন প্রত্যেক জায়গায় ইজতিহাদের দাবি করা হয়, যেখানে কোনো ধরনের শিথিলতা, সহজতা ও বৈধতা চাওয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে তাদের কাছে যুগের পরিবর্তন এবং অবস্থার বিবর্তন অনুভূত হয় এবং তারা সেখানে ইজতিহাদের তাড়া করতে থাকে। কিন্তু কোথাও যদি অবস্থার পরিবর্তনের কারণে আগের রহস্য ও উপকারীতার বিপরীত কিছু ঘটে। অর্থাৎ অবস্থার পরিবর্তনের কারণে আগের রহস্য ও উপকারীতার ভিত্তিতে যেটি

বৈধ ছিলো, এখন যদি সেটি বৈধ না থাকে, তাহলে এমন ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োজনের বিষয়ে কোনো আওয়াজ তোলা হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ ইজতিহাদের প্রয়োজনীতার পক্ষে যারা আওয়াজ তোলে, তাদের থেকে আজ পর্যন্ত এমন আওয়াজ শোনা যায়নি যে, সফরে নামাজ সংক্ষিপ্ত করে পড়ার যে বিধান দেওয়া হয়েছে, সেটি ছিলো আগের যুগের সফরের বিধান। যেখানে উট বা ঘোড়ার পিঠে বা পায়ে হেঁটে সফর করা হতো। সেসব সফরে খুব বেশি কষ্ট হতো। আর আজ উড়োজাহাজের মাধ্যমে মানুষ এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যায়। ফার্স্টক্লাসে সফর করলে শুয়ে-ঘুমিয়ে সফর করতে পারে এবং গন্তব্যে পৌঁছে আরামের সঙ্গে হোটেলে অবস্থান নেয়। সুতরাং যেহেতু অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে, তাই বর্তমান সময়ে সফরে নামাজ সংক্ষিপ্ত পড়ার অনুমতি না থাকা উচিত। আজ পর্যন্ত কারও থেকে এ ব্যাপারে ইজতিহাদের দাবি শোনা যায়নি। কারণ, তাদের মস্তিষ্কে এ বিষয়টি চেপে বসেছে যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে কেবল সহজ কিছু হওয়া উচিত এবং অবৈধ কোনো কিছুর বৈধতাই পাওয়া উচিত। ইজতিহাদের মাধ্যমে আগের কোনো বৈধ বিষয়ের বৈধতা রহিত হয়ে গেলে এমন ইজতিহাদ থেকে তারা তাওবা করে। এমন ইজতিহাদের দিকে যেতে কেউ প্রস্তুত থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে এ সবকিছুর কারণ হলো, তাদের মস্তিষ্কে ইজতিহাদ প্রসঙ্গে সঠিক ধারণা নেই। এজন্য কোথাও ইজতিহাদের দাবি করার আগে জানা উচিতি—ইজতিহাদ শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, কীসের প্রেক্ষিতে এসেছে এবং তার উদ্দেশ্যই বা কী?

## ইজতিহাদ শব্দের উৎস

সবারই জানা সর্বপ্রথম ইজতিহাদ শব্দটি কোন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো মুআজ রা.-এর হাদিস—

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ » كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ » . قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللهِ . قَالَ » فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ » . قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ » فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِي كِتَابِ اللهِ » . قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلاَ آلُو . فَضَرَبَ رَسُولُ

اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ.

'মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ ইবনু জাবাল রা.-কে যখন গভর্নর, বিচারক, শিক্ষক ও মুফতি হিসাবে ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি মুআজ রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে ফায়সালা করবে? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কিতাবে যদি সমাধান না পাও, তাহলে কী করবে? উত্তরে তিনি বললেন, তাহলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহের মাধ্যমে। নবিজি সা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, যদি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ-এ সমাধান না পাও, তাহলে কী করবে? মুআজ রা. বললেন, আমি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে ইজতিহাদ করবো এবং এ ব্যাপারে কোনো ধরনের ত্রুটি করবো না। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সমর্থন করলেন এবং তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ لِمَا يُرْضَى رَسُوْلَ اللهِ.

'সব প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য। যিনি তার রাসুলের দূতকে এমন বিষয়ের তাওফিক দিয়েছেন, যার ওপর তাঁর রাসুল সন্তুষ্ট।'

## ইজতিহাদের ক্ষেত্র

এ হাদিস থেকে জানা গেলো যে, কেবল সেখানেই ইজতিহাদ হতে পারে, যেখানে কুরআন-হাদিসের কোনো বিধান পাওয়া যায় না। যেমনটি মুআজ ইবনু জাবাল রা. বলেছেন যে, এমন ক্ষেত্রেই আমি ইজতিহাদ করবো।

হাদিসের কোথাও তিনি এ কথা বলেননি যে, কোনো জায়েজ, ছাড় বা শিথিলতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইজতিহাদ করবো। বরং তিনি বলেছেন, সরাসরি কুরআন-হাদিসে যে হুকুম পাওয়া যাবে না, (কুরআন-হাদিসের আলোকে) নিজের জ্ঞানকে ব্যবহার করে (কেয়াসের মাধ্যমে অথবা মৌলিক উসুলকে সামনে রেখে) তার হুকুম জানার পূর্ণ চেষ্টা করবো।

এখন এমনটিও হতে পারে, যে মাসআলা বা বিষয়টির হুকুম তালাশ করা হচ্ছে

ইজতিহাদের মাধ্যমে সেটি জায়েজ প্রমাণিত হবে। আবার এমনও হতে পারে যে, সেটি না জায়েজ প্রমাণিত হবে। সুতরাং এ হাদিসটি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, ইজতিহাদের ক্ষেত্র সেটি, যেখানে কুরআন-হাদিস কোনো সমাধান দেয়নি।

## কুরআন-হাদিস স্পষ্ট হুকুম না দেওয়া ক্ষেত্রগুলো

দুটি ক্ষেত্রে কুরআন-হাদিস সুস্পষ্ট বক্তব্য দেয়নি। একটি হলো, হয়তো যে বিশেষ শাখার হুকুম তালাশ করা হচ্ছে, কুরআন-হাদিস একেবারেই তার আলোচনা করেনি। সুস্পষ্ট বক্তব্য না দেওয়ার দ্বিতীয় অর্থ হলো, সে মাসআলা বা শাখার আলোচনা করেছে। তবে যে শব্দে বা ভাষ্যে আলোচনা করেছে, সে শব্দ বা ভাষ্য সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট। ফলে সেটিকে একাধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে। অর্থাৎ আয়াতটি কোনো একটি ব্যাখ্যার বিষয়ে অকাট্য নয়; বরং বিভিন্নভাবে তার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

সুতরাং কুরআন-হাদিস স্পষ্ট হুকুম না দেওয়ার দুটি ক্ষেত্র নির্ধারন হলো। এ দুটিই হলো ইজতিহাদের ক্ষেত্র। যেখানে এ ক্ষেত্র দুটি পাওয়া যাবে না, সেখানে ইজতিহাদ করার সুযোগ নেই। ধরে নাও, কোনো মাসআলায় কুরআন-হাদিস একেবারেই স্পষ্টভাষা ও দ্ব্যর্থহীন শব্দে আলোচনা করেছে এবং সেখানে একাধিক ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনাও নেই, তাহলে এমন মাসআলা ইজতিহাদ ও তাকলিদ কোনোটিরই ক্ষেত্র নয়। তাকলিদ ও ইজতিহাদের প্রশ্ন সেখানেই আসবে যেখানে কুরআন-হাদিস স্পষ্ট হুকুম বর্ণনা থেকে নিরব অথবা তার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট বা অন্য দলিলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিংবা সেখানে একাধিক ব্যাখ্যার সুযোগ থাকবে, এমন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইমাম ইজতিহাদ করেন আর মুকাল্লিদ তাকলিদ করেন।

## কুরআন-হাদিসের অকাট্য বক্তব্যে ইজতিহাদ হতে পারে না

এ কারণে কোনো নস (কুরআন-হাদিসের ভাষ্য) যদি আকাট্য হয়, তাহলে এটি ইজতিহাদের ক্ষেত্রই নয়। ইজতিহাদের মূল উৎসস্বরূপ হাদিসটি থেকেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং অকাট্য বা সুস্পষ্ট নস থাকা সত্ত্বেও ইজতিহাদে প্রবৃত্ত হওয়া ইজতিহাদের উৎস-মুয়াজ রা.-এর হাদিস অনুযায়ী একেবারেই ভুল ও অগ্রহণযোগ্য। এ বাস্তবতাটি সামনে না থাকার কারণে অনেক সময় কুরআন-

হাদিসের বিপক্ষে ইজতিহাদ করা হয়। সুতরাং আমাদের এখানেও এ ধরনের ইজতিহাদ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অকাট্য নসের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনে শূকর হারাম হওয়ার হুকুম রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমা বিশ্বে সেটি সাধারণ খাবারে পরিণত হয়েছে। ফলে ইজতিহাদের দাবিদাররা বলে যে, শূকরের ব্যাপারেও ইজতিহাদ করা প্রয়োজন। এভাবে ইজতিহাদ করা হয়েছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে যেসব শূকর ছিলো, সেগুলো নাপাকির মধ্যে পড়ে থাকতো। পঁচা-দুর্গন্ধময় নাপাক খাবার খেতো। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে পালিত হতো। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছিলো। আর বর্তমান সময়ের শূকর উন্নত ফার্মে (Hygenic Forms) পালিত হয়। যেখানে খুব স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেগুলোকে প্রতিপালন করা হয়। সুতরাং সেগুলোকে যে কারণে হারাম করা হয়েছিলো বর্তমানে তা অনুপস্থিত।

তাদের এমন ইজতিহাদের প্রথম উত্তর তো এই যে, প্রকৃত অর্থে এটি তো ইজতিহাদের ক্ষেত্রই না। কেননা, সেটি হারাম হওয়ার হুকুমটি কুরআনে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়ত ইজতিহাদের এই উদ্দেশ্যকে কেউই গ্রহণ করেননি যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো ধরনের সহজতা ও শিথিলতা পাওয়া গেলেই সেটি ইজতিহাদ হয়ে যাবে। আর কুরআন-হাদিসের আলোকে যদি কোনো বিষয়ে বলা হয় যে, এটি না জায়েজ বা অমুক কাজটি নিষিদ্ধ, তাহলে সেখানে বলা যে, এখানে তো ইজতিহাদই হয়নি। এ বিষয় দুটি ঐ ভ্রান্ত বুঝের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, যা আমি উল্লেখ করলাম।

প্রথমত বুঝতে হবে যে, মুআজ ইবনু জাবাল রা.-এর হাদিস থেকে ইজতিহাদের যে মর্ম বুঝা যায় তা হলো, যে বিষয়ে কুরআন-হাদিস সরাসরি বিধান বর্ণনা না করে নিরব থাকবে, কেবল সেখানে ইজতিহাদের প্রয়োজন হবে।

## ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার অর্থ

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, ইসলামি ফিকহে ইজতিহাদের অনেক প্রকার রয়েছে। যেমন : ইজতিহাদে মুতলাক (মৌলিক ইজতিহাদ), ইজতিহাদ ফিল মাজহাব (নির্দিষ্ট মাজহাবে বর্ণিত মাসআলা নিয়ে ইজতিহাদ), ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল (সুনির্দিষ্ট কোনো মাসআলার ওপর ইজতিহাদ)। এমনিভাবে কোনো মাসআলার উৎস নির্ধারণে, একই বিষয়ের একাধিক মাসআলার কোনোটিকে অন্যটির ওপর

প্রধান্য দিতে, তার কোনোটিকে সহিহ সাব্যস্ত করতে এবং তার মধ্য থেকে ভুল-শুদ্ধ নির্ণয় করতে ইজতিহাদ করা। যারা কথায় কথায় ইজতিহাদের স্লোগান দেন, তাদের সামনে ইজতিহাদের এসব স্তরগুলো নেই। বরং তাদের মস্তিষ্কে ইজতিহাদের সে চিত্রই বদ্ধমূল হয়ে আছে, যার উল্লেখ আমি করেছি।

সুতরাং তাদের সামনে যখন বলা হয় যে, ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের মাথায় তখন এটিই উদয় হয় যে, আলেমগণ সর্বপ্রকার ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। তারা আরও দাবি করে যে, আলেমগণ বলেছেন, হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পর কোনো প্রকার ইজতিহাদ হতে পারে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পরে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে বলে যে কথা বলা হয়েছে—প্রথমত তার অর্থ এটি নয় যে, বর্তমান সময়ে শরিয়তের নতুন হুকুম এসে গেছে যে, হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পর আর কোনো মুজতাহিদের জন্ম হবে না। অথবা এমনও নয় যে, যুক্তির নিরিখে মুজতাহিদের জন্ম হওয়া অসম্ভব। বরং সে কথার উদ্দেশ্য ছিলো, ইজতিহাদ করার জন্য যেসব শর্ত ও গুনাবলি থাকা আবশ্যক, বর্তমানে সেগুলো পাওয়া যায় না।

তারপরও যদি মেনে নেওয়া হয় যে, এমন গুনের অধিকারী কারও জন্ম হলো, তাহলে এটি তো যুক্তির নিরিখে বা শরিয়তের দৃষ্টিতে অসম্ভব না; কিন্তু বর্তমানে কোনো মুজতাহিদের জন্ম হতে পারবে না—এটি বাস্তবতা, শরিয়তের কোনো বিধান নয়। বরং বাস্তব অবস্থা হলো, ইজতিহাদের সব শর্তের অধিকারী কোনো মানুষের জন্ম হচ্ছে না। তবে যদি এমন কারও জন্ম হয়ে যায়, তাহলে শরয়ি দৃষ্টিতে বা যুক্তির নিরিখে তা অসম্ভব নয়। হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতেও মুজতাহিদের জন্ম হবে। একটি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَثَلُ أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره

> ‘আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত হলো বৃষ্টির মতো। যার ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে, তার শুরুর অংশ উত্তম ছিলো; না কি শেষ অংশ উত্তম হবে।’

উম্মতের শেষ অংশ সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে, তাদের মাঝে ইমাম মাহদি আ. আসবেন এবং ইসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এখন দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এ কথা বলার

কোনো সুযোগ নেই—হিজরি চতুর্থ শতাব্দিতে যেহেতু ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং তাদের জন্য ইজতিহাদের অনুমতি নেই। প্রথম কথা হলো, দরজাতে এ কারণে তালা লাগানো হয়েছে যে, সেখানে প্রবেশের মতো কেউ নেই। তবে কেউ যদি সব শর্তের অধিকারী হয়ে সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে বিবেক ও শরিয়ত কোনোটির দৃষ্টিতেই তা নিষিদ্ধ হবে না।

## শুধু ইজতিহাদে মুতলাকের দরজা বন্ধ হয়েছে

দ্বিতীয় বিষয় হলো, হিজরি চতুর্থ শতাব্দীর পর আর কোনো মুজতাহিদের জন্ম হয়নি বলে যে কথা বলা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে এটি ইজতিহাদে মুতলাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বর্তমান সময়ে এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যার সম্পর্কে বলা যায় যে, সে মুজতাহিদে মুতলাক। কিন্তু এর পরবর্তী যেসব স্তর রয়েছে, সেটি ইজতিহাদ ফিল মাজহাব, ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল, তাখরিজে মাসায়েল বা তারজিহে মাসায়েল যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন পরবর্তী সময়ে এসব শ্রেণির মধ্যে ইজতিহাদ করার মতো ব্যক্তি বিদ্যমান ছিলো এবং হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পরেও তারা এসেছেন। আল্লামা ইবনু আবিদিন শামি রহ. আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ফিল মাজহাব। (بلغ مرتبة الاجتهاد) তার এ বক্তব্যে ইজতিহাদে মুতলাক উদ্দেশ্য না। বরং ইজতিহাদ ফিল মাজহাব বা ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনুল হুমাম রহ. অনেক পরের লোক হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে। আমাদের আকাবিরদের মধ্য থেকে অনেক আলেম বলেন, মাওলানা আবদুল হাই লাখনোবি রহ. ইজতিহাদের স্তরে পৌঁছেছিলেন। শাহ ওলিউল্লাহ রহ. তো এ মর্যাদাতেই উন্নীত ছিলেন।

আমাদের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে যে, বর্তমান সময়ে ইজতিহাদ হতে পারে না, সেটি স্পষ্টতই ইজতিহাদে মুতলাকের ক্ষেত্রে। ইজতিহাদে মুতলাকের ব্যাপারে কথাটি একেবারে স্পষ্ট। কেননা, হিজরি চতুর্থ শতাব্দি থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তি আসেননি, যিনি পবিত্রতা থেকে মিরাছ পর্যন্ত সব মাসআলাতে চার ইমামের মতো মাজহাব প্রতিষ্ঠা করতে পারেছেন। যদিও অনেকে এমনটি করতে পারার দাবি করেছেন। তবে কেউ পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গরূপে এমনটি করে দেখাতে পারেননি।

এখন কেউ যদি বলে অমুক মাসআলাতে আমার সিদ্ধান্ত এমন। অর্থাৎ, কোনো

মাসআলাতে পরিপূর্ণ গবেষণা ও বিশ্লেষণ এবং ইজতিহাদ, ইস্তিম্বাতের সব ধরনের যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর পরে সে তার নিজস্ব অভিমত উপস্থাপন করে, তাহলে সে তো কেবল একটি মাসআলার ব্যাপারে বক্তব্য দিলো। বাকি সব মাসআলার কী সমাধান হবে?

মোটকথা, হিজরি চতুর্থ শতাব্দির পরে ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে গেছে—দাবিটি একটি সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত বিষয়। পরবর্তী সময়ে এমন কোনো ব্যক্তির জন্ম হয়নি, আর কেউ যদি এসেও থাকে, তাহলে উম্মত তাকে মুজতাহিদ এবং ইমাম হিসাবে গ্রহণ করেনি।

## শাখাগত ইজতিহাদ

ইজতিহাদের পরবর্তী প্রকারগুলো চতুর্থ হিজরি শতকের পরেও ছিলো। বিশেষত তার এমন দুটি প্রকার রয়েছে, যা বর্তমান যুগেও বিদ্যমান। একটি হলো ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল। আর দ্বিতীয়টি হলো ইজতিহাদে জুজয়ি (শাখাগত ইজতিহাদ)। ইজতিহাদ ফিল মাসায়েলের উদ্দেশ্য হলো, যে মাসআলার বিষয়ে ফিকহের কিতাবে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই এবং মাজহাব প্রণেতাদের পক্ষ থেকেও সে ব্যাপারে কোনো হুকুম বর্ণিত নেই। (এমন মাসআলাকে নাওয়াজেলও বলা হয়।) এমন মাসআলার ক্ষেত্রে ইমামদের বর্ণনাকৃত মূলনীতির আলোকে এই নতুন মাসআলার হুকুম জানা। এর নাম ইজতিহাদ ফিল মাসায়েল। যা আজ অবধি চালু আছে। একইভাবে যেসব মাসআলার বিষয়ে ফিকহের গ্রন্থাবলিতে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই, সে মাসআলার বিষয়ে জারিকৃত ফতোয়া প্রকৃত অর্থে ইজতিহাদ ফিল মাসায়েলের অন্তর্ভুক্ত।

এ বিষয়টি উসুলে ফিকহের সব কিতাবে উল্লেখ আছে এবং স্পষ্টভাবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, শাখাগত মাসআলায়ও কি ইজতিহাদ হতে পারে? কিছু আলেমের অভিমত হলো, শাখাগত মাসআলায় ইজতিহাদ হতে পারে না। ইজতিহাদ শুধু মৌলিক বিষয়েই হতে হবে। যে ব্যক্তি ফিকহের সব মাসআলাতে ইজতিহাদ করবে, কেবল তার ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে উসুলবিদগণ এমন অভিমত গ্রহণ করেননি। তারা বলেন, শাখাগত মাসআলাতেও ইজতিহাদ হতে পারে। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, কেউ কোনো একটি মাসআলাতে ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করলো কিন্তু অন্যান্য মাসআলাতে সে যোগ্যতা

অর্জন করতে পারলো না। আজ পর্যন্ত এমন শাখাগত ইজতিহাদ চালু রয়েছে।

সুতরাং এমন দাবি করা যে, আলেমগণ ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে—এটিও ইজতিহাদের বাস্তবতা না বুঝার ফল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দরজা খুলেছেন, কে আছে সেটিকে বন্ধ করবে? ইজতিহাদের দরজা বন্ধ করা হয়নি; বরং তাতে প্রবেশকারী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কথা ইজতিহাদে মুতলাকে প্রবেশকারীর বিষয়ে। অবশ্য ইজতিহাদের বাকি প্রকারগুলো পরবর্তী সময়ে চালু রয়েছে এবং তার কিছু প্রকার তো আজও চালু আছে।

## যুগের পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তনের উদ্দেশ্য

তৃতীয় যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হলো, বর্তমানে বলা হচ্ছে, যুগ পরিবর্তন হয়েছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে হুকুমের পরিবর্তন হওয়া উচিত। সেইসঙ্গে নিচের কথাদুটিও খুব বলা হয়—الاحكام تغير بتغير الزمان। 'যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তন হবে।'

এবং الفتوي تتغير بتغير الزمان 'যুগের পরিবর্তনে ফতোয়া পরিবর্তন হয়।' আমাদের ফকিহগণই এ কথা লিখেছেন। কিন্তু আমি যে লোকদের কথা আলোচনা করছি তারা এটিকে ইজতিহাদের ঐ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন শুরুতে যার আলোচনা আমি করেছি। সেটির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তারা বলেন, যুগের পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যুগের পরিবর্তনের ফলে যদি হেকমত ও উপকারিতা পরিবর্তন হয়ে যায়, (তাদের ধারণা এ অবস্থাতে) হুকুমের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হওয়া উচিত। এখানে বুঝার বিষয় হলো, হুকুমে যে পরিবর্তন আসে, সেটি ইল্লতের পরিবর্তনের কারণে আসে। হেকমত বা উপকারিতার পরিবর্তনের কারণে নয়। যে জিনিসকে শরিয়ত কোনো হুকুমের ইল্লত সাব্যস্ত করেছে, তার পরিবর্তনের কারণে হুকুমে পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ কোথাও যদি শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত ইল্লতের অনুপস্থিতি ঘটে, তাহলে অবশ্যই হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু যদি উল্লিখিত ইল্লত বাকি থাকে এবং শুধু আমাদের চিন্তা ও ধারণা মতে তার হেকমত না পাওয়া যায়, তাহলে সে কারণে হুকুমে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

## হুকুমের ভিত্তি ইল্লত, হেকমত নয়

মূলনীতি হলো, হুকুমের ভিত্তি ইল্লতের ওপর হয়। হেকমতের ওপর নয়। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ভ্রান্তির জন্ম হয়। যারা ইজতিহাদের দাবি করে, তাদেরও একই অবস্থা। তারা হেকমতকে ইল্লত সাব্যস্ত করে। এ কারণেই তারা বলে, হুকুম পরিবর্তন হয়ে গেছে।

## একটি বাস্তব উদাহরণ

বর্ণিত নীতিটির ফিকহি উদাহরণ দেওয়ার আগে একটি বাস্তবিক উদাহরণ দিচ্ছি। কেননা, অনেক সময় ফিকহি উদাহরণে ইল্লত ও হেকমতের পার্থক্য বুঝা কঠিন হয়ে যায় এবং সাধারণ মানুষ ইল্লত ও হেকমতের পার্থক্য বুঝতে পারে না। এ কারণে একটি বাস্তবিক উদাহরণ দিচ্ছি, যেন এ দুটির পার্থক্য বুঝা যায়—

আমরা যখন গাড়ি চালাই তখন দেখি চৌরাস্তায় সিগন্যাল লাগানো থাকে। আইন হলো, লাল বাতি জ্বললে গাড়ি থামিয়ে দাও। সে সময়ে গাড়ি চালানো নিষেধ। আর সবুজ বাতি জ্বললে গাড়ি চালাবে। এখন গাড়ি চালানো বৈধ। লাল বাতি জ্বলাবস্থায় থেমে যাওয়া হলো হুকুম। লাল বাতি জ্বলা এই হুকুমের ইল্লত। আর দূর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা হলো হেকমত। এখন থেমে যাওয়ার যে হুকুম সেটির মুলভিত্তি কি লাল বাতি জ্বলার ওপর না কি দূর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকার ওপর? ধরে নিন, আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন। ফাকা রাস্তা পড়ে আছে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে না। এদিকে লাল বাতি জ্বলছে—এমন সময় থেমে যাওয়ার হুকুম কার্যকরী হবে কি না? স্পষ্ট কথা যে, হুকুম কার্যকরী হবে। অথচ তখন থেমে যাওয়ার হুকুমটি অনর্থক মনে হচ্ছে এবং থেমে থাকার কারণে সময়ের অপচয় হচ্ছে। কেননা, অ্যাকসিডেন্টের কোনো আশঙ্কা নেই। সোজা পথে চললে কোনো গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না। কিন্তু তারপরও থামতে হচ্ছে। কেন থামতে হচ্ছে? কারণ ইল্লত বিদ্যমান আছে। যদিও হেকমত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বুঝা যাচ্ছে যে, হুকুমের মূলভিত্তি ইল্লতের ওপর। হেকমতের ওপর নয়।

যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহলে রাস্তা ফাকা হওয়া সত্ত্বেও লাল বাতি জ্বললে থেমে যাওয়ার মধ্যে হেকমত রয়েছে। তা হলো, প্রত্যেককে যদি এই স্বাধীনতা দেওয়া হয় যে, অ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা আছে কি না এ ব্যাপারে তুমি নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। যদি অ্যাকসিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে, থেমে যাও। আর

আশঙ্কা না থাকলে গাড়ি চালিয়ে যাও। সবাইকে যদি এমন স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। যুদ্ধ বেধে যাবে। কেননা, প্রত্যেকে তার ইচ্ছে অনুযায়ী সে স্বাধীনতা ব্যবহার করবে। ফলে লাল বাতি লাগানোর উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এটি একটি সহজ উদাহরণ। যার মাধ্যমে এ কথাটি খুব ভালোভাবে বুঝা যায় যে, শরিয়তেও হুকুমের মূলভিত্তি হলো ইল্লত। হিকমত নয়।

## ইল্লতের অর্থ

ইল্লতের অর্থ হলো, এমন গুন বা আলামত শরিয়ত যার ওপর কোনো হুকুমের ভিত্তি রেখেছে।

## ইল্লতের ওপর হুকুমের মূলভিত্তি হওয়ার প্রথম ফিকহি উদাহরণ

ফিকহি উদাহরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে সে উদাহরণটি দেবো, যা শুরুতে উল্লেখ করেছি। সেটি হলো, নামাজ কসর করার ইল্লত সাব্যস্ত করা হয়েছে সফরকে। আর হেকমত হলো কষ্ট থেকে বাঁচানো। এখন হুকুমের মূলভিত্তি হলো সফর। সফর হলে কসরও করতে হবে। চাই সফরে কষ্ট না হোক। যেমন : বিমানের প্রথম শ্রেণিতে সফর হচ্ছে এবং হোটেলে অবস্থান করা হচ্ছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এমন সফরে কোনো কষ্ট হয় না। সুতরাং এখানে হেকমত পাওয়া যাচ্ছে না। বরং অনেক সময় আমাদের মতো মানুষ যারা এখানে থাকা অবস্থায় খুব বেশি ব্যস্ত থাকে এবং নামাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো আদায় করা যথেষ্ট কঠিন হয়। কিন্তু আমরা যখন সফরে যাই এবং সে সম্পর্কে কারও জানা না থাকে তখন সফরের মধ্যে আমি এতো বেশি সময় পাই যে, একাগ্রচিত্তে নফল নামাজ ও তেলাওয়াত সব কিছু হতে থাকে। এমন সফরে কোনো কষ্ট হয় না। কিন্তু তাতে হুকুমে কোনো পরিবর্তন আসে না। কেননা, মূল ইল্লত সফর পাওয়া গেছে। সব শরয়ি বিধানের ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম হবে।

## দ্বিতীয় উদাহরণ

পবিত্র কুরআনে মদ হারাম হওয়ার হেকমত বর্ণনা করা হয়েছে—

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾

> 'শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায়।'[১২৭]

বর্তমানে কেউ এ দাবি করতে পারে যে, এখনকার মদের মাধ্যমে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না। বরং বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে—নেশা সুস্থতা এনে দেয়। নেশা প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে। সুতরাং তাতে কী আর ক্ষতি হবে? তার মাধ্যমে তো বন্ধুত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং কেউ যদি বলে যে, এখানে তো কোনো শত্রুতা বা বিদ্বেষ পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং মদ হারাম হওয়ার হুকুম শেষ হয়ে গেছে। এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সেটি হেকমত। ইল্লত নয়। তাহলে তার ইল্লত কী?

## মদ হারাম হওয়ার ইল্লত নেশা নয়, বরং মদ হওয়াটিই ইল্লত

মদ হারাম হওয়ার আসল ইল্লত সেটি নয়, মান্তেকের কিতাবে আমরা যা পড়েছি। অর্থাৎ, নেশা হওয়া মদ হারাম হওয়ার ইল্লত নয়। নেশা হওয়াই যদি ইল্লত হতো, তাহলে নেশা না হওয়া পরিমাণ মদ পান করা জায়েজ হতো। কারণ, নেশা পাওয়া যাচ্ছে না। আর বর্তমানে মদপানে অভ্যস্ত অধিকাংশ লোকের প্রকৃত অর্থে নেশা হয় না। বাস্তবে মদ হারাম হওয়ার ইল্লত নেশা নয়। বরং মদ হারাম হওয়ার ইল্লত হলো সেটি মদ হওয়া।

মদ হওয়াটি স্বয়ং ইল্লত। যেখানেই মদের বাস্তবতা পাওয়া যাবে, সেখানেই হারাম হবে। যদিও হারাম হওয়ার যে হেকমতের কথা (শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া) বলা হয়েছে সেটি না পাওয়া যাক। অনেক ফকির, ভণ্ড দরবেশ এবং মিথ্যুক সুফি মদ পান করে বলে, আমাদের তো আল্লাহর কথা স্মরণ হচ্ছে। মোটকথা হেকমত না পাওয়ার কারণে সেটি হারাম হওয়ার হুকুম শেষ হবে না।

## ইল্লত ও হেকমতের মধ্যে পার্থক্য

এই বাস্তবতাকে একটু ভালোভাবে বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে, এমন জিনিসই ইল্লত হয়ে থাকে, যার অস্তিত্ব থাকা না থাকার বিষয়ে কোনো ধরনের মতানৈক্য

---

[১২৭] সুরা মায়িদাহ : ৯১।

থাকে না বা মতপার্থক্য থাকে না। সেটি থাকা না থাকার বিষয়টি মানুষ স্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারে। ইল্লতটি এমন অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত জিনিস হয় না যে, তা সম্পর্কে একজন বলবে ইল্লত পাওয়া গেছে, অন্যজন বলবে ইল্লত পাওয়া যায়নি। বরং সবসময় সেটি স্পষ্ট জিনিস হয়। যার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। তবে হেকমত এর বিপরীত।

উদাহরণস্বরূপ, এটি মদ কি মদ না? বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট বিষয়। এটি সফর কি সফর না? হেকমত স্পষ্ট বা সেটি দ্যার্থহীন কোনো বিষয় না। কেননা, সেটি নির্ধারণের নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড থাকে না। সেটি নির্ধারণ করা কঠিন। যেমন : সফরে কষ্ট হওয়া। এখন কষ্ট নির্ধারণের জন্য কোনো মানদণ্ড নেই। যেটি বলে দেবে, ভাই এই পরিমাণ কষ্ট হলে সফরে কসর করা যাবে। অন্যথায় কসর করা যাবে না। যেমন : বাসে চড়ে আপনি অল্প দুরত্বের গ্রাম থেকে শহরে গেলেন। অনেক সময় এমন যাত্রায় এত কষ্ট হয় যে, জাহাজে করে লাহরে গেলেও সে পরিমাণ কষ্ট হয় না।[১২৮] যার কারণে নামাজ কসর করতে হবে। সুতরাং কষ্ট একটি অস্পষ্ট বিষয়, কেউ বলে আমার কষ্ট হয়েছে। আর কেউ বলে আমার কষ্ট হয়নি। কষ্টকে যদি হুকুমের মূলভিত্তি হিসাবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়তো। নেশার বিষয়টিও অনুরূপ। নেশা সৃষ্টি হওয়ার ওপর যদি মদ হারামের ভিত্তি রাখা হতো, তাহলে কেউ বলতো আমার নেশা হয়েছে। আর কেউ বলতো আমার নেশা হয়নি। সুতরাং আমার জন্য মদ পান করা জায়েজ আছে।

## তৃতীয় উদাহরণ

অনুরূপভাবে সুদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

'তোমরা যদি তাওবা করো, তাহলে মূলধন নিতে পারবে। তোমরা জুলুম করো না। তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।'[১২৯]

---

[১২৮] আমাদের ঢাকা শহর দিয়েও উদাহরণ দেওয়া যায়। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, সিলেট বা দেশের শেষ প্রান্তে যেতে যতটুকুন কষ্ট না হয় তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় যাত্রাবাড়ি থেকে মিরপুর, গাজিপুর বা উত্তরা যেতে।—সম্পাদক।

[১২৯] সুরা বাকারা : ২৭৯।

## জুলুম থেকে বাঁচানো সুদের ইল্লত নয়; হেকমত

সুদের হেকমত হলো, তুমি অন্যের ওপর জুলুম করবে না এবং অন্য কেউও তোমার ওপর জুলুম করবে না। মানুষেরা এই জুলুমকে ইল্লত বানিয়ে দিয়েছে। তাদের ধারণা অনুযায়ী বর্তমান সময়ের ব্যাংকের সুদের মধ্যে যেহেতু এই জুলুম পাওয়া যায় না, বিধায় এটি হালাল। অথচ এটি কোনো ইল্লত ছিলো না, হেকমত ছিলো। এখন এই জুলুম এমন একটি বিষয় যা মাপার কোনো মানদণ্ড নেই। বিবেকের ওপরই যদি তার মূলভিত্তি রাখা হতো, তাহলে ওহি আসার কী প্রয়োজন ছিলো। প্রত্যেকেই বলতে পারতো যে, এই লেনদেনে (Transection) জুলুম আছে। ওটির মধ্যে নেই। ওই লেনদেনের মধ্যে বাড়াবাড়ি হচ্ছে। এটির মধ্যে হচ্ছে না। এ ধরনের ক্ষেত্রে মানুষের মতামতের বিভিন্নতা হওয়াই স্বাভাবিক। আর এর জন্য কোনো সুনিশ্চিত ও স্বচ্ছ মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব হতো না। সুতরাং এটির মধ্যে ইল্লত হওয়ার যোগ্যতাই নেই। মনে রাখবেন, সবসময় স্থায়ী জিনিসই ইল্লত হয়ে থাকে। আর সে ইল্লত হলো সুদ এবং সুদের সংজ্ঞা হলো—

الزيادة المشروطة في القرض.

'ঋণে শর্তকৃত অতিরিক্ত বস্তু।'

সুতরাং যেখানেই অতিরিক্ত পাওয়া যাবে, সেটি সুদ হবে। আর যখন সুদ হবে, তখন সেটি হারাম হবে।

ইল্লত ও হেকমতের পার্থক্য বুঝার জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। সেই সঙ্গে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে হুকুমের মূলভিত্তি হলো ইল্লতের ওপর, হেকমতের ওপর নয়। এটি যদি বুঝতে পারলে অগণিত ভ্রান্তির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

## ইজতিহাদের বিষয়ে পাওয়া ভ্রান্ত ধারণার কারণগুলো

আজকের আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, ইজতিহাদের পক্ষে যে স্লোগান তোলা হয় এবং বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যে সে সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোর মোট তিনটি কারণ রয়েছে—

১. প্রথম কারণ হলো, মানুষেরা ইজতিহাদের উদ্দেশ্য এই মনে করে যে, তার মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের বিপক্ষে কোনো শিথিলতা বা সহজতা পাওয়া

যাবে। কিন্তু ইজতিহাদের মাধ্যমে যদি কোনো কষ্টকর বিষয় সৃষ্টি হয় অথবা এমন পরিবর্তন হয় যে, তার কারণে আগের জায়েজ কাজটি এখন না জায়েজ হয়ে গেছে, তাহলে তারা মনে করে যে, এখানে ইজতিহাদই হয়নি।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, তাদের কাছে ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হওয়ার সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট নয়। এ কারণে তাদের মধ্যে ভ্রান্ত ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

৩. তৃতীয় কারণ হলো, যুগ পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে যে ইজতিহাদের দাবি করা হয়, সেখানে ইল্লত ও হেকমতের পার্থক্য বোঝে না। তাই এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

এই তিনটি বিষয় যদি হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহলে (ইনশাআল্লাহ) ইজতিহাদের বিষয়ে যেসব বিভ্রান্তি আসছে তার সবগুলোর যুক্তি ও দলিলের আলোকে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া যাবে। 'যুগের পরিবর্তনে'র বিষয়ে (ইনশাআল্লাহ) আগামী কোনো মজলিসে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

# যুগের পরিবর্তনে কি শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন আসবে?

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

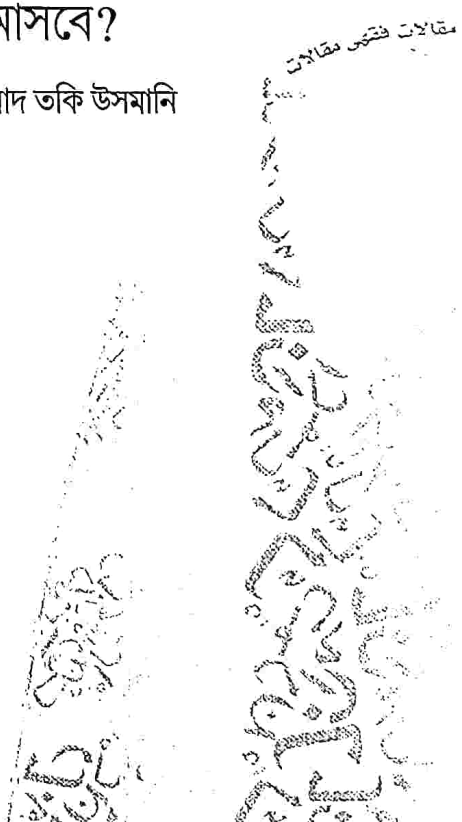

'এটিও একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ। যা মাওলানা মুহাম্মাদ তকি উসমানি জামেয়া দারুল উলুম করাচির 'তাখাসসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে রেখেছিলেন। যা মৌলবি মুহাম্মাদ ফারাজ ও মৌলবি তাহের মাসউদ অনুলিখন করেন। প্রবন্ধটি 'মাসিক আল-বালাগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।'

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি ১৪৩০ হিজরির ১৮ জুমাদাল উলা জামেয়া দারুল উলুম করাচির উচ্চতর গবেষণা বিভাগ 'তাখাসুস ফিদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ'-এর ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ দেন। যেখানে আধুনিকমনা লোকদের স্লোগান 'যুগের পরিবর্তন ঘটেছে কাজেই শরিয়তের বিধানেও পরিবর্তন আসা দরকার'-এর বাস্তবতা তুলে ধরেন। তাখাসসুস ফিদ দাওয়ার ছাত্র মৌলবি মুহাম্মাদ ফারাজ ও মৌলবি তাহের মাসউদ বক্তব্যটি অনুলিখন করেন এবং সুবিন্যস্ত করেন। আলেমদের উপকারিতার লক্ষ্যে এখানে সেটি উপস্থাপন করা হলো।

—আবদুল্লাহ মায়মান

# যুগের পরিবর্তনে কি শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন আসবে?

হামদ সালাতের পর, আপনাদের জন্য যথাসম্ভব সময় বের করার জন্য আমি সবসময় সচেষ্ট থাকি। কিন্তু কর্মব্যস্ততার ধরন ও বিস্তৃতি এতটাই বেড়েছে যে, আজকের আগে আর কোনো সুযোগ করতে পারিনি। এখনো বিভিন্ন ব্যস্ততা মাথায় গেঁথে আছে। কিন্তু ভেবে দেখলাম, অনেকদিন হয়ে গেলো কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হচ্ছে না, তাই তা এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। ইতোপূর্বে ইজতিহাদের বিষয়ে আপনাদের সামনে আমি কিছু আলোচনা করেছি। যেহেতু ব্যাপকভাবে এই স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে, ইজতিহাদ করা প্রয়োজন। আর আলেমগণ সেটির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ চিন্তাভাবনা না করে সে সম্পর্কে পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা শুরু করেছে। এ কারণে তার যে বাস্তবতা ছিলো সেটিকেই আমি আগের দরসে আলোচনা করেছি। এ ধারাবাহিকতারই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আজকাল খুব বেশি বলতে শোনা যাচ্ছে যে, যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। অবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে, সুতরাং শরিয়তের বিধানেরও পরিবর্তন হওয়া দরকার। তাছাড়া শরিয়তেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উসুল হলো—

الاحكام تتغير بتغير الزمان.

'যুগের পরিবর্তনে হুকুম ও বিধিবিধানেও পরির্তন হতে থাকে।'

## আধুনিকতা প্রিয় লোকদের অভিযোগ

বর্তমানে আধুনিক মনস্ক লোকেরা একটি সাধারণ আপত্তি করে থাকেন যে, আলেমগণ শরিয়তের এই বিধান অনুযায়ী আমল করছেন না। যার ফলে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং দীনের ওপর আমল করা জটিল হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কিছু মৌলিক কথা পেশ করতে চাচ্ছি যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণে মানুষ বাড়িবাড়ি ও ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ভারসাম্যপূর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত হয়।

## যুগের সঙ্গে শরিয়তে বিধানের পরিবর্তন কি শর্তহীন ও ব্যাপক?

এ কথা ঠিক যে, স্বয়ং ফকিহগণ এই উসুলটি রচনা করেছেন।

الاحكام تتغير بتغير الزمان.

'যুগের পরিবর্তনে হুকুম ও বিধিবিধানেরও পরির্তন হয়।'

তবে এটি কি এতটাই ব্যাপক ও শর্তহীন উসুল যে, শরিয়তের প্রতিটি হুকুম যুগের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে? আর সে পরিবর্তনটিই বা কী যা শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন ঘটায়? কেননা, আধুনিকতা প্রিয়দের মতো যদি ব্যাপকভাবে এ কথা বলা হয় যে, যুগের পরিবর্তনের কারণে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে। বিষয়টিকে যদি এতো ব্যাপক ও শর্তহীন রাখা হয় যে, সকল শরয়ি হুকুমকে তার ছাঁচে ফেলা হলে যুগের পরিবর্তনের দোহাই দিয়ে সব হুকুমে পরিবর্তন কল্পনা করা যায়, তাহলে শরিয়তের কোনো একটি হুকুমও তার আসল অবস্থায় থাকবে না।

## ইলম অর্জনের মাধ্যম কি উন্মুক্ত?

বাস্তবতা হলো, মহান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে তাদের জ্ঞানার্জনের বিভিন্ন মাধ্যম দান করেছেন। তার মধ্যে প্রত্যেকটিরই পরিধি সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকটিরই কার্যপরিধি ততটুকু যতটুকুর জন্য তাকে প্রস্তুত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়। তার মাধ্যমে অনেক জ্ঞান অর্জন হয়। কিন্তু তারও একটি পরিধি আছে, যার বাইরে সে কাজ করতে পারে না। তার জন্য মহান আল্লাহ 'আকল' সৃষ্টি করেছেন। আকলের মাধ্যমে মানুষ অনেক কিছু

অনুভব করতে পারে। কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মতো 'আকলের' পরিধিও অসীম নয়। একটি স্তরে গিয়ে মানুষের আকল-বিবেকও স্থবির হয়ে যায়। সে চূড়ান্ত এবং নিশ্চিত উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়।

## থানবি রহ.-এর বর্ণিত উপমা

হাকিমুল উম্মত থানবি রহ.-এর এই উপমা দিয়েছেন যে, মনে করুন এক ব্যক্তিকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে মুরির পাহাড়ে যেতে হবে। পাহাড় পর্যন্ত যেতে ঘোড়া তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু পাহাড়ে উঠতে ঘোড়া তার কোনো কাজে আসবে না। ঘোড়া যেহেতু পাহাড়ে উঠতে পারে না, তাই সে সেখানে কোনো কাজে আসছে না। কাজেই সামনে চলতে হলে হেঁটে যেতে হবে অথবা অন্য কোনো বাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখন কেউ যদি বলে যে, ঘোড়া একটি অকেজো বাহন, কারণ সে পাহাড়ে চড়তে পারে না, তাহলে তার এ কথাটি ভুল হবে। আবার যদি বলে ঘোড়াকেই পাহাড়ে চড়তে হবে, তাহলে এটিও ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ, একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত ঘোড়া কাজ করতে পারে। তার বাইরে সে সার্ভিস দিতে পারে না। আকল বা বিবেকের ব্যাপারটাও এমন। এজন্যই মহান আল্লাহ নবি-রাসুল পাঠিয়েছেন। কিতাব নাজিল করে বলেছেন, যেখানে গিয়ে তোমাদের আকল পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হবে, তোমাদের জন্য সেখানে এই হুকুম নাজিল করে রেখেছি। তোমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। তোমরা তার হেকমত বুঝতে পারো বা না পারো। সেটির ওপর তোমাদের আমল করতে হবে। কারণ, মানুষের আকলে তার বিভিন্ন সমাধান আসতে পারে। একজনের জ্ঞান বলবে এই দিকটি ভালো অন্য জনেরটা বলবে ওই দিকটি উত্তম।

তার দৃষ্টান্ত হলো, পিস্তল। বিবেক এই সিদ্ধান্ত দিতে পারে যে, এর দ্বারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েজ নেই, তা ভালো কাজ নয়। কিন্তু কোন হত্যাটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ? তার সমাধান কীভাবে হবে? ধরুন, কেউ একজনকে হত্যা করলো। এখন বিবেক বিপরীতমুখী দুটি সিদ্ধান্ত দিলো।

একজনের বিবেক সিদ্ধান্ত দিলো যে, সে একজন নিরিহ নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সুতরাং তার শাস্তি এই হওয়া উচিত যে, তাকেও হত্যা করা হবে। অর্থাৎ কেসাস নেওয়া হবে। অপরদিকে বর্তমান সময়ে যারা বিশ্বময় মৃত্যুদণ্ড তুলে নেওয়ার বিষয়ে খুব সোচ্চার তাদের বিবেক সিদ্ধান্ত দেবে; ভাই, একজনতো নিহত হয়েছে। সে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তার স্ত্রী বিধবা হয়েছে। তার বাচ্চারা

এতিম হয়েছে। স্ত্রী বিধবা হওয়ায় এবং বাচ্চারা এতিম হওয়ায় সে পরিবারে যে বিপদ আসার তা এসে গেছে। অথচ সেখানে তাদের কোনো অপরাধ ছিলো না। আপনারা কি এখন আরেকটি পরিবারকে ধ্বংস করতে চাচ্ছেন? আপনারা যদি হত্যাকারীকে হত্যা করেন, তাহলে তার স্ত্রী বিধবা হবে। বাচ্চারা এতিম হবে। তার পরিবার বিপদের সম্মুখীন হবে। এক পরিবার তো আগেই বিপদগ্রস্ত হয়েছে। আপনারা এখন আরেকটি পরিবারকেও বিপদের সম্মুখীন করতে চাচ্ছেন? অথচ তাদের তো কোনো দোষ নেই।

মোটকথা, এভাবে দুটি যৌক্তিক দলিল এসে গেলো এবং দুটিই বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। একপক্ষ বলবে যে, বিবেকের দাবি হলো হত্যাকারীকে হত্যা করো। আর অন্যপক্ষ বলবে, বিবেকের দাবি হলো হত্যাকারীকে হত্যা না করা। এই পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোনো উপায় নাই যে, যে মালিক ও স্রষ্টা এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন সিদ্ধান্তভার তার কাছেই অর্পণ করা হবে যে, আমাদের সিদ্ধান্ত তো ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে, এখন আপনি যে সিদ্ধান্ত দেবেন আমরা তা মেনে নেবো। পবিত্র কুরআন বলে দিয়েছে—

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

> ‘হে বিবেকবান ব্যক্তিবর্গ, কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে জীবন রক্ষার উপকরণ। তোমরা যদি (এর বিরুদ্ধাচরণ থেকে) বিরত হতে, (তাহলে ভালো হতো)।[১৩০]

যেহেতু মানুষের বিবেক সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দিতে অক্ষম এবং মানুষের বিবেককে সীমাহীন সক্ষমতা দেওয়া হয়নি যে, সে ভালো-মন্দ সবকিছুর সিদ্ধান্ত দেবে। যারা আকলকে ভালো-মন্দের মানদণ্ড স্থির করেছে আকলের ওপর নির্ভর করে তারা শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বাস্তবে একচ্ছত্র ভালো এবং মন্দের কিছুই নেই।

## বার্ট্রান্ড রাসেলের দর্শন

বার্ট্রান্ড রাসেল বর্তমান সময়ের একজন দার্শনিক। তার দর্শন হলো, ভালো-মন্দ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। বরং এটি পরিবেশের সৃষ্টি। একটি বিষয়

---

[১৩০] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৯।

এক পরিবেশে ভালো সেটিই আবার অন্য পরিবেশে মন্দ হয়ে যায়। সুতরাং শর্তহীনভাবে কোনো কিছুর সঙ্গে ভালো-মন্দের সম্পর্ক করা যায় না। কখনো যদি আমাদের বিবেক মনে করে যে, এই জিনিসটি ভালো, তাহলে সেটি ভালো। আর বিবেক যদি মনে করে এটি মন্দ, তাহলে সেটি মন্দ।

এই দর্শনের কারণে পশ্চিমাবিশ্ব কোথা থেকে কোথায় দৌড়াচ্ছে। তাদের পরিবেশে সমকামিতাকে ভালো মনে করা হয়। সুতরাং তার জন্য আইন করা হয়েছে। তারপর এখানেই শেষ নয় যে, সমকামিতা বৈধ; বরং পশ্চিমাবিশ্বে দুজন পুরুষের মধ্যে বিয়ে-শাদির আইন পর্যন্ত করেছে। মোটকথা, যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যদি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং তাদের দর্শনের ওপর রাখা হয়, তাহলে শরিয়তের কোনো অর্থই থাকে না। মানুষকে চিন্তাভাবনাগত বিভ্রান্তি এবং গোমরাহি থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যই তো শরিয়ত এসেছে। সুতরাং এমনটি বুঝা যে—

الاحكام تتغير بتغير الزمان.

যুগের পরিবর্তনের কারণ দেখিয়ে শরিয়তের সব হুকুমেই পূণর্বিবেচনার দাবি ওঠানো একেবারেই ভুল।

## الاحكام تتغير بتغير الزمان-এর প্রেক্ষাপট

ফকিহগণ যে প্রেক্ষিতে কথাটি বলেছেন তার মূলভিত্তি একটিই। যদিও তার একাধিক শাখা প্রশাখা বের হতে পারে। সে মূলভিত্তিটি হলো, অনেক সময় শরিয়তের কোনো হুকুম ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। ইল্লত পাওয়া গেলে হুকুম পাওয়া যাবে, ইল্লত না পাওয়া গেলে হুকুমও থাকবে না। সুতরাং যেখানে শরিয়তের কোনো হুকুম ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে এবং যুগের পরিবর্তনের কারণে কখনো সে ইল্লতটি পাওয়া না গেলে এমন ক্ষেত্রে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে।

## হুকুম পরিবর্তন হওয়ার শর্তাবলি

এই নীতির ওপর আমল করার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্ত :

হুকুমটি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হবে। 'তাআব্বুদি' বা ইবাদাত সংক্রান্ত ব্যাপার (ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্তহীন) হবে না। সেটি যদি 'ইবাদাত সংক্রান্ত' হুকুম হয়, তাহলে সেখানে কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ, 'তাআব্বুদির' অর্থ হলো, মহান আল্লাহ যে হুকুম দিয়েছেন, সেটিকেই মেনে নেওয়া। সেটি আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। তার স্বার্থকতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি বা না পারি। তার হেকমতের পরিচয় লাভ করি বা না করি। সব ইবাদত যেহেতু 'তাআব্বুদি' হুকুম। ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণে তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

দ্বিতীয় শর্ত :

যে ইল্লতের ওপর হুকুমের মূলভিত্তি রাখা হয়েছে, কোনো সময় যদি সে ইল্লতটি না থাকে, তাহলে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়টিও থাকবে না এবং হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও ফিকহের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের প্রয়োজন রয়েছে যে, কোন হুকুমটি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর কোনটি 'তাআব্বুদি' হুকুম। তারপর দেখতে হবে ইল্লত কোনটি? অনেক সময় কুরআন-হাদিসে ইল্লত উল্লেখ থাকে। আবার অনেক সময় উল্লেখ থাকে না। ইল্লত নির্ধারণেও ফকিহগণের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে থাকে। ইল্লত নির্দিষ্ট হওয়ার পরও দেখতে হবে যে, সে ইল্লতটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে কি না? এ সব কিছুই দেখতে হবে। এরপর যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, হুকুমটি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং ইল্লতও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর সে ইল্লতটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, তবেই কেবল যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুমের পরিবর্তন আসতে পারে।

## বিভ্রান্তির উৎস

এ ক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের ভুল হয়ে থাকে—

প্রথম ভুল : কোনো হুকুমকে ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্তের বিষয়টি নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় ভুল : ইল্লত নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

তৃতীয় ভুল : ইল্লত পাওয়া গেছে কিনা সেটি নির্ধারণে।

উদাহরণস্বরূপ আমি প্রথমে যে কথাটি বলেছি সেটি হলো, হুকুমটি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না? এটি নির্ধারণে ভুল হয়ে থাকে। সেখানে এমন ভুল হয়ে থাকে যে, ইল্লত ও হেকমতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। অথচ হুকুমের ভিত্তি হয় ইল্লতের ওপর, হেকমতের ওপর নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শূকর হারাম হওয়ার বিষয়টি। এটি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হুকুম, না কি 'তাআব্বুদি' হুকুম? হয়তো বলা হবে যে, এটি 'তাআব্বুদি' হুকুম। কারণ, মহান আল্লাহই ভালো জানেন যে, মানুষের জন্য কোন প্রাণী উপকারী আর কোন প্রাণী ক্ষতিকারক। অথবা সেটিকে যদি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হুকুম বলেও সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে সেখানে সেই আগের কথাই থাকবে যে, মহান আল্লাহ নিজে সেটিকে হারাম বলে দেওয়াটাই তার ইল্লত। এখন আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে একটি ইল্লত নির্ধারণ করে নিয়ে বললাম যে, সেটি হারাম হওয়ার ইল্লত এই। আর বর্তমান সময়ে যেহেতু সে ইল্লতটি নেই, সুতরাং তার হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। এমনটি বললে তা হবে একটি ভুল কথা।

## মনগড়া ইল্লতের দৃষ্টান্ত

(আধুনিক মনস্কদের থেকে) শূকর হারাম হওয়ার ইল্লত এই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, অতিতে শূকর দূর্গন্ধময় নোংরা পরিবেশে থাকতো। নাপাক-নোংরা খাবার খেতো। আর বর্তমান সময়ে খুব স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সেগুলো বেড়ে ওঠে। অতএব সেই ইল্লত পাওয়া যাচ্ছে না তাই শূকর হালাল হওয়া উচিত।

আসল কথা হলো, প্রথমত হালাল-হারামের হুকুমটি 'তাআব্বুদি' ও আল্লাহপ্রদত্ত হুকুম। 'তাআব্বুদি' কেন? তাও বুঝে নিন। 'তাআব্বুদি'র কারণ হলো, আমরা প্রাণী এবং সেগুলোও প্রাণী। সুতরাং বিবেকের দাবি এই ছিলো যে, কোনো প্রাণীর জন্য অন্য প্রাণী খাওয়ার অনুমতি থাকবে না। যেমন : হিন্দুরা বলে থাকে তোমরাও প্রাণী, তারাও প্রাণী। বিধায় তোমাদের জন্য এটি কীভাবে বৈধ হয় যে, তোমরা ছাগল, মুরগি, কবুতর জবাই করে খেয়ে ফেলবে? বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিবেকের আসল দাবি তো এটিই মনে হবে যে, এক প্রাণী অন্য প্রাণীকে খেতে পারবে না। এক মানুষ অপর মানুষকে খেতে থাকলে তাকে মানুষখেকো বলা হবে। বিশ্বময় বদনাম ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ছাগল, গরু, মহিষ, মুরগি এবং নানা জাতের পাখি অনবরত জবাই করে খাওয়া হচ্ছে। বাস্তবতা তো এমনটিই ছিলো

যে, এটি জায়েজ না হওয়া। বাস্তবতার বিবেচনায় এটি না জায়েজ। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কোনো কিছু সম্পর্কে বলে দিয়েছেন যে, সেটি খাও। তখন মহান আল্লাহর বলার ভিত্তিতেই সেটি খাওয়া জায়েজ হয়েছে। বিষয়টি বৈধতা পেয়েছে মহান আল্লাহর হুকুমের কারণেই। সুতরাং এটি 'তাআব্বুদি' হুকুম। এটি যেহেতু 'তাআব্বুদি' হুকুম এ কারণে কোনো ইল্লত, উপকারিতা বা হেকমতের অনুগামি করে সে হুকুমে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে না। মোটকথা, অনেক সময় 'তাআব্বুদি' হুকুমকে ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হুকুম মনে করা হয়। এটি ভুল সিদ্ধান্ত।

অনুরূপভাবে জবাইকৃত পশুর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾

'জবায়ের সময় যে পশুতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, সেটিকে কখনোই খেয়ো না।'[১৩১]

এ হুকুমটিও 'তাআব্বুদি। কারণ, বিসমিল্লাহ পড়ার কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পশুর রক্তে কি পার্থক্য সূচিত হয়েছে? তার গোশতে কি পার্থক্য এসেছে? কোনো পার্থক্যই আসে নাই। রক্ত আগে যেমন ছিলো এখনো তেমনই আছে। আগেও রক্ত বের হতো, এখানো বের হচ্ছে। কিন্তু বিসমিল্লাহ না বললে, সেটি হালাল হচ্ছে না। অথবা একজন হিন্দু বিসমিল্লাহ বলে পশু জবাই করলো, পশুর চারটি রগ কাটলো, রক্ত প্রবাহিত করলো এবং আল্লাহর নামও নিলো, সেও তো আল্লাহকে মানে, আল্লাহর নাম নিয়েই জবাই করেছে। বাহ্যত এতে বড়ো কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ তার মধ্যে এমন কী আসমান জমিনের ব্যবধান হয়ে গেলো? বাহ্যিক দৃষ্টিতে সেই রক্ত, সেই গোশত এবং আল্লাহর নামও নেওয়া হয়েছে। কেবল এতটুকু পার্থক্য হয়েছে যে, জবাইকারী তাওহিদের ওপর ইমান রাখেনি ফলে তার জবাইকৃত পশু হালাল হচ্ছে না। সুতরাং এগুলোর সবই 'তাআব্বুদি' হুকুম। যুগের পরিবর্তনের কারণে তার মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসবে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, কোনো হুকুম যদি ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়, তখন ইল্লত নির্ধারণ করতে হবে যে, তার আসল ইল্লত কী? অনেক সময় ইল্লত নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য হয়ে থাকে। সুদের ক্ষেত্রে ইল্লতটি কী? সমজাতীয়তা ও পরিমাণ? না কি খাদ্য দ্রব্য ও মুদ্রা

[১৩১] সুরা আনআম, আয়াত : ১২১।

জাতীয় হওয়া? না কি শস্য ও গুদামজাত জাতীয় পণ্য হওয়া? এ ধরনের বিভিন্ন ইল্লতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এগুলো থেকে কোনো একটিকে ইল্লত হিসাবে নির্ধারণ করা আবশ্যক।

## ইল্লতের অনুপস্থিতিতে হুকুমও অনুপস্থিত থাকবে

তারপর লক্ষ করতে হবে যে, সে ইল্লতটি এখানে পাওয়া যাচ্ছে কি না? যদি জানা যায় যে, বাস্তবেই এখানে ইল্লত পাওয়া যায়নি, সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যাবে। বিষয়টি এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, সকল ফকিহ লিখেছেন যে, পানি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। এখানে পানি দ্বারা উদ্দেশ্য সেচ দেওয়ার পানি। সংরক্ষিত পানি, অর্থাৎ যে পানি বোতলজাত করা হয়েছে বা কোনো পাত্রে রাখা হয়েছে সেটি উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ক্ষেতে সেচ দেওয়ার জন্য যে পানির প্রয়োজন পড়ে, সে পানি বিক্রয় করা জায়েজ নেই। তার কারণ হলো, পানির পরিমাণ অজ্ঞাত থাকা। কাউকে বলা হলো, তুমি আমার ক্ষেতে পানি দাও। আর তার পানি সংরক্ষিত, ট্যাংকিতে রাখা। অথবা তার নিজের মালিকানাধীন কূপ রয়েছে। সেখান থেকে সে আপনার কাছে পানি বিক্রয় করতে চাচ্ছে। আপনি চাচ্ছেন আপনার ক্ষেতে সেচ দেবেন। আপনার ক্ষেতে কতটুকু পানির প্রয়োজন? তার পরিমাণই বা কী? এই সবই অজ্ঞাত। কাজেই এখানে পানির পরিমাণ অজ্ঞাত হওয়ায় পণ্যও অজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক হয়। আর এ অজ্ঞতার কারণে বিক্রয় চুক্তিও না জায়েজ। এখন যুগের পরিবর্তনে যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, যন্ত্রের মাধ্যমে পরিমাণের অজ্ঞতা দূর হয়ে যায়। যেমন : বর্তমান সময়ে পানির মিটার পাওয়া যায়। মিটারের মাধ্যমে পানির পরিমাণ জানা যায়। তাছাড়া যে-কোনো অস্পষ্ট বিক্রয়-চুক্তিকে নষ্ট করে না। বরং সে অস্পষ্টতা বিক্রয় চুক্তিকে নষ্ট করে, যা বিবাদের দিকে নিয়ে যায়। এখানে বাস্তবিক পক্ষে ইল্লতের পরিবর্তন হয়েছে বিধায় হুকুমও পালটে যাবে। মোটকথা, যুগের পরিবর্তনের কারণে এ ধরনের বিধানে পরিবর্তন আসতে পারে। সারকথা এটিই বের হলো যে, 'الاحكام تتغير بتغير الزمان' নীতিটি এতটা ব্যাপক নয়, যেমনটি তারা বুঝেছে।

## ইল্লত পরিবর্তনের বিভিন্ন পদ্ধতি

ইল্লতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হুকুমের ক্ষেত্রে যেখানে ইল্লত পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হবে। তার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ অনেক বিধানের ইল্লত হয়ে থাকে (উরফ) সামাজিক প্রচলন। যদি সামাজিক প্রচলন পালটে যায়, তাহলে হুকুম পালটে যাবে। এ ধরনের উদাহরণে আমাদের ফকিহগণের কিতাব পরিপূর্ণ। যেখানে (উরফ) সামাজিক প্রচলন ইল্লত ছিলো, সেখানে ইল্লতের পরিবর্তনের কারণে হুকুমও পরিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে 'নশরুল উরফ ফি মাসআলাতিল উরফ' নামে আল্লামা শামি রহ.-এর একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব রয়েছে। তিনি সেখানে সবিস্তারে উরফে আম ও উরফে খাস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেইসঙ্গে এটিরও আলোচনা করেছেন যে, কোন উরফের কারণে বিধানে পরিবর্তন হবে? কোন উরফের কারণে কুরআন-হাদিসের বক্তব্যের মধ্যে 'খাস' বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যদি উরফে আম বা সাধারণ প্রচলন হয়, তাহলে সেটির মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকে যে, তার মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের বক্তব্যে সীমাবদ্ধতা আসতে পারে। অবশ্য উরফে খাসের মাধ্যমে এমনটি হতে পারে না। মোটকথা, সে সম্পর্কে তিনি উসুল ও নিয়মনীতি বর্ণনা করেছেন।

## জনস্বার্থ কখন হুকুম পরিবর্তনের কারণ হতে পারে?

অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থও হুকুম পরিবর্তনের কারণ হয়ে থাকে। আর এটি কেবল সেসব ক্ষেত্রে হতে পারে, যেখানে কোনো হুকুম 'কতয়িয়ুস সুবুত ও কতয়ি উদ দালালত' (অকাট্য প্রমাণ ও দলিল ভিত্তিক) হবে না। বরং হুকুমটি ইজতিহাদযোগ্য (مجتهد فيه) হবে। অর্থাৎ সেটি নির্ধারনের ব্যাপারে ফকিহগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আর ইজতিহাদ ও মতানৈক্য সেসব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, যেখানে হুকুমটি 'কতয়িয়ুস সুবুত ও কতয়িউদ দালালত' (অকাট্য প্রমাণ ও দলিল ভিত্তিক) হয় না। এখন যদি বড়ো ধরনের কোনো জনস্বার্থ দেখা দেয়, তাহলে যুগের পরিবর্তনের কারণে একজন ফকিহের বক্তব্য ছেড়ে অন্য ফকিহের বক্তব্য গ্রহণ করার অনুমতি রয়েছে। কারণ, ইজতিহাদি বিষয়ে কোনো একদিক নিরেট বাতিল বা পরিত্যাজ্য হয় না। উভয় দিকই শরিয়ত কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোনো ব্যাপক জনস্বার্থ দেখা দেয়, তাহলে সে ব্যাপক স্বার্থের

ভিত্তিতে একজন ফকিহের এমন মতামতকে গ্রহণ করা যায়, যা ওই ব্যাপক স্বার্থ সংরক্ষণকারী হবে। আর এটিও হুকুম পরিবর্তনের একটি কারণ। বাস্তবিক পক্ষে এখানে হুকুমের কোনো পরিবর্তনই হয়নি। কেননা, মাসআলাটি ইজতিহাদি মাসআলা ছিলো। আর উভয় হুকুম কুরআন-হাদিসের দলিল ভিত্তিক ছিলো। কারণ এখানে শরিয়তের দুটি দিক ছিলো। আর সেখান থেকে ব্যাপক জনস্বার্থের দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ কারণে হুকুমে পরিবর্তন এসেছে।

উদাহরণস্বরূপ 'মাসআলাতুজ জফর'কে উল্লেখ করা যায়। অর্থাৎ অন্যের দায়িত্বে কারও হক ওয়াজিব ছিলো। কিন্তু সে তা পরিশোধ করছে না। এমন ক্ষেত্রে কোনোভাবে ঋণদাতার হাতে ঋণীর কোনো সম্পদ এসে গেলো। যেমন : জায়েদ বকরের কাছে ঋণ পায়। বকর সেটি পরিশোধ করছে না। এখন খালেদ কিছু কাপড়, জুতো ইত্যাদি জায়েদকে আমানত-স্বরূপ দিলো যেন সেটি বকরের কাছে পৌঁছে দেয়। সে জিনিসগুলো এখন জায়েদের কাছে পৌঁছে গেলো। এখন প্রশ্ন হলো, জায়েদ কি সে জিনিসপত্র থেকে নিজের ঋণ উসুল করে নিতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে ইমাম মালিক রহ. বলেন, না, এমন ক্ষেত্রে তার ঋণ আদায় করে নিতে পারবে না। কারণ হাদিসে বর্ণিত আছে, 'لاتخن من خانك' 'তোমার সঙ্গে যে ব্যক্তি খেয়ানত করে, তুমি তার সঙ্গে খেয়ানত করো না।' ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন যে, হাদিসে এমন ঘটনা রয়েছে যে, আবু সুফিয়ানের স্ত্রীকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অনুমতি দিয়েছিলেন যে, আবু সুফিয়ানের কোনো সম্পদ তোমার হস্তগত হলে সেখান থেকে তুমি তোমার ও সন্তানদের খরচ উসুল করে নাও। ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থের ক্ষেত্রে এমনটি করার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং অর্থের মধ্যেই এটির বৈধতা সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তিনি তো এমনটি বলেননি যে, তার আসবাবপত্র বিক্রয় করে খরচ উসুল করো।

উল্লিখিত তিনটি অভিমতই দলিল ভিত্তিক। কিন্তু হানাফি মাজহাবের পরবর্তী আলেমগণ বলেছেন যে, বর্তমান যুগ হলো বে-ইনসাফি ও জুলুমের যুগ। মানুষ একে অন্যের অধিকার নষ্ট করে, আদায় করে না। এ কারণে মানুষের অধিকার আদায় নিশ্চিত করার স্বার্থে এ মাসআলাতে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতামতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী হানাফি আলেমদের এই ফতোয়া হাতে আসা পর্যন্ত হানাফিদের কাছে শুধু এই আমল ছিলো, যে সম্পদ হস্তগত হতো, সেটি যদি ঋণের স্বজাতীয়

হতো, তাহলে সেখান থেকে ঋণ উসুল করে নিতো। ভিন্ন কিছু হলে সেখান থেকে ঋণ উসুল করতে পারতো না। কিন্তু যেহেতু যুগের পরিবর্তন হয়েছে, অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, মানুষের মধ্যে আমানতদারি ও ধর্মীয় অনুভূতি হ্রাস পেয়েছে, মানুষের অধিকার পদদলিত হচ্ছে। তাই মানুষের অধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফকিহগণ এ কথা বলেছেন যে, এই পরিস্থিতিতে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতামতের ওপর আমল করা উচিত। এটি সেই জায়গা, যেখানে ব্যাপক উপকারিতার কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এটি হলো ইজতিহাদি মাসআলা। তার মধ্যে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। একাধিক দলিল রয়েছে। তার কোনো দিককে ভুল বলা যায় না। সুতরাং তার মধ্য থেকে ব্যাপক উপকারিতার প্রতি লক্ষ রেখে একটি অভিমতকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে এক দুটি নয় বরং অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

তার মধ্যে আরেকটি উদাহরণ হলো : পবিত্র কুরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় নেওয়ার মাসআলাটি। হানাফিদের আসল মাজহাব ছিলো বিনিময় না নেওয়ার পক্ষে। কিন্তু যখন দেখলো যে, যদি এ ধারা চলতে থাকে, তাহলে শিক্ষা নেওয়া ও দেওয়া উভয় দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ কুরআন শিখতেই আসবে না। তাই এখানেও ব্যাপক উপকারিতার প্রতি দৃষ্টি রেখে বিনিময় নেওয়া জায়েজের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে।

## সারকথা

সারকথা এই যে, যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তনের প্রথম শর্ত হলো, সে হুকুমের ইল্লত পরিবর্তন হতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো, মাসআলাটি ইজতিহাদি মাসআলা হতে হবে। সর্বসম্মত মাসআলা হতে পারবে না। তারপর যুগের পরিবর্তনটি এমন হতে হবে যে, ব্যাপক উপকারিতার দাবি হলো সে মাসআলার হুকুমটি পরিবর্তন হওয়া। অথবা এ অর্থে হুকুম পরিবর্তন হবে যে, এক ইমামের অভিমতকে বাদ দিয়ে অন্য ইমামের অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। এটিই الاحكام تتغير بتغير الزمان 'যুগের পরিবর্তনের কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়'—উসুলের মৌলিক ব্যাখ্যা। যার সারাংশ আমি উল্লেখ করেছি।

# المرأة القاضي দ্বারা উদ্দেশ্য কী ‘তালাক নিয়ে নাও’ কথাটির হুকুম ও তালাকের সংখ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

المرأة كالقاضي। এর উদ্দেশ্য। 'তালাক নিয়ে নাও' কথার হুকুম। তালাকের সংখ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্যের বিধান।এটি একটি বিস্তারিত ফতোয়া ও তার উত্তর। যা 'ফাতাওয়া উসমানিতে' প্রকাশিত হয়েছে। সর্ব সাধারণের উপকারার্থে এটি ফিকহি মাকালার অংশ করা হলো।

—আবদুল্লাহ মায়মান

# ‘তালাক নিয়ে নাও’ কথার হুকুম, المرأة كالقاضي-এর উদ্দেশ্য, তালাকের সংখ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিধান

তালাকের শব্দ এবং তালাক পতিত হওয়ার বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের সমাধান এবং পঞ্চায়েতের শরয়ি অবস্থান সম্পর্কে মাওলানা সায়্যাহুদ্দিন কাকাখিল রহ.-এর প্রশ্নের দলিল ভিত্তিক বিস্তারিত জবাব।

প্রশ্ন : নিচের মাসআলাগুলোর তাহকিক এবং হানাফি ফিকহের কিতাব থেকে উদ্ধৃতিসহ উত্তর দিলে আমার প্রতি বড়ো মেহেরবানি করা হবে।

একটি মেয়ে দাবি করছে যে, আমার স্বামী আমাকে দু-বার তালাক দিয়েছে। তারপরও আমাকে তার কাছে রেখেছে। আমার জানা ছিলো না যে, কোন শব্দের মাধ্যমে তালাক পতিত হয় এবং তার ফলাফলই বা কী? এ কারণে আমি বাবা-মা’কে এ বিষয়ে কিছু বলিনি। স্বামীর সঙ্গেই থাকি। কিছুদিন আগে সে ক্রুদ্ধ হয়ে একসঙ্গে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে। আমার জানা ছিলো না যে, এমনটি বলার কারণে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য একেবারেই হারাম হয়ে যায়। এজন্য স্বাভাবিকভাবেই সেটি কাউকে বলিনি এবং এ কথাও বুঝিনি যে, আমার ওপর তিন তালাক হয়ে গেছে। আর এই স্বামীর জন্য আমি হারাম হয়ে গেছি। অবশ্য আমার মাকে এ কথা

বলেছি। কিন্তু ভয় পাচ্ছিলাম যে, পিতা আমার স্বামীর এমন কথা ও রাগের বিষয় জানতে পারলে তিনি স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। ঝগড়া হবে। এ কারণে পিতাকে বলিনি। আর মা-ও পিতাকে সেটি বলেনি। কিছুদিন পর অন্য কারও থেকে এ মাসআলা জানতে পারি এবং বেহেশতি জেওর দেখে আমি নিজেও অবগত হই যে, এই অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং স্ত্রী সে স্বামীর জন্য একেবারেই হারাম হয়ে যায়। এ কারণে আল্লাহর ভয়ে আমি এখন সে স্বামীর কাছে থাকি না এবং বর্তমানে বিষয়টি পিতাকেও জানিয়েছি। (মেয়েটির নিজের লেখা বিস্তারিত ঘটনা আপনি দেখে নিতে পারেন।)

এমন ঘটনার উত্তরে স্বামী বলছে, হ্যাঁ, প্রথম বার রাগ করে এ কথা বলেছিলাম যে, 'আমার থেকে তালাক নিয়ে নাও।' তারপর অনুতপ্ত হয়েছি এবং সেটিকে তালাক বলে বুঝতে পারিনি। পরবর্তী সময়ে আরেকবার রাগের বসে বলে ফেলি যে, 'তালাক নিয়ে নাও।' আর এটিকেও আমি তালাক মনে করিনি এবং স্ত্রীকে আমার কাছে রেখে দিয়েছি। এরপর এক সময় রাগের কারণে স্ত্রীকে শুধুমাত্র ধমক ও ভয় দেখাতে দুবার তালাক শব্দ বলেছি। (স্বামীর নিজের লেখাটিও আপনি দেখে নেবেন।)

এখন অবস্থা এই যে, মেয়ে বলছে আমার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। আমি সে স্বামীর কাছে থাকতে পারি না। ছেলে বলছে, আমি তালাক দিইনি। কেননা, সে শব্দগুলোকে আমি তালাক উদ্দেশ্যে বলিনি। আর শেষ বারের শব্দকে যদি তালাক পতিত হয়েছে বলে ধরা হয়, তাহলে তা কেবল দুবার বলেছি। এরপর তাকে রুজু (তালাক দেওয়ার পর স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া।) করে নিয়েছি। এর পরে স্ত্রীকে আমার কাছে স্ত্রী হিসাবে রেখেছি। আর এখনো সে আমার স্ত্রী রয়েছে।

তারা দুজন লিখিত বর্ণনা দিয়ে একজন আলেমকে বিষয়টির সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছে। তিনি যে সমাধান করবেন, তারা দুজনে সেটিই মেনে নেবে। তার পিতাও বলছেন যে, হক স্পষ্ট হওয়ার পর সেটিই মেনে নেবো। শরিয়ার আলোকে যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে, সেটিকে মাথা পেতে নেবো।

উল্লিখিত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, অন্যান্য আলেম ও মুফতির সামনে বিষয়টি পেশ করে তাদের মতামত নেওয়া হবে এবং তাদের ফতোয়ার আলোকে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুতরাং আপনার কাছেও আবেদন যে, নিচের পরিস্থিতিতে শরয়ি হুকুম কী হবে?

১. শুধুই কি দুই তালাক পতিত হয়েছে এবং স্বামী রুজু করে স্ত্রীকে তার কাছে রাখতে পারবে?

২. না কি তিন তালাক পতিত হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে হারাম প্রমাণিত হয়েছে?

৩. স্বামী যদি কসম করে বলে, আমি শুধু দুই তালাক দিয়েছি, তাহলে তার কসমকে গ্রহণ করে তার কথা গ্রহণ করা যাবে কি না?

৪. স্পষ্টতই এখানে কোনো সাক্ষী নেই। এমতাবস্থায় বিচারিক ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে হুকুম এক হবে না কি ভিন্ন হবে?

৫. বিচারিক দিক থেকে যে হুকুম হবে, স্ত্রী কি সেটির ওপর আমল করবে? না কি ধর্মীয় দিক থেকে যে হুকুম হবে, তার ওপর?

৬. সাধারণত ফকিহগণ যে কথা লেখেন যে, المرأة كالقاضي। সেটির উদ্দেশ্য কি এই যে, এমনতাবস্থায় আইনগত হুকুমের ওপর স্ত্রী আমল করবে। না কি সেটির অন্য কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে?

৭. সিদ্ধান্তদাতা হিসাবে যে আলেমকে তারা দুজন দায়িত্ব দিয়েছে, তার অবস্থান কি কাজি ও বিচারকের মতো হবে এবং তিনি কি বিচারিক দৃষ্টিতে সিদ্ধান্ত দেবেন? না কি তার অবস্থান হবে একজন মুফতির মতো এবং তাদের দুজনকে সে সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেবেন, যা ধর্মীয় দিক থেকে শরয়ি হুকুম হবে?

এ মাসআলাগুলোর সার্বিক দিক বিবেচনা করে ফিকহি কিতাবের বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেবেন। যার আলোকে সে আলেমে দীনের জন্য পূর্ণ সাহসের সঙ্গে সিদ্ধান্ত দেওয়ার সুযোগ হয় এবং আল্লাহর কাছে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হতে না হয়।

—প্রশ্নকারী

সাইয়েদ সায়্যাহুদ্দিন কাকাখিল

মাদরাসা ইশাআতুল উলুম
ঘণ্টাঘর, কাচারি বাজার,
ফয়সালাবাদ

## মেয়ের বর্ণনা

আমার স্বামী একবার তার বাড়িতে বসে আমাকে বললো, 'যাও, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।' এরপর আমি তাকে বলি, 'তুমি এ শব্দ ব্যবহার করছো কেন? এ ছাড়া ব্যবহারের জন্য আরও অনেক শব্দ রয়েছে।' কিছুদিন পর বিষয়টি মিটমাট হয়ে গেলো। দ্বিতীয়বার রাহওয়ালি নামক স্থানে সে আমাকে বললো, 'যাও, আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম।' শুধু তোমার পিতার অপেক্ষায় আছি। তিনি আসলে তার সঙ্গে চলে যাবে। তোমাকে আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আর চাইলে এখনই চলে যেতে পারো। আমি টিকিট কেটে দেবো। তুমি একা যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। এরপর জাহাজে সে আমার প্রতি চরম ক্রুদ্ধ হয় এবং অনেক কটুকথা বলে। আমি বললাম, ভেবেচিন্তে কথা বলো। সে তখন বলতে লাগলো, 'বকবকানি বন্ধ করো। আমি ভেবে চিন্তেই বলছি। 'যাও, আমি তোমাকে তালাক দিলাম, এক। তোমাকে দুই তালাক দিলাম, দুই। যাও, তোমাকে তালাক দিলাম, তিন।' অর্থাৎ তালাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাও গুনছিলো।

আমি এ কথা ভেবে চুপ হয়ে গেলাম যে, বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে সবকিছু জানাবো। আবার এটিও ভাবছিলাম যে, সবেমাত্র তাদের ওপর দিয়ে দাদাজানের ইনতিকালের শোক গেলো। এখন আরেকটি শোক তারা কীভাবে সহ্য করবে? এরপর পথে সে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বললো যে, দেখো, জাহাজে যা কিছু বলেছি সেগুলো বাড়িতে গিয়ে বাবা-মাকে বলবে না। অর্থাৎ গাড়িতে যা কিছু বলেছি, সেগুলো তাদেরকে জানাবে না। তার কথায় আমি ঘাবড়ে যাই। বাড়িতে গিয়ে কাউকে কিছু জানালাম না। দুই তিনদিন পর আম্মাজানকে এ ঘটনা শুনাই। এটা জানতে পেরে আমার স্বামী আবার আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে এবং আমাকে খুব শাসিয়ে বলে যে, আব্বাজানকে যেন এ কথা না বলি। অন্যথায় ভালো হবে না। আমি তো আম্মাজানকে বলে দিয়েছি। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, আব্বাজানকে যেন না বলি। কেননা, তিনি কঠোর স্বভাবের লোক। তাকে বললে হাঙ্গামা হবে। তখন আমার জানা ছিলো না যে, এভাবে তালাক দিলে তালাক হয়ে যায়। আমি তো ভাবতাম সাক্ষীদের সামনে এবং লিখিতভাবে তালাক দিলেই কেবল তালাক হয়। পাঁচ মাস পর আমি সঠিক মাসআলা জানতে পারি। তখন আম্মাজানকে বলি, আব্বাজানকে পুরো ঘটনা খুলে বলার জন্য। যেন কোনো আলেম থেকে তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত জেনে নেন। এরপর রাতে আমি নিজেই স্বামীকে জিজ্ঞেস করি যে, জাহাজে কি তুমি আমাকে তিন তালাক

দিয়েছিলে? সে বলতে লাগলো, এটি জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি বলি, আমার কথার উত্তর দাও। তারপর কারণ বলবো। সে তখন বলে, হ্যাঁ। অর্থাৎ তিনবার তালাক দিয়েছিলো। আমি বলি, এখন তোমার কাছে আমার থাকা জায়েজ নেই। কাল মুফতি সাহেব তোমাকে সহিহ্ মাসআলা বলে দেবে। মুফতি সাহেব তাকে যখন জিজ্ঞেস করলো, সে তখন অস্বীকার করলো এবং বললো যে, সে শুধু দুইবার বলেছে। অথচ রাতে সে আমার কাছে তিন তালাক দেওয়ার কথা স্বীকার করেছিলো। এরপর আমি তাকে বললাম, তুমি মুফতি সাহেবের সামনে মিথ্যা বললে কেন? সে বললো, এখন এসব কথা রাখো। মানুষ এসব কথা গোপন রাখে। আর তুমি সেটিকে প্রচার করছো। আমি বললাম, দুনিয়াবি বিষয় হলে তো আমি গোপন করতাম; কিন্তু এটি তো আল্লাহর হুকুম। কোনো অবস্থাতেই আমি এ বিষয়টি গোপন করবো না। সুতরাং তোমাকেও স্বীকার করতে হবে। আমার স্বামী আমাকে আমার পিতা-মাতা এবং ভাই-বোনদের দোহাই দিতে লাগলো যে, মুফতি সাহেবের সামনে যেন দুইবারের কথাই বলি। আমি সে কথা মানিনি। তৃতীয় দিন আমাকে বলতে লাগলো, খোদার কসম, তোমার গায়ে আমি আঙুল পর্যন্ত লাগাবো না। শুধু আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে আর হাসিখুশি থাকবে এবং কারও কাছে এ কথা বলবে না যে, আমি তিনবার (তালাক) বলেছি। তার এ প্রস্তাবে আমি বলি, তুমি যখন তিনবার তালাক দিয়েছো, তখন তোমার সঙ্গে হাসিখুশি থাকা ও কথা বলাও হারাম। এরপর সে বলতে থাকে, তুমি মিথ্যুক, আমি তোমার সামনে স্বীকার করিনি। আমি বললাম, এটি তো কিছু দিন আগের কথা। আল্লাহকে ভয় করো এবং আখেরাতের চিন্তা করো। তখন সে বলে, আচ্ছা! যদি এ কথাই হয়, তাহলে আমার দু-বছরের ছোটো বাচ্চাকে নিয়ে চলে যাবো। তারপরেও এ কথার স্বীকার করবো না। তুমি কি দুনিয়ার সামনে অপমানিত হতে চাচ্ছো? আমি কসম করে বলছি, জাহাজে সে তিনবার তালাক বলেছিলো। এখন সে মিথ্যা কসম করছে যে, দুইবার বলেছে। এ লোক খুব বেশি মিথ্যা কসম করে।

والله يشهد علي ما اكتب وهو علي كل شئ شهيد.

## ছেলের বক্তব্য

আমি যা কিছু লিখছি, তা মহান আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে লিখছি। জাহাজে ওঠার সময় আমার স্ত্রী পর্দা করেনি। জাহাজে উঠেই আমি তাকে পর্দা করতে বলি।

জানা নেই, সে সেটি শুনেছে কি না। দ্বিতীয়বার তাকে বললে সে বলে, 'আচ্ছা'। সে এমন ভঙ্গিতে আচ্ছা বলেছে, যা আমার কাছে খারাপ লেগেছে। কিছুক্ষণ পর তাকে আবারও পর্দার কথা বলি। সে তখন পর্দা করে। কিন্তু রাগের সঙ্গে এবং বিচিত্র ভঙ্গিতে করে। যে কারণে আমার রাগ এসে যায় এবং তখনই আমি তাকে বলি, 'তুমি ফিরে যাও, আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি।' কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয়বার আমি তাকে বলি, 'যাও, আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি।' এরপর আমি চুপ হয়ে যাই এবং মনে মনে বলতে থাকি, আমি রাগের বশে যা বলে দিয়েছি, সেটিকে সে সত্য মনে করে না বসে। দুইবার এভাবেই বলেছিলাম। কেননা, আমার জানা ছিলো যে, তৃতীয়বার বলে দিলে নিশ্চিত তালাক হয়ে যাবে। এ কারণে দুইবার বলার পর চুপ হয়ে যাই। কিন্তু তারপরে রাগের কারণে এটা সেটা বলা হয়েছে। সুতরাং আমি কসম করে বলছি, আমি দুইবারই বলেছিলাম। আর সেটিও অন্তর থেকে বলিনি।

এর আগেও পরস্পরের মধ্যে একবার ঝগড়াঝাটি হয়েছে। তখন আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম যে, 'তুমি কি আমার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী নও? তাহলে তুমি আমার থেকে তালাক নিয়ে নাও। যাও তালাক নিয়ে নাও।' আমি এমনিতেই বলেছিলাম, অন্তর থেকে বলিনি। কাজেই কিছুক্ষণ পরে আমরা স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিলাম। এরপরেও আমি বলছি, জাহাজে ছাড়া আর কোথাও এ কথা বলার ইচ্ছে ছিলো না। আপনারা দোয়া করবেন, মহান আল্লাহ যেন ভবিষ্যতে আমাদেরকে একসঙ্গে থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন।

জাহাজে বলার সময়টিও আনুমানিক ছয় মাস অতীত হয়েছে। সবকিছু ঠিক ঠাক ছিলো। হাসি-খুশিই ছিলো। জানিনা এমন কী হয়ে গেলো যে, সে এমন বলা শুরু করেছে যে, আমাকে তিনবার তালাক বলেছে। কিন্তু আমি বলছি যে, আমি দু-বারই বলেছি। আপনিই এই মাসআলার সমাধান করে দিন।

## উত্তর

বর্ণিত মাসআলাতে প্রথমত ভাবার বিষয় হলো, জাহাজের ঘটনার আগে স্বামী তার স্ত্রীকে যে কথা বলেছিলো যে, 'তুমি কি আমার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী নও? তাহলে তুমি আমার থেকে তালাক নিয়ে নাও। যাও, তালাক নিয়ে নাও।' এ কথার কারণে তালাক হবে কি না? বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি একটি আরবি বাক্য—

خذي طلاقك، فقالت : أخذت، اختلف في اشتراط النية، وصحح الوقوع بلا اشتراطها اهـ وظاهره أنه لا يقع حتَّى تقول المرأة أخذت، ويكون تفويضا وظاهر ما قدمناه عن الخانية خلافه، وفي البزازية معزيا إلى فتاوى صدرالإسلام: والقاضي لا يحتاج إلى قولها أخذت

'স্বামী বললো, তোমার তালাক গ্রহণ করো। স্ত্রী বললো, আমি গ্রহণ করলাম। এমন ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য হয়েছে। নিয়তের শর্ত ছাড়া তালাক পতিত হওয়াকে সহিহ্ বলা হয়েছে। স্পষ্টকথা হলো, স্ত্রী কর্তৃক 'গ্রহণ করলাম' বলা ছাড়া তালাক পতিত হবে না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। ফাতাওয়া খানিয়া থেকে আগে যে আলোচনা করেছি তার বাহ্যিক কথা এটির বিপরীত। ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়াতে সদরুল ইসলাম ও কাজি সাহেবের দিকে সম্পৃক্ত করে বলা হয়েছে যে, স্ত্রীর 'গ্রহণ করলাম'—কথাটির কোনো প্রয়োজন হবে না।'[১৩২]

আল্লামা শামি রহ. 'বাহরুর রায়েকের' এ বক্তব্য থেকে এই ফলাফল বের করেছেন—

ومنه: خذي طلاقك، فقالت أخذت، فقد صحح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح، وكذا لا يشترط قولها أخذت كما في البحر.

'এখান থেকেই একটি মাসআলা হলো, স্বামী বললো 'তালাক গ্রহণ করো'। স্ত্রী বললো, 'গ্রহণ করলাম'। নিয়তের শর্ত ছাড়া তালাক পতিত হওয়াকে সহিহ্ বলেছেন। যেমনটি ফাতহুল কাদিরে আছে। অনুরূপভাবে স্ত্রী কর্তৃক 'গ্রহণ করলাম' এ কথাকে শর্ত করা হয়নি। যেমনটি বাহরুর রায়েক কিতাবে আছে।'[১৩৩]

কিন্তু যে পরিবেশে স্বামী এ বাক্যটি বলেছে, সেটিকে সামনে রাখলে তার (উর্দু) ও আরবি বক্তব্যের (خذي طلاقك 'তালাক গ্রহণ করো') মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সে পার্থক্য হলো, উর্দু পরিভাষায় উল্লিখিত বাক্যের দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে। একটি হলো, তুমি যখন আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছো না, তখন আমি তোমাকে

[১৩২] বাহরুর রায়েক, অধ্যায় : তালাক, পরিচ্ছেদ : সরিহ তালাক, (দারুল মারেফা বৈরুত থেকে প্রকাশিত) খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩৭০, ফাতাওয়া শামি : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৪৮।

[১৩৩] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড, ২, পৃষ্ঠা : ৪৩০।

তালাক দিচ্ছি। তালাক গ্রহণ করো। আর উর্দু পরিভাষায় তার দ্বিতীয় একটি উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, তুমি যখন আমার সঙ্গে থাকতে চাচ্ছো না, তখন আমার থেকে তালাক নিয়ে নাও। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে তালাক চেয়ে নাও। উর্দু পরিভাষায় দুটি উদ্দেশ্যেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরবি পরিভাষার (خذي طلاقك তালাক গ্রহণ করো।) বাক্যটি এর বিপরীত। আরবি পরিভাষায় দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটির কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং প্রথম উদ্দেশ্যের বিষয়টি স্পষ্ট। তাই সেখানে নিয়তের কোনো প্রয়োজন নেই।

এখন উর্দু পরিভাষা অনুযায়ী বক্তার উদ্দেশ্য যদি প্রথমটি হয়ে থাকে, তাহলে আরবি পরিভাষা (خذي طلاقكতালাক গ্রহণ করো।)-এর অর্থে তালাক পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি তার নিয়ত থাকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি, তাহলে তালাক পতিত হবে না। কেননা, সেটিতে তালাক প্রদান নয়। বরং স্ত্রীকে তার নিজের পক্ষ থেকে তালাক চাওয়ার নির্দেশমাত্র। সে ক্ষেত্রে ফিকহের নিকটতম মাসআলা এটি,

امرأة طلبت الطلاق من زوجها فقال لها «سه طلاق بردار ورفتي» لا يقع ويكون هذا تفويض الطلاق إليها، وإن نوى يقع.

'জনৈকা মহিলা তার স্বামীর কাছে তালাক চাইলে স্বামী তাকে বললো, তিন তালাক নিয়ে চলে যাও। এ কথার কারণে তালাক পতিত হবে না। কারণ এ কথার মাধ্যমে তাকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে স্বামী যদি সেটি দ্বারা তালাক দেওয়ার নিয়ত করে থাকে, তাহলে তালাক পতিত হবে।'[১৩৪]

رجل دعا امرأته إلى الفراش فأبت، فقال لها «اخرجي من عندي» فقالت طلقني حتّى أذهب فقال الزوج «اگر آرزوئے تو چنیں است چنیں گیر» فلم تقل شيئا وقامت، لا تطلق، كذا في المحيط.

'স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রী আসতে অস্বীকার করলো। তখন স্বামী তাকে বললো, আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাও। এ কথা শুনে স্ত্রী বললো, আমাকে তালাক দাও, যেন আমি যেতে পারি। স্বামী তখন বললো, 'তোমার ইচ্ছে যদি এমনই হয়, তাহলে তাই করো।' এ কথায় স্ত্রী কিছু না বলে চলে গেলো। এমনটি হলে তালাক পতিত হবে না। এমনটি মুহিত নামক কিতাবে আছে।'[১৩৫]

---

[১৩৪] ফাতাওয়া হিন্দিয়া। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮২।

[১৩৫] ফাতাওয়া হিন্দিয়া। খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮২।

আলোচ্য মাসআলায় স্বামীর কথার যখন দুটি সম্ভাবনাই রয়েছে, তখন তার কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করতে স্বামীর কথা গ্রহণ করা হবে। সুতরাং সে ধমক দেওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করার উদ্দেশ্যের কথা বলছে। সে যদি কসম করে বলে যে, তালাক দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিলো না, বরং স্ত্রীকে তালাক চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো, তাহলে বিচারিক দিক থেকে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং বর্ণিত বাক্যের মাধ্যমে তালাক পতিত হবে না।

অবশ্য গাড়ির ঘটনাটিতে স্বামী যে শব্দের স্বীকারোক্তি দিয়েছে। অর্থাৎ তুমি ফিরে যাও, আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পর আবার বলা যে, 'যাও আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি।' এ কথার মাধ্যমে দুটি রজয়ি তালাক পতিত হয়েছে।

কিন্তু এখানে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে যে, গাড়ির ঘটনায় স্বামী কেবল দুই তালাক দেওয়ার কথা স্বীকার করেছে। আর স্ত্রীর দাবি হলো, সে তখন শুধু তিন তালাকই দিয়েছে তা নয় বরং পরবর্তী সময়ে একাকিত্বে তিন তালাকের স্বীকারোক্তিও দিয়েছে। আর এ কথাও বলেছে যে, মুফতি সাহেবের সামনে আসল ঘটনা লুকানোর জন্য শুধু দুই তালাকের কথা স্বীকার করেছে। এখন স্ত্রীর কাছে যদি এ কথার কোনো সাক্ষী বিদ্যমান থাকে, তাহলে তো তার পক্ষে দাবি প্রমাণ করা সহজ হতো। কিন্তু তার কাছে যেহেতু কোনো সাক্ষী নেই এবং এসব কথা একান্তে হয়েছে। এজন্য কাজির কাছে যখন এমন বিষয় যাবে, তখন সে স্বামীকে কসম করিয়ে নেবে। আর স্বামী যদি এ কথার ওপর কসম করে যে, সে দুই তালাকের বেশি তালাক দেয়নি, তাহলে বিচারিক দৃষ্টিতে তার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু স্ত্রী যেহেতু নিজ কানে তিন তালাকের কথা শুনেছে, এ কারণে তার জন্য স্বামীকে কাছে আসার সুযোগ দেওয়া জায়েজ হবে না।

এখন করণিয় হলো, গাড়ির ঘটনার পরে (যেখানে দুই তালাক দেওয়ার কথা স্বামী স্বীকার করেছে) ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে মৌখিকভাবে বা কাজের মাধ্যমে স্ত্রীকে যদি রুজু না করে থাকে, তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়া-মাত্র স্ত্রী স্বামীর বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন হালাল হওয়া ছাড়া স্ত্রীর জন্য সে পুরুষের সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা জায়েজ হবে না। আর আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী তাকে বিয়ে বসতে বাধ্য করতে পারবে না। আর গাড়ির ঘটনার পরে ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে স্বামী যদি মৌখিক বা কাজের মাধ্যমে স্ত্রীকে রুজু করে থাকে, তাহলে আইনের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীকে তার কাছে থাকতে বাধ্য করতে পারবে। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য উচিত হবে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামীকে

মহান আল্লাহর ভয় দেখিয়ে এবং আখেরাতের শাস্তির কথা বলে এ কথার ওপর রাজি করার চেষ্টা করবে যে, সে তার ভুল স্বীকার করে সারা জীবন হারামভাবে কাটানোর পরিবর্তে হয়তো তৃতীয় তালাকের কথা স্বীকার করবে। অথবা কমপক্ষে সে স্ত্রীকে আলাদা করে দেবে। আর সে যদি এতে সম্মত না হয়, তাহলে মহর ক্ষমা করে দিয়ে বা অর্থ দিয়ে তার থেকে নিজের জীবনকে বাঁচাবে।[১৩৬]

যদি এটিও সম্ভব না হয়, তাহলে তার জন্য জায়েজ আছে যে, সে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে নিজের পিতা-মাতার বাড়িতে থাকবে এবং সম্ভাব্য সব পদ্ধতি অবলম্বন করে তার কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকবে। আর যদি দীর্ঘদিন এভাবে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে ধর্মীয় দৃষ্টিতে তার জন্য এমনটি করার সুযোগ রয়েছে যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা গোপনে অন্যত্র বিয়ে করে নেবে। আর দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামীর কাছে যাবে এবং তাকে বৈবাহিক সম্পর্ক নবায়ন করার প্রস্তাব দিয়ে বলবে, আমাদের বিয়ের ব্যাপারে যেহেতু আমার সন্দেহ রয়েছে, এ কারণে আমি দ্বিতীয়বার বিয়ের চুক্তি করতে চাচ্ছি। (যেমনটি প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রয়েছে।)

আর মহিলার পক্ষে যদি উল্লিখিত কোনো বিষয়ের ওপর আমল করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে যেহেতু অক্ষম এবং কাজির কাছে স্বামী কসম করে বলার কারণে কাজি স্বামীর পক্ষে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তাই স্ত্রী কোনোভাবে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম না হলে স্বামীর ওপরই সব গুনাহ বর্তাবে। আর মহান আল্লাহর কাছে স্ত্রীকে অক্ষম বলে জানা হবে। (যেমনটি দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রয়েছে।) তবে স্ত্রীর জন্য শর্ত হলো যে, সে নিজেকে ছাড়াতে সম্ভাব্য সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং নিজেকে ছাড়াতে অক্ষম হতে হবে। (যেমনটি চতুর্থ উদ্ধৃতিতে রয়েছে।) এ বিষয়ে ফকিহদের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো।

---

[১৩৬] বর্তমান সময়ে আদালতে জোরপূর্বক 'খুলা'(তালাক) করানোর ক্ষেত্রে শরিয়ত বহির্ভূত পদ্ধতির ওপর আমল হচ্ছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের জোরপূর্বক খোলা তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু উল্লিখিত ঘটনায় স্ত্রী যদি আদালতের মাধ্যমে শরিয়ত বহির্ভূত পদ্ধতিতে খোলা তালাক নিয়ে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিতে যদিও এটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে যেহেতু স্ত্রীকে আলাদা হতে হবে। এ কারণে তার আলাদা হওয়ার অধিকারকে বর্ণিত সরকারী পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে এবং এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীর জন্য এমনটি করার সুযোগ আছে বলে মনে হয়। বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করুন। আল্লাহ ভালো জানেন। (টীকাটি মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি এর পক্ষ থেকে সংযোজিত।)

১. বাহরুর রায়েকে রয়েছে—

ولذا قالوا ولو طلقها ثلاثا، وأنكر لها أن تتزوج بآخر، وتحلل نفسها سرا منه إذا غاب في سفر فإذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خارج قلبها لا لإنكار الزوج النكاح، وقد ذكر في «القنية» خلافا فرقم للأصل بأنها إن قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد، وتتزوج بآخر لأنها في حكم زوجية الأول قبل القضاء بالفرقة ثم رمز شمس الأئمة الأوزجندي، وقال قالوا هذا في القضاء، ولها ذلك ديانة، وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد، وحلف أنه لم يفعل، وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه، ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا قال يعني «البدائع».

والحاصل: أنه جواب شمس الإسلام﴿ الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى، وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى،

حلف بثلاثة فظن أنه لم يحنث، وعلمت الحنث، وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين فإذا غاب عنها بسبب من الأسباب فلها التحلل ديانة لا قضاء قال عمر النسفي سألت عنها السيد أبا شجاع فكتب أنه يجوز ثم سألته بعد مدة فقال إنه لا يجوز. والظاهر: أنه إنما أجاب في امرأة لا يوثق بها.[১৩৭]

২. ফাতাওয়া তাতার খানিয়া—

وسئل الشيخ الامام أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنه طلقها ثلثا، ولا تقدر أن تمنع نفسها منه، هل يسعها ان تقتله؟ قال :لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها، ولا تقدر علي منعه الا بالقتل، وهكذا كان فتوي شيخ الاسلام أبِي الحسن عطاء بن حمزة والامام أبي شجاع، وكان القاضي الامام الاسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتله، وفي الملتقط وعليه الفتوي[১৩৮].

---

[১৩৭] আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৭-৫৮, মাকতাবা রশিদিয়া, কোয়েটা।

[১৩৮] ফাতাওয়া তাতার খানিয়াহ : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬০৯, ইদারাতুল কুরআন, করাচি। আল বাহরুর রায়েক : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৫৮, মাকতাবা রশিদিয়া, কোয়েটা।

৩. ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়া—

سمعت بطلاق زوجها اياها ثلثا، ولا تقدر علي منعه الا بقتله، ان علمت أنه يقربها تقله بالدواء ولا تقتل نفسها، وذكر الاوزجندي رحمه الله أنها ترفع الامر الي القاضي، فان لم تكن لها بينة تحلفه، فان حلف فالاثم عليه ..... وفي النوازل :حرمت عليه بثلث ويمسكها يباح لها أن تتزوج باخر من غير علم الزوج، ولا يطلق لها، وقال الامام صاحب النظم (التاسع في الحظر والاباحة من الطلاق[১৩৯])

৪. আল্লামা শামি রহ. লেখেন—

والفتوى على أنه ليس لها قتله، ولا تقتل نفسها بل تفدي نفسها بمال أو تهرب، ..... وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الامر للقاضي، فإن حلف ولا بينة لها فالإثم عليه.

قلت : أي إذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها، فلا ينافي ما قبله.[১৪০]

উল্লিখিত আলোচনায় জনাবের এক থেকে চার নম্বর পর্যন্ত সবগুলো প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে। যার সারাংশ এই যে, স্বামী যদি এ কথার ওপর কসম করে যে, সে দুয়ের অধিক তালাক দেয়নি, তাহলে বিচারিক দৃষ্টিতে দুই তালাকই পতিত হবে। অবশ্য স্ত্রীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিন তালাক হয়ে গেছে।

অবশিষ্ট প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হলো—

৫. স্ত্রী ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রমাণিত বিধানের ওপরই আমল করবে এবং মুফতি সাহেব তাকে সে ধর্মীয় বিধান বলে দেবেন, যা বিস্তারিত পরিসরে উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। মুফতি সাহেবের আসল অবস্থান হলো ধর্মীয় বিধান বলে দেওয়া। অবশ্য পরবর্তী ফকিহগণ যখন লক্ষ করলেন যে, কাজিদের মধ্যে অজ্ঞতার সয়লাব ঘটেছে। তারা তখন এই হুকুম দিলেন যে, মুফতি সাহেব ধর্মীয়

---

[১৩৯] ফাতাওয়া বাজ্জাজিয়াহ আলা হামিশিল হিন্দিয়াহ : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ২৬০-২৬১, মাকতাবা রশিদিয়া, কোয়েটা।

[১৪০] ফাতাওয়া শামি : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৩২, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫১, এইচ এম সায়িদ মুদ্রিত।

দৃষ্টিতে হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই বিচারিক দৃষ্টির হুকুমটিও লিখে দেবেন। আল্লামা শামি রহ. লেখেন—

ولكن يكتب (المفتي) بعده ولا يصدق قضاء لان القضاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة، فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضا.[১৪১]

তানকিহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়াতে আছে—

المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه إذا استفتى فقيها يجيبه على وقف ما نوى ولكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه، ولا يلتفت إلى نيته إذاكان فيما نوى تخفيف عليه. ..... جرى العرف في زماننا أن المفتي لايكتب للمستفتي ما يدين به بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة زماننا.[১৪২]

ষষ্ঠ উত্তর : ফকিহদের বক্তব্যের (المرأة كالقاضي)[১৪৩] উদ্দেশ্য এই নয় যে, সর্বক্ষেত্রে বিচারিক সিদ্ধান্তের ওপর আমল করবে। বরং তার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে কাজির দায়িত্ব হলো শব্দের বাহ্যিক অবস্থা এবং বহুল প্রচলিত উদ্দেশ্যের ওপর আমল করা এবং ভেতরগত নিয়তের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। অনুরূপভাবে স্ত্রীরও এ দায়িত্ব রয়েছে যে, সে তার স্বামীর ব্যবহৃত শব্দের বাহ্যিক অর্থকে দেখবে কিন্তু তার ভেতরগত নিয়তের ওপর নির্ভর করবে না। সুতরাং আলোচিত মাসআলাতে المرأة كالقاضي-এর উদ্দেশ্য এই হবে যে, কাজি যদি নিজ কানে স্বামীকে তিন তালাক দিতে শুনতেন, তাহলে তিনি তার জানার ওপর নির্ভর করে তিন তালাকের সিদ্ধান্ত দিতেন এবংতিন তালাক কার্যকর করে দিতেন।[১৪৪] একইভাবে কোনো ধরনের সন্দেহ ছাড়া স্ত্রী

---

[১৪১] রদ্দুল মুহতার : খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৪৫১, এইচ এম সায়িদ মুদ্রিত।

[১৪২] তানকিহুল হামিদিয়াহ : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩, দারুল মারিফাত, বৈরুত থেকে মুদ্রিত।

[১৪৩] রদ্দুল মুহতার : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫১।

[১৪৪] হানাফি মাজহাবের উসুল অনুযায়ী তালাকের ক্ষেত্রে কাজি তার জানা শোনার ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। القاضي يقضي في حقوق العباد بعلمه بأن علم في حال قضائه في مصره أن فلانا غصب مال فلانأ وطلق امرأته.(মুইনুল হুক্কাম, পৃষ্ঠা: ১৫২।আফগানিস্তানের সংস্করণ।) কাজিদের সৃষ্ট ফেৎনার কারণে যদিও ফকিহগণ তার ওপর ফতোয়া জারি করেননি। ফাতাওয়া শামি দেখা যেতে পারে, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৫৫। (মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি এর পক্ষ থেকে সংযোজিত টীকা।) ফাতাওয়া শামিতে উল্লেখ আছে। খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪২৩।

যেহেতু তিন তালাকের শব্দ শুনেছে। এজন্য তাকে তিন তালাকের হুকুমের ওপর আমল করতে হবে। কাজি সিদ্ধান্ত যাই দিক না কেন।

এ কথার দলিল এই যে, (المرأة كالقاضي) বাক্যটি স্বয়ংসম্পন্ন কোনো নীতি নয়। বরং ফকিহগণ সেটিকে এমন ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন, যেখানে স্বামী নিজ বক্তব্যের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন উদ্দেশ্যের নিয়তের দাবি করে। এমন ক্ষেত্রে ফকিহগণ বলেন, তার বাহ্যিক শব্দের ওপর নির্ভর করে আদালতের সিদ্ধান্ত হবে। বিচারের ক্ষেত্রে সেই নিয়তের কোনো গ্রহণযোগ্যতা হবে না। আর এমন অবস্থাতে স্ত্রীর হুকুম হবে কাজির মতো। সে যদি নিজে তালাকের শব্দ শোনে বা সে শব্দগুলোর বিষয়ে সে নিশ্চিত হয়, তাহলে সে বাহ্যিক উদ্দেশ্যের ওপরই আমল করবে। স্বামীর নিয়তের ওপর আমল করবে না। এ বিষয়ে কিছু ফিকহি বক্তব্য দেখুন।

ক. কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে (انت طالق) 'তুমি তালাক' এবং সে দাবি করে যে, তালাক দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। বরং তাকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য ছিলো। এমন ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লামা ইবনু নুজাইম রহ. বলেন—

ويدين في الوثاق، والقيد ويقع قضاء، إلا أن يكون مكرها، والمرأة كالقاضي إذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه، هكذا اقتصر الشارحون. وذكر في البزازية وذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر إلى القاضي فإن لم يكن لها بينة ي حلفه فإن حلف فالإثم عليه ا هـ ولا فرق في البائن بين الواحدة، والثلاث.[১৪৫]

খ. আল্লামা ফখরুদ্দিন জায়লায়ি রহ. উল্লিখিত মাসআলাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন।

ولو قال لها أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لم يصدق قضاء، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه خلاف الظاهر، والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها.[১৪৬]

---

للقاضي العمل بعلمه والفتوى على عدمه في زماننا كما نقله في الْأشباه عن(সাইদ প্রকাশনী) جامع الفصولين، وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه، وأصل المذهب الجواز ..... الخ.

[১৪৫] আল বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৭৭ দারুল মারিফা বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

[১৪৬] জাইলায়ি শরহে কানজ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯৮; তাবয়িনুল হাকায়িক, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা

আল্লামা শামি রহ. ও এ মাসআলাতে (المرأة كالقاضي) বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।[১৪৭]

গ. অনুরূপভাবে কেউ যদি তিনবার তালাক শব্দ ব্যবহার করে এ দাবি করে যে, আমার নিয়ত ছিলো তাকিদ বা গুরত্ব বোঝানো। প্রত্যেকটির মাধ্যমে নতুন তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য ছিলো না, তাহলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে এ মাসআলা প্রসিদ্ধ আছে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিতে তার দাবি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু বিচারিক দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হবে না। এ ব্যাপারে আল্লামা হামেদ আফেনদি রহ. যা লিখেছেন, সেটির আলোকে (المرأة كالقاضي) এর বর্ণিত উদ্দেশ্য একেবারেই স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি লেখেন—

لا يصدق في ذلك قضاء، لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر..... وقال في الخانية لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقال أردت به التكرار صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثا. ه.
ومثله في الأشباه والحدادي، وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي فلا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو علمت به، لأنها لا تعلم إلا الظاهر.[১৪৮]

এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, কাজির সঙ্গে স্ত্রীকে সর্বক্ষেত্রে সাদৃশ্যতা দেওয়া হয়নি। বরং কেবল বাহ্যিকের ওপর আমল করার হুকুমের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে।

ঘ. অনুরূপভাবে কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, (أنت علي كظهر أمي) 'আমার জন্য তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো।' আর এ দাবি করে যে, আমি আগের কোনো মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার ইচ্ছে করেছি, তাহলে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে 'ফাতাওয়া আলমগিরি' কিতাবে উল্লেখ আছে—

لو قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا ..... ولو قال : أردت به الإخبار عما مضى كذبا لا يصدق في القضاء ولا يسع المرأة أن تصدقه كما لا يسع القاضي ويصدق فيما بينه وبين الله - تعالى.[১৪৯]

---

: ৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত থেকে প্রকাশিত।

[১৪৭] ফাতাওয়া শামি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২৫১, এইচ এমস সাইদ মুদ্রিত।

[১৪৮] তানকিহুল হামিদিয়্যাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৭, কিতাবুত তলাক; তানকিহুল হামিদিয়্যাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৬-৩৭, মাকতাবা রশিদিয়া কোয়েটা মুদ্রিত।

[১৪৯] ফাতাওয়া আলমগিরি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫০৭, মাকতাবা রশিদিয়া কোয়েটা।

এ সব বক্তব্য থেকে (المرأة كالقاضي) এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে নিজে যে শব্দ শুনেছে তার ভিত্তিতে বাহ্যিক অবস্থার ওপর আমল করা তার জন্য ওয়াজিব। চাই বিষয়টি কাজি পর্যন্ত পৌঁছাক বা না পৌঁছাক। এটির উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রমাণের অভাবে কাজি স্বামীর পক্ষে যে সিদ্ধান্ত দেবে, স্ত্রী তার ওপরই আমল করবে। অথচ সে নিজেই স্বামী থেকে উল্লিখিত হুকুমের বিপরীত শব্দ শুনেছে। কারণ, (المرأة كالقاضي) এর উদ্দেশ্য যদি এমনটিই হতো (কাজির সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া) তাহলে তালাকের শব্দের বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মতানৈক্যের ক্ষেত্রে ফকিহগণ এ কথা বলতেন না যে, বিচারিক দৃষ্টিতে তালাক পতিত হবে না। কিন্তু স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব হলো যে, সে স্বামী থেকে দূরে থাকবে। এ মাসআলার বিস্তারিত বক্তব্য আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম উত্তর : তালাক কেন্দ্রিক বিবাদে পঞ্চায়েত পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েজ আছে এবং সেটি বিচারকের সিদ্ধান্তের মতো কার্যকরী হবে। কারণ 'মুইনুল হুক্কাম' কিতাবে আছে—

يجوز التحكيم في الأموال والطلاق والعتاق ..... وينفذ حكم المحكم في سائر المجتهدات نحو الكنايات والطلاق والعتاق وهو الصحيح، لكن شيوخ المذهب امتنعوا عن الفتوى بهذا، لئلا يتجاسر العوام فيه[১৫০].

সুতরাং স্বামী-স্ত্রী যাকে বিচারের দায়িত্ব দিয়েছে, তিনি সেভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন, যা বিচারিক দৃষ্টিতে প্রমাণিত হবে। কিন্তু বর্ণিত ঘটনাতে তার জন্য প্রথমে উচিত হবে যে, স্বামীকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে সঠিক কথা বের করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আর মিথ্যা কসমের গুনাহ ও তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে কাছে রাখার গুনাহ সম্পর্কে বলবে। তারপরেও সে যদি কসম করে এবং স্ত্রী গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে স্বামীর পক্ষেই সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে। কিন্তু একজন মুফতির অবস্থান থেকে স্ত্রীকে উল্লিখিত শরিয়তের হুকুমও বলে দেবে। বরং স্ত্রীর সততার ওপর যদি তার ব্যক্তিগত ধারণা প্রবল হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রীকে ভিন্ন রাখতে তার পক্ষে সম্ভাব্য সব পন্থা অবলম্বন করবে। আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্তে স্ত্রীকে সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করবে। 'দুররুল মুখতার' কিতাবে আছে।

---

[১৫০] মুয়িনুল হুক্কাম : পৃষ্ঠা : ২৮, পরিচ্ছেদ ৮।

وعن الامام: إن علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء[১৫১]

আল্লামা শামি রহ. এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন—

قوله يثبت الحيلولة أي بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين إلى أن يثبت ما علمه القاضي بوجه شرعي. (قوله على وجه الحسبة) أي الاحتساب وطلب الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب .

( قوله لا القضاء ) أي لا على طريق الحكم بالطلاق أو العتاق أو الغصب.[১৫২]

উল্লিখিত বিষয়ে এই দুর্বল বান্দার সামনে প্রকাশিত আলোচনা এতটুকুই।

মহান আল্লাহই সঠিকের ব্যাপারে ভালো জানেন। তার কাছেই ফিরে যাওয়া এবং আশ্রয়স্থল।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি
১-৩-১৩৯৭ হি.

## এ ফতোয়াটিকে যারা সঠিক বলেছেন

১. মুহাম্মাদ রফি উসমানি। ২. বান্দা মুনিবুর রহমান

৩.বান্দা আবদুল হালিম

[১৫১] আদ্দুররুল মুখতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৩৯, এইচ এম সাইদ কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত।
[১৫২] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৩৯, এইচ এম সাইদ কোম্পানি কর্তৃক মুদ্রিত।

# আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

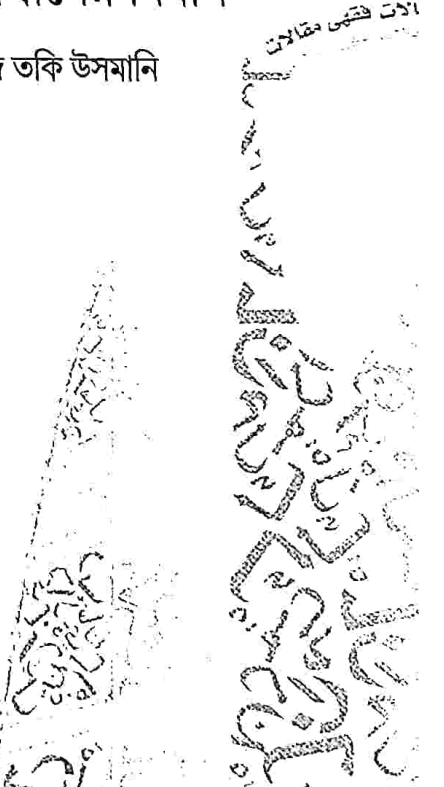

'আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিধান' এটি একটি বিস্তারিত ফতোয়া ও তার উত্তর। যা ফাতাওয়া উসমানিতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণের উপকারার্থে প্রবন্ধসমগ্রের অংশ করে এটিকেও প্রকাশ করা হলো।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

# আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিধান

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ

মুফতি সাহেব, আল্লাহ আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

**প্রশ্ন :**

প্রশ্নকারিনী ইসলামাবাদে 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল' থেকে এক বছর মেয়াদি 'ডিপ্লোমা কোর্স ইন ইসলামিক স্টাডিজ' (One Yaar Diploma ourse in I.S) সম্পন্ন করেছে। প্রশ্নকারিনী জ্ঞান অর্জনের আগ্রহে সেখানে গিয়েছিলো এবং তাদের অভ্যন্তরীণ আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অবগত ছিলো না। এক বছর ডিপ্লোমা কোর্স করার পর তাদের কিছু আকিদা-বিশ্বাস সঠিক মনে হয়নি। তাই আলেমগণ থেকে সে ব্যাপারে ফতোয়া জানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেন সেটির মাধ্যমে মুসলিম মহিলাদেরকে সঠিক আকিদা জানিয়ে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করা যায়। আমাদের শিক্ষিকা এবং আল-হুদা ইন্টারন্যাশনালের তত্ত্বাবধায়ক জনাবা ড. ফারহাত হাশেমির দৃষ্টিভঙ্গির সারসংক্ষেপ আপনার সামনে তুলে ধরলাম—

১. ইজমায়ে উম্মত থেকে দূরে সরে একটি নতুন পথ অনুসরণ করা।

২. অমুসলিম এবং ইসলামের বিপক্ষের শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষাবলম্বন করা।

৩. হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটানো।

৪. ফিকহি মতানৈক্যের মাধ্যমে দিনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করা।

৫. দিনকে অতি সহজ করার দৃষ্টিভঙ্গি।

৬. আদব ও মুস্তাহাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

বর্ণিত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর কিছু বিস্তারিত আলোচনা নিচে তুলে ধরা হলো।

## ইজমায়ে উম্মত থেকে দূরে সরে একটি নতুন পথ অনুসরণ করা

১. হাদিস দ্বারা 'উমরি কাজা' (জীবনের অনির্দিষ্ট কাজা নামাজ আদায় করার বিধান) প্রমাণিত নয়। শুধু তাওবা করে নিলে যথেষ্ট হবে, কাজা নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

২. তিন তালাককে এক তালাক বলে সাব্যস্ত করা।

৩. নফল নামাজ, সলাতুত তাসবিহ, রমজানের বেজোড় রাতগুলোতে, বিশেষত ২৭ রমজানে সম্মিলিত ইবাদতের গুরুত্ব দেওয়া এবং নারীদের সমবেত হওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

## অমুসলিম এবং ইসলামের বিপক্ষের শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষাবলম্বন করা

১. আলেমগণ, মাদরাসা ও আরবি ভাষা থেকে তারা অনেক দূরে থাকে।

২. আলেমগণ দীনকে জটিল করে রেখেছেন, তারা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত, সাধারণ মানুষকে ফিকহি মতানৈক্যের ব্যাপারে উসকানি দেয়, এ ধরনের বিভিন্ন কথা বলে। বরং এক পর্যায় তো এমন কথা বলে যে, কোনো বিষয়ে সহিহ হাদিস পাওয়া না গেলে সেখানে জয়িফ হাদিসের ওপর আমল করো; কিন্তু আলেমদের কথা গ্রহণ করো না।

৩. মাদরাসাগুলোতে আরবি গ্রামার ও ভাষা শেখানো ও ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি শেখানোর পেছনে অনেক সময় নষ্ট করে। তারা দীনের রুহ সৃষ্টি করতে

পারে না। আরবি ভাষা শেখার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু কুরআনের তরজমা পড়াই যথেষ্ট।

৪. আবার কখনো বলেছে যে, মাদরাসাগুলোতে সাত, আট বছরের কোর্স করানো হয়, এর দ্বারা সেখানে দীনের রুহ তৈরি হয় না। তারা নিজেদের ফিকহকে সঠিক প্রমাণের পেছনেই সচেষ্ট থাকে। এসব কথার মাধ্যমে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ইশারা করা হয়।

৫. ছাত্রদের তরবিয়াতের জন্য ওহিদুদ্দিন খান সাহেবের পুস্তক সর্বোত্তম। তার পুস্তককে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং স্টলে স্টলে সেগুলো সাজিয়ে রাখা হয়। কোনো একজন জিজ্ঞেস করলো যে, তার সম্পর্কে আলেমদের অভিমত কী? উত্তরে সে বললো, হেকমত মুমিনের হারিয়ে যাওয়া মিরাস'।

## হক ও বাতিলের সংমিশ্রণ ঘটানো

১. তাকলিদ করা শিরক। (কিন্তু কোনটি সঠিক আর কোনটি ভ্রান্ত তা তিনি কখনো বলেননি।)

২. জয়িফ হাদিসের ওপর আমল করাকে প্রায় একটি অপরাধের সমতুল্য করে উপস্থাপন করা হয়। (বুখারি শরিফে সহিহ হাদিসের ভান্ডার থাকতে জয়িফ হাদিস কেন গ্রহণ করা হবে?)

## ফিকহি মতানৈক্যের মাধ্যমে দিনের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা

১. নিজেদের মতাদর্শ, উদ্দেশ্য এবং সর্বসম্মত বিষয়সমূহের তুলনায় মাদরাসা ও আলেমদের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত।

২. ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদির মতো ফরজ ইবাদত ও অন্যান্য সুন্নত, মুস্তাহাব ও মাকরুহ বিষয়াদি শেখানোর তুলনায় মতানৈক্যময় মাসআলাসমূহের প্রতি বেশি উদ্বুদ্ধ করে। (তারা প্রোপাগান্ডা চালায় যে, আমরা কোনো ধরনের দলান্ধতার শিকার নই বরং সহিহ হাদিস প্রচার করছি।)

৩. নামাজের মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাগুলো। যেমন : রফয়ে

ইয়াদাইন,(নামাজের ভেতরে দুহাত উপরে তোলা) ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়া, 'বেতের' নামাজ এক রাকাত, মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা—এসব মাসআলাতে সহিহ হাদিসের উদ্ধৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বেশি গুরুত্বারোপ করে।

৪. জাকাতের বিষয়ে ভুল মাসআলা বর্ণনা করে। মহিলাদের মালিকানার ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই।

## দীনকে অতি সহজ করার দৃষ্টিভঙ্গি

১. দীনের মধ্যে কঠিন কিছু নেই। মৌলবিরা সেটিকে কঠিন করে দিয়েছে। দিন বিষয়ক কোনো মাসআলাতে যে-কোনো ইমামের অভিমত গ্রহণ করলে চলবে। এ পদ্ধতিতে আমল করলে আমরা দিনের গণ্ডির বাইরে যাবো না।

২. হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে সহজ করো, কঠিন করো না। সুতরাং যে ইমামের অভিমত সহজ মনে হবে, সেটি গ্রহণ করবে।

৩. প্রতিদিন ইয়াসিন সুরার আমল করার বিষয়টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর নফল নামাজের মধ্যে আসল হলো চাশত ও তাহাজ্জুদের নামাজ। ইশরাক ও আওয়াবিনের কোনো ভিত্তি নেই।

৪. দীন হলো সহজ। মহিলাদের চুল কাটতে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। উম্মাহাতুল মুমিনিনদের মধ্যে একজনের চুল কাটা ছিলো।

৫. দিন শিক্ষার পাশাপাশি পিকনিক, বিভিন্ন পার্টি করা, স্টাইলিশ পোশাক ব্যবহার, অলঙ্কার পরিধানের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা হলো মহান আল্লাহর এই বাণীর আওতাধীন—

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

'বলুন, আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বলুন, 'পার্থিব জীবনে, বিশেষ করে কেয়ামতের দিনে এসব তাদের জন্য, যারা ইমান আনে।

এভাবে আমরা জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।'[১৫৩]—অর্থাৎ, এগুলোর সবই বৈধ।

১. দিন প্রচারের জন্য মহিলারা অবশ্যই বাড়ির বাইরে যেতে পারবে।

২. জনাবার নিজস্ব আমল তার ছাত্রদের জন্য দলিল। মাহরাম ছাড়া দিন প্রচারে যাওয়া, কিয়ামুল লাইলের উদ্দেশ্যে রাতে ঘরের বাইরে যাওয়া এবং মিডিয়ার মাধ্যমে দিন প্রচার করতে হবে। যেমন : রেডিও, টিভি, অডিও ইত্যাদি। (এগুলো তাদের মতাদর্শ।)

৩. আদব ও মুস্তাহাবের প্রতি কোনো গুরুত্ব নেই। মহিলারা তাদের বিশেষ অপবিত্র থাকাকালীন পবিত্র কুরআন ধরতে পারবে। কুরআনের ক্লাসে কুরআন মাজিদ ওপর নিচে থাকার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

## বিবিধ মতাদর্শ

১. কুরআন মাজিদের তরজমা পড়ে সব বিষয়ে ইজতিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

২. কুরআন-হাদিস বোঝার জন্য আকাবির আলেমগণ যেসব ইলম অর্জনকে শর্ত করেছেন, সেগুলোকে অনর্থক, অজ্ঞতা আখ্যা দিয়ে সেগুলোকে চক্রান্ত সাব্যস্ত করে থাকে।

৩. তাদের থেকে শিক্ষা সমাপনি করার সময় দীনের কোনো মাসআলা বললে সে এ প্রশ্ন করে যে, এটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কি না? তাদের সব কথার সারাংশ এই যে, প্রতিটি গলি ও পাড়া মহল্লায় 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনালের' ব্রাঞ্চ খোলা হবে। এবং তাদের প্রতিটি ছাত্রী যাদের এখনো তাজবিদের শিক্ষাও শেষ হয়নি এমন ছাত্রীরাও অন্যদেরকে পড়াচ্ছে এবং বিভিন্ন মাসআলাতে উসকে দিচ্ছে।

৪. সাধারণত পুরুষদের সম্পর্ক মসজিদের সঙ্গে থাকে। (যেখানে ফিকহে হানাফি অনুযায়ী নামাজ পড়ানো হয়।) কিন্তু এখন ঘরের মহিলারা পুরুষদেরকে এ বলে উসকানি দিচ্ছে যে, আমরা মসজিদের মাওলানার প্রতি আস্থা রাখি না।

---

[১৫৩] সুরা আরাফ, আয়াত : ৩২

## আমার জিজ্ঞাসা

১. শরয়ি দৃষ্টিতে বর্ণিত মাসআলাগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করে কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করবেন।

২. মুহতারাম ড. ফারহাত হাশেমি সাহেবের উল্লিখিত কর্মপদ্ধতির শরয়ি অবস্থান কী? তাছাড়া তার 'গ্লাসগো ইউনিভার্সিটি' থেকে পি. এইচ. ডি. অর্জনের শরয়ি হুকুম কী?

৩. তার উল্লিখিত কোর্সে অংশগ্রহণ করা, অন্যদেরকে তার প্রতি দাওয়াত দেওয়া এবং আর্থিকভাবে সে প্রতিষ্ঠানকে সহাযোগিতা করার বিষয়টিকে শরয়ি দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করবেন। মহান আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

প্রশ্নকারিনী

—মিসেস সায়মা ইফতেখার

## উত্তর

প্রশ্নে যে মতাদর্শের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো যে কারোর মতাদর্শ হোক না-কেন তার অধিকাংশই ভ্রান্ত। কিছু বিষয় তো স্পষ্ট ভ্রান্ত। যেমন : ইজমায়ে উম্মতকে গুরুত্ব না দেওয়া। তাকলিদকে সরাসরি শিরক আখ্যা দেওয়া। যার সারকথা এটি বেরিয়ে আসে যে, চৌদ্দ শতাব্দি ধরে উম্মতের অধিকাংশ মানুষ যারা চার ইমামের কোনো একজনের তাকলিদ করেছে, তারা সবাই শিরক করেছে। অনুরূপভাবে এ কথা বলা যে, ছুটে যাওয়া নামাজের কোনো কাজা করার প্রয়োজন নেই।[১৫৪] শুধু তাওবা করে নেওয়াই যথেষ্ট। আর তাদের কিছু মতাদর্শ সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের মতাদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন : তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করা। আর কিছু মতাদর্শ বিদআত। যেমন : সলাতুত তাসবিহ কিংবা রাতে একসঙ্গে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। অথবা জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য মহিলাদেরকে বাহিরে

---

[১৫৪] উমরি কাজা সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ তকি উসমানি এর বিস্তারিত ফতোয়াটি 'নামাজ অধ্যায়ের ছুটে যাওয়া নামাজের কাজা করা পরিচ্ছেদে আছে। সেখান থেকে দেখে নিন। (সংকলক)

যেতে উদ্বুদ্ধ করা। আর কিছু মতাদর্শ চূড়ান্ত পর্যায়ের ভ্রষ্টতা। যেমন : শুধু পবিত্র কুরআনের তরজমা পড়িয়ে ইজতিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। অথবা এমন কথার প্রতি উসকে দেওয়া যে, মানুষ তাদের ইচ্ছেমতো যে-কোনো মাজহাব অনুসরণ করতে পারবে। বা নিজের কোনো আমলকে দলিল সাব্যস্ত করা। আর তাদের কিছু মতাদর্শ হলো ইংরেজদের সৃষ্ট ফিতনা। যেমন : আলেম ও ফকিহদের প্রতি খারাপ ধারণা রাখা। যেসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ধর্মীয় বিষয়ে গভীর ও ব্যাপক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করছে, মানুষের অন্তর থেকে সেসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমিয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্সকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা। তাছাড়া কোনো মুজতাহিদ ইমাম কুরআন-হাদিসের আলোকে কোনো মাসআলা বের করেছেন, সেটিকে বাতিল আখ্যা দিয়ে কুরআন-হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে অপপ্রচার করতে থাকাও একটি ভ্রষ্টতা।

যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বর্ণিত মতাদর্শ বিশ্বাস করে এবং সেগুলোকে প্রচার-প্রসার করে তারা শুধু ভ্রান্ত মতাদর্শের বাহক নয়। বরং ইংরেজ সৃষ্ট ভ্রান্ত ফিতনার বাহক। তাদের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কেউ যদি সহজ দীন পাওয়ার আশায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় কাজে আসে, তাহলেও বর্ণিত ভ্রান্ত মতাদর্শের শিকার হয়ে সে পথভ্রষ্টের শিকার হবে। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বর্ণিত মতাদর্শে বিশ্বাসি এবং নিজেদের ক্লাসে সেগুলো প্রচার করে এবং এ মানসিকতা সৃষ্টির প্রয়াস পায়—তাদের ক্লাসে অংশগ্রহণ করা, সেগুলো প্রচার করার অর্থ হলো তাদের চিন্তা-দর্শনের সমর্থন করা। যেটি কোনোভাবেই জায়েজ নেই। চাই সে যে ডিগ্রিধারীই হোন না কেন। তাছাড়া শরয়ি দৃষ্টিতে 'গ্লাসকো ইউনিভার্সিটি'র ডিগ্রি কোনো মূল্য রাখে না। বরং দীর্ঘদিন থেকে অমুসলিম রাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটিসমূহে প্রাচ্যবিদরা ইসলামি বিধানাবলির পর্যালোচনার নামে ইসলামি বিধানাবলিতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি এবং দীনকে বিকৃত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এসব অমুসলিম প্রাচ্যবিদ ব্যক্তিবর্গ—যাদের কপালে ইমানের মতো সম্পদ জোটেনি—মূলত দীন বিকৃতিকারী সৃষ্টি করার জন্যই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে থাকে। আর তাদের সিলেবাস ও পাঠ্যসূচিকে এভাবে সাজানো হয় যে, সেখানে শিক্ষা গ্রহণকারী অধিকাংশ শিক্ষার্থী মিথ্যা ও প্রোপাগান্ডার

শিকার হয়ে ইসলামি বিশ্বে ফিতনা সৃষ্টি করে। তবে আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু লোক এমন বিপদ থেকে মুক্ত থাকে। সুতরাং গ্লাসকো ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো ধরনের ডিগ্রি নেওয়া শুধু নির্ভরযোগ্য আলেম না হওয়ার স্বীকৃতি নয়। বরং তার মাধ্যমে দীনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।

অন্যদিকে মহান আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা এ ধরনের ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়েছে এবং তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস থেকে হেফাজত রয়েছে। যদিও এ ধরনের লোকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং এ ধরনের ডিগ্রি কারও নির্ভরযোগ্য আলেম হওয়ার প্রমাণ নয়, আবার যার আকিদা ও আমল ঠিক আছে এমন ব্যক্তিকে শুধু সেটির কারণে তিরস্কার করা যাবে না।

এই উত্তরপত্রটি প্রশ্নকারীর পক্ষ থেকে বর্ণিত কারণগুলোর আলোকে দেওয়া হয়েছে। এখন কে বর্ণিত মতাদর্শে কতটুকু বিশ্বাসী তার দায়ভার উত্তরদাতার ওপর বর্তাবে না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

২১-৪-১৪২২ হি.

## অনুবাদক পরিচিতি

মুহাম্মদ ইলিয়াস বিন আলাউদ্দীন। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের চার অক্টোবর যশোর জেলার সদর থানায় তালবাড়ীয়া গ্রামের একটি সাধারণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই-বোনের মাঝে সর্বকনিষ্ঠ। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার হাতেখড়ি। বড়ো ভাইয়ের হাত ধরে ১৯৯৮ সালে তালবাড়ীয়া হুসাইনিয়া মাদরাসায় দীনী শিক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় তার। কৃতিত্বের সঙ্গে কওমী মাদরাসার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে ২০১০ সালে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের অধীনে তিনি দাওরায়ে হাদিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতকার্য হন। এরপর জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম (মসজিদুল আকবার কমপ্লেক্স) থেকে তাখাসসুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা সম্পন্ন করে কর্মজীবনে পদার্পণ করেন।

ছাত্রজীবন থেকেই আরবি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় লেখাপড়ার মাঝে বিভিন্ন সময়ে যোগ্য উস্তাজগণের লেখালেখিতে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মুতাওয়াসসিতাহ জামাতেই শিক্ষকদের অনুপ্রেরণায় হিদায়াতুন্নাহু কিতাবের শরাহ রেওয়ায়াতুন নাহুর অনুবাদ করে শিক্ষকদের প্রশংসা কুড়ান। তিনি অনুবাদ ও গবেষণাধর্মী কিতাব রচনায় অধিক স্বাচ্ছন্নবোধ করেন। এ পর্যন্ত তার পাঁচটি অনুবাদগ্রন্থ ও 'কিতাব পরিচিতি' নামক একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এগারোটি পাণ্ডুলিপির কাজ চলমান।চারটি কিতাব প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন।

বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন একটি মাদরাসার প্রিন্সিপাল ও অন্য একটি মাদরাসায় হাদিসের খেদমত করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁর সফলতা কামনা করি।

## ফিকহি মাকালাত পঞ্চম খণ্ডে যা আছে

- বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট এবং ইসলামি দর্শন
- হদ কিংবা কেসাসে বিচ্ছিন্ন অঙ্গের প্রতিস্থাপন
- বাকিতে ক্রয় করে কম মূল্যে নগদে বিক্রয় করা
- তালাকপ্রাপ্তার জন্য খরচ ও আবাসস্থলের হুকুম
- ইজতিহাদ ও তার বাস্তবতা
- যুগের পরিবর্তনে কি শরিয়তের বিধানে পরিবর্তন আসবে
- 'তালাক নিয়ে নাও' কথার হুকুম, امرك بيدك-এর উদ্দেশ্য, তালাকের সংখ্যায় স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্যের বিধান
- আলহুদা ইন্টারন্যাশনাল-এর চিন্তাধারা ও আকিদা-বিশ্বাসের বিধান

মাকতাবাতুল ইসলাম
ISBN : 978-984-91049-1-0
www.maktabatul-islam.com